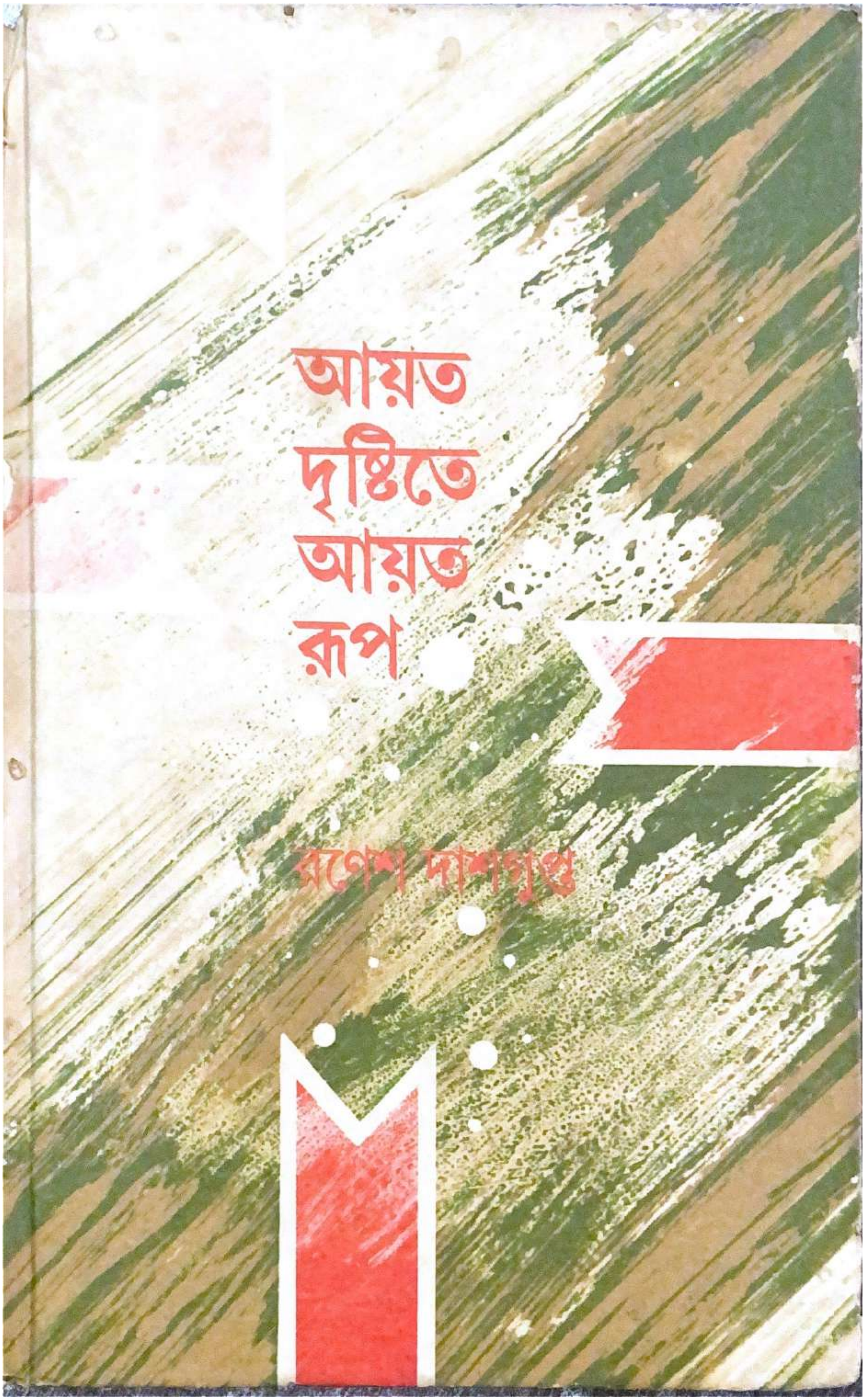

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

রণেশ দাশগুপ্ত

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

রণেশ দাশগুপ্ত

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৌষ ১৩৯৩
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ অশোক কর্মকার

মূল্য ঃ ষাট টাকা

প্রকাশক ঃ মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২
মুদ্রণে ঃ এন হক, মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
২৪৪ নবাবপুর রোড ঢাকা-১

উৎসর্গ

বেগম সুফিয়া কামাল শ্রদ্ধাস্পদাসু

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রদ্ধাভাজন রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি। গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ, ‘মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ’ ব্যতীত অন্যান্য সকল রচনাই স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত। এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে রচিত সাম্প্রতিকতম রচনাও যুক্ত হয়েছে এতে। লেখকের প্রবাস-জীবনে অবস্থানের কারণে মুদ্রণকালে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্য থেকে তাই কোনক্রমেই রেহাই পাওয়া যায় নি। নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি ভুল পাঠক-পাঠিকারা সংশোধন করে নিলে আমরা বাধিত বোধ করবো।

অনবধানবশতঃ দুটি বইয়ের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠার একাদশ লাইনে মুদ্রিত ‘Empire of the Nations’ বইয়ের প্রকৃত নাম হবে ‘Empire of the Nabobs’ এবং ১৬ পৃষ্ঠায় ২৫ লাইনে ছাপা ‘অপরাজিতা’ উপন্যাস গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে হবে ‘অপরাজিত’। তাছাড়া ২৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ‘মহাশক্তির সামাজিক বিবেক’ হবে ‘মহাশক্তিধর সামাজিক বিবেক’, ১০৪ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ লাইনে ‘১৯৪৮’ হবে ‘১৮৪৮’।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের হাতে কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা তুলে ধরছি এই গ্রন্থ।

ডিসেম্বর ১৯৮৬ মফিদুল হক

বইটি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা

এই বইটিতে সংকলিত লেখার দুয়েকটি ছাড়া সবক'টিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে প্রধানত বাংলা ও অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার স্বদেশ ও বিশ্ব-বিপ্লবী সাহিত্যের চিন্তা, সৃষ্টি, কাজ, সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে রচিত। লেখক বহুকে ও বিচিত্রকে তাদের প্রগতির নির্দিষ্ট অভিমুখিতার সাধারণ লক্ষ্যে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন মার্কসীয় সংযোগ সূত্রের মুক্তধারায়। সাফল্য ও অসাফল্য পাঠক-পাঠিকাদের বিচার্য ও বিবেচ্য।

বেশ কয়েকটি লেখা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের কোন কোনটিকে সামান্য মেজেঘষে দিয়েছি বইয়ের মধ্যে দেবার আগে। ত্রুটিবিচ্যুতি লেখকের। বইটি বার করার কৃতিত্ব প্রীতিভাজন সংগ্রাহক, সংগ্রাহিকা ও প্রকাশনালয়ের সমস্ত কর্মীর। এবং এই সঙ্গে যাঁদের আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে, উৎসাহে, আগ্রহে ও তাগিদে গত ১৬ বছরে লেখাগুলি তৈরী হতে পেরেছে, তাদের সকলের কথা ও কৃতিত্ব অবশ্যই সমানভাবে উল্লেখের দাবীদার। কাকে ছেড়ে কার নাম করি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ রণেশ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

১.

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ ৯
মার্কসীয় বাতাবরণ ঃ শতাব্দীকালের সাহিত্যে ১৪
দস্তয়েভস্কী ঃ দিনবদলের পালায় ২৭
প্রবীণ ও নবীন দুই মহাবিদ্রোহী সহযোগী ৩৪
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ধ্রুপদী কবি মায়াকভস্কী ৪৭
এলেক্সী টলস্টয় ও তাঁর অগ্নিপরীক্ষা ৭৭
পাবলো নেরুদা ঃ অবিরত কাব্যকৃতি ৮৫
গিওর্গী লুকাচ ঃ মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি ১০১
শলোকভ ঃ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শতাব্দীর কমিউনিস্ট রূপকার ১১৪

২.

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ১২৭
রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা ঃ খাদে নিখাদে ১৩০
শরৎচন্দ্র—ঝড়ের খেয়া ১৩৪
শরৎজিজ্ঞাসার সূত্র ১৪৬
অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল ১৬১
মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ ১৬৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
বিপ্লবী নয়া-ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন ১৯২
সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি ২০৩
মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা ২১২
শহীদুল্লা কায়সার—কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা ২১৭

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

১

এক শতাব্দী আগে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর ইতালীয় অনুবাদের ভূমিকাতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, ‘ইতালির শ্রমিকশ্রেণী থেকে নতুন দান্তে বেরিয়ে আসবেন।’ শোষণমুক্ত সমাজের জন্যে শ্রমজীবী জনগণের লড়াই রূপের জগৎকে কিভাবে সঙ্গী হিসেবে দেখে, এঙ্গেলসের উক্তিটিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে। এক কথায় একে বলা যেতে পারে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশা। যেমন এর বিশালতা, তেমনি এর গভীরতা। এ শুধু ভাব নয়, এ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি আর কাজ। দেশে দেশান্তরে যুগে যুগান্তরে মেহনতী মানুষের ‘রূপ লাগি ঝুরে মন’। তার অসংখ্য অজস্র অভিব্যক্তি। সমস্ত অবক্ষয় ও আবিলতা ও মৃত্যুকে সরিয়ে সরিয়ে ‘অভিনব ধরণী’ গড়ার জন্যে মানবাত্মাকে অপরূপ রূপে সাজানো। এরকমের একটি প্রেক্ষিত সামনে থাকাতে আমাদের অসমাপ্ত বিপ্লবের উপমহাদেশের সমস্ত দুঃখদৈন্যের ও বিকারের এবং আশাভঙ্গের মধ্যেও কমিউনিস্ট কবি মখদুম মহীউদ্দীন বলতে পেরেছেন, “আমি সূর্যকে পান করেছি।” কালো আফ্রিকার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমিলকার কাব্রাল মৃত্যুর আগেই লিখে রেখে গিয়েছেন, “মুক্তিযুদ্ধ একটা সাংস্কৃতিক দ্যোতনা। আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রভান্ডার যুগ-যুগান্তর ধরে গড়া গণ-মানবমানবীর রূপের জগৎ।” মায়াকভ্‌স্কি বলেছিলেন, “আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, এসো বালতি ভরে নাও।” কখনও বলেছেন, “প্রাণের ঝর্ণা বয়ে চলেছে বাধাবিপত্তি ভেদ করে, পুরো ঠোঁট ডুবিয়ে পান করো।”

এই সত্যকে সচেতন কমিউনিস্টদের তো জানার কথা, বলার কথা। তবু, মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোথাও কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে বিচ্যুতি ঘটলে কিংবা সংকীর্ণ চিন্তা মাথা তুললে, যারা নিজেদের মার্কসবাদী মনে করেন তাঁদেরও কেউ কেউ বলে বসেন, ‘সমস্ত যজ্ঞটাই পণ্ড। দোষটা কমিউনিজমেরই, দোষটা মার্কসবাদেরই।’ আত্মগ্লানিতে এঁরা আশেপাশের আবহাওয়া ভারী করে তোলেন।

অথচ ইদানিংকার কত ঘটনাই তো আমাদের সামনে রয়েছে, যাতে নব নব ব্যবস্থায় কমিউনিস্টদের আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশা প্রমাণিত। শুধু প্রমাণিত নয়, প্রসারিত। দুটো ঘটনার কথা এখানে বলা যায়।

২

একটা ঘটনা ঘটেছে '৮১ সালের আগস্ট মাসে। গ্রীসের বিশ্ববিদিত কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধা সুরকার মিকিস থিওডোরাকিস কিউবার রাজধানী হাভানাতে গণনাট্যের ধারায় একটি বিশেষ 'বৃন্দগান, আবৃত্তি ও বৃন্দবাদ্যের অনুষ্ঠান' পরিবেশন করেছেন। বিষয়—পাবলো নেরুদার 'সাধারণ গান' (ক্যান্টো জেনারেল) কাব্য। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যাহ্নে রচিত নেরুদার এই কাব্যগ্রন্থটি ইলিয়া এরেনবুর্গের ভাষায় নতুন ধরনের উপন্যাস। ললিত ও কঠোর গাঁথুনিতে গাঁথা কোমল ও কঠোর চরিত্রাবলীকে নিয়ে লেখা খণ্ড খণ্ড কবিতার অগ্নিমালা। সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের মুক্তি সংগ্রামের মর্মবাণী। কেন্দ্র হচ্ছে মেহনতী মানুষের জয়গাথা। মিকিস থিওডোরাকিসের পরিচালনায় একক গানে, সমবেত সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে এবং বৃন্দবাদ্য-সঙ্গতে অংশ নিয়েছেন গ্রীস এবং কিউবা ও অন্যান্য দেশের প্রায় দু'শ কুশলী পুরুষ ও নারী শিল্পী।

এই উপলক্ষে হাভানায়একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মিকিস বলেছেন, "নেরুদার মৃত্যুসংবাদে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একাধারে মহৎ প্রতিভা ও বিপ্লবী। তাঁর 'ক্যান্টো জেনারেল' আমাদের সময়ের মহৎ সাহিত্য—মহাকীর্তিসমূহের অন্যতম। সমসাময়িক শিল্পকলা, আমার মতে যা হওয়া উচিত, তার সঙ্গে 'ক্যান্টো জেনারেল' মিলে যায়। জনগণের প্রতি নিবেদিত এই শিল্পকর্মটির পরিধি হচ্ছে বিশাল। জনগণের সঙ্গীত আমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। এই জনগণের সঙ্গীতকে ভিত্তি করেই আমি কতকগুলো বিস্তারিত কাজ করেছি। 'ক্যান্টো জেনারেল' এদের একটি। আমার কাছে 'ক্যান্টো জেনারেল' কাব্য হচ্ছে গণ-নাট্য-সঙ্গীত। বিশেষ করে যারা জনগণের জন্যে লড়ছে, তাদের হৃদয়জোড়া এর প্রভাব। চিলিতে একভাবে এই কাব্যের সাঙ্গীতিক রূপ দেওয়া হয়েছিল, আমি তা শুনেছিলাম। আমি আরেকভাবে রূপ দিয়েছি। এর কারণ, রূপসৃষ্টির কোন বর্ডার নেই।"

মিকিস থিওডোরাকিস আরও বলেছেন যে, চিলিতে নেরুদা ও সালভাদর আলেন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ 'ক্যান্টো জেনারেল'-এর সঙ্গীতালেখ্য তৈরীর জন্যে তাঁর সাধ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে।

হাভানার এই অনুষ্ঠানের খবরে আরও জানা গিয়েছে যে, অনুষ্ঠানটি নেরুদার মাতৃভাষাভাষী দেশের মধ্যে কিউবাতেই প্রথম আয়োজিত হয়েছে। তবে, ইতিপূর্বে গ্রীসে এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে 'ক্যান্টো জেনারেল' মহাসমারোহের সঙ্গে শোনানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, মিকিস থিওডোরাকিস নিজস্ব অভিমতকে ব্যক্ত করার ব্যাপারে কখনও দ্বিরুক্তি করেননি। তাঁর অভিমতগুলো সব

সময়েই খাড়াখাড়া ধরনের। হাভানাতে এবারও তিনি বলেছেন, "আমার কাছে শিল্পকলা রাজনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত এবং আমি রাজনীতি বলতে বুঝি জনগণের স্বাধীনতা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্যে সংগ্রাম।" তিনি বলেছেন, তাঁর মাতৃভূমি গ্রীসকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। 'ক্যান্টো জেনারেল'কে তিনি বেছে নিয়েছেন ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। 'ক্যান্টো জেনারেল' আমাদের বিশ্বের জনগণের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাতে উদ্দীপিত।

মার্কসবাদ ও কমিউনিজমে সুদৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয় নিয়েই নেরুদার রূপের বিস্তৃত জগৎকে মিকিস থিওডোরাকিস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন নতুনতর ভাবে, কারণ তাঁর কাছে শিল্পকলার কোন বর্ডার নেই।

৩

আরেকটা ঘটনা সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীতে একটি বিশেষ রূপের জগতের চর্চা। এই রূপ আমাদের উপমহাদেশেরই বৈভব। এর সাধক একজন হাঙ্গেরীয়—ডঃ চার্লস ফাবরি। সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী ডঃ ফাবরিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাঁর জন্ম হাঙ্গেরীতে ১৮৯৯ সালে। মৃত্যু ১৯৬৮ সালে ভারতে। বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হবার পরে ডঃ ফাবরি ইওরোপের দেশেদেশান্তরে বসবাস করছিলেন এবং তিনি যখন ইংলণ্ডে, তখন তাঁকে একজন পুরাতত্ত্ববিদ ও ললিতকলার জহুরী হিসেবে ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণ জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই তাঁর ভারতে আসা। এরপর তিনি লাহোর মিউজিয়ামে কাজ করেন এবং হরপ্পা খননে অংশ নেন। ১৯৩৯ সালে বৃটেনের নাগরিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিয়ে জাহাজে লণ্ডন যাবার সময় 'দি ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যামিংগো' নাম দিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। বৌদ্ধ শিল্পকলার দেবী মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি এবং বাস্তবিকই গোলাপী শাড়ি পরা লাহোরের এক মহিলার প্রতীক ছিল ভারতীয় হংসী। এতে আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রয়াসের এবং প্রয়োজনের কথাটা বড় হয়ে উঠেছে। আরেকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী অগ্নিহোত্রী' নাম দিয়ে। এটিও বর্তমান উপমহাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। আনন্দ কুমারস্বামীকে তিনি গুরু বলতেন। কিন্তু যেখানে ভিন্ন মত হতেন সেখানে চুপ করে থাকতেন না। ডঃ ফাবরি 'ওড়িসি' নৃত্য এবং দ্রাবিড় ও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি এদের মধ্যে হরপ্পা, মহেনজোদারো এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। বুদাপেস্ট থেকে

১৯৮০ সালে ডঃ চার্লস ফাবরির উপরোক্ত জীবনকথা এবং পুরাতত্ত্ব ও রূপ-চর্চার এবং 'ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যামিংগো' উপন্যাসের একটি সঞ্চয়ন প্রকাশ করা হয়েছে। আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশারী ডঃ চার্লস ফাবরি সম্বন্ধে এই সঞ্চয়নে যেসব টুকিটাকি খবর রয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি ঘটনা মর্মস্পর্শী। ডঃ ফাবরি শৈশবে বুদাপেস্টে রুশ ব্যালে-নাচ দেখেছিলেন। প্রধানা ব্যালে নৃত্য-শিল্পীর সঙ্গে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন এবং এই শিল্পীর ছোট ছোট হাতের তারিফ করেন। সেই শিল্পী কিন্তু তাঁকে বলেছিলেন, হাতগুলো বড়ো হলেই বরং ভাল হতো, কারণ তিনি তাহলে হাতের মুদ্রাগুলিকে দর্শক-মণ্ডলীকে আরও স্পষ্ট করে দেখাতে পারতেন। চার্লস ফাবরির মনে এই কথাগুলি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। নাচের প্রতি তাঁর রূপসন্ধানী মন ব্যালে নাচ থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ফাবরি এই ব্যালে নাচের প্রতিচ্ছবি পেয়েছেন ওড়িসি ও কথক নাচে।

আমাদের উপমহাদেশের রূপের জগতের প্রসার ঘটাবার ব্যাপারেও মিকিস থিওডোরাকিসের ভাষায় বলা যায়, 'শিল্পকলার কোন বর্ডার নেই।' এটা হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্টরাও দেখিয়ে দিলেন।

কমিউনিস্ট সৌন্দর্যতাত্ত্বিক লুকাচের মাতৃভূমি হাঙ্গেরী যেমন তার সন্তান লুকাচকে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক বলে মনে করে, তেমনি ডঃ চার্লস ফাবরিকে নিয়েও তাদের গর্বের সীমা নেই। ভারতীয় পিতা ও হাঙ্গেরীয় মায়ের সন্তান অমৃত শেরগিলের আঁকা অনেক ছবিও সমাজ-তান্ত্রিক হাঙ্গেরী ছেপে বার করেছে। কমিউনিজম তথা মার্কসবাদের জন্যেই এ কাজগুলো হচ্ছে। তবে তাঁরা কোন 'বর্ডার রাখছেন না', কারণ মেহনতী মানুষের পৃথিবীতে কোথাও বর্ডার নেই।

৪

একটি বই-এর কথা বলা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। নাম 'মীরাটে ষড়যন্ত্র' (Conspiracy at Meerat)। লেখক লেস্টার হাচিনসন। বিষয় ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের উপমহাদেশের আলোছায়া রূপ। জেলখানারও চেহারা দিয়েছিলেন। হাচিনসন, স্প্রাট আর ব্রাডলি এখানে এসেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের শ্রমিক-ভিত্তি তৈরীর কাজে সহায়তা করার জন্যে। তাঁরা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বইটি এই অভিজ্ঞতার ফসল। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে বিপ্লবের আয়োজনটাই ছিল উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা রূপের জগৎকে সঙ্গী করে চলেন, তার সাক্ষী এই বই।

এতে শুরুতেই আছে ইতালি হয়ে জাহাজে চড়ে বোম্বেতে এসে নামার কথা। ইতালিতে কয়েকদিন ছিলেন। এক কথাতেই সেরেছেন। লিখেছেন, তাঁর মনে হয়েছিল, ইতালির আকাশটি সুন্দর, কারণ ফ্যাসিস্টরা একে ছুঁতে পারে নি। আরেকটি সুন্দরের কথা আছে। গড় মুক্তেশ্বরের মেলায় সন্ধ্যা-রাতে স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীরা নদীতে যে প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছিল, সেগুলিকে ভেসে যেতে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এদের ধর্মে অনেক ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সে নিঃসন্দেহে সুন্দর। গ্রামাঞ্চলের তরুণী যুবতীদের গর্বিত ও শক্তি-শালী চলার ভঙ্গী দেখে তিনি বলেছিলেন, এরা দেবীপদবাচ্য।

হাচিনসন ছিলেন কৌতুক এবং পরিহাসপ্রিয়। উপমহাদেশের ঔপনি-বেশিক শাসনের শৃঙ্খল ও জেলখানার গরাদকেও তিনি কৌতুকে বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার তিনি 'The Empire of the Nations' এর লেখক। কমিউনিজম বা মার্কসবাদ যদি বিশেষ করে প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপচর্চাকে দূরে রাখতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় গড় মুক্তেশ্বরের মেলার নদীতে প্রদীপ ভাসাবার ব্যাপারটা নিয়ে এতটা আবেগ প্রকাশ করতেন না। তখনও সমাজতন্ত্র মাত্র একটি দেশে জয়ী হয়েছে এবং কমিউনিজমের সৌন্দর্যতত্ত্বেরও পরীক্ষাগার সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। তখনকার তুলনায় ষাট সত্তর বছর পরে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ দেখার ব্যাপারে যে অবিশ্রান্ত প্রসার ক্রমাগত ঘটে চলেছে, তার সম্মতি পেলে হাচিনসন কোন কোন ব্যাপারে তাঁর সুন্দরকে বুঝতে পারার অপারগতাকে কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

৫

হো চি মিনের একটি বক্তব্য দিয়ে প্রসঙ্গের শেষ করবো। হো চি মিন কমিউনিস্ট ছিলেন। তাঁর কবিতাতে কমিউনিজম কোন বর্ডার সৃষ্টি করেনি। তিনি সুন্দরকে আর কমিউনিজমকে একাঙ্গ করেছেন। ভিয়েতনামের মানুষ যে সুন্দরকে চিনেছে, তারই ভাষাতে তিনি এই সংজ্ঞা দিয়েছেন। ভিয়েতনামে প্রাচীনকালের একটা জরীর থলে সম্বন্ধে প্রবাদ রয়েছে। এর মধ্যে হাত দিলে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়। হো চি মিন বলেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এই জরীর থলে।

হো চি মিন অবশ্য জানতেন এবং জানিয়েও গিয়েছেন যে, বুকের রক্ত ঢেলে মুক্তিযুদ্ধ করে সৃষ্টি সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হয়।

মার্কসীয় বাতাবরণ ঃ শতাব্দীকালের সাহিত্যে

১

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের পথিকৃৎ ও রচয়িতা কার্ল মার্কসের জীবনাবসান হয়েছিল ১৮৮৩ সালে ৬৫ বছর বয়সে। ১৯৮৩ সালে এই ঘটনার শতবার্ষিকী সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লবের গত এক শতাব্দীকালের প্রাণবন্ত ধারার কার্যকারিতার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কাজ চলতে থাকবে। দেশে-দেশান্তরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে মার্কসীয় অবদানও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তারই সূত্রে এখানে দু'চার কথা লেখা। সাহিত্য অবশ্য একটা খরস্রোতা নদীর মতো। এখানে বর্তমানই চোখকে বেশি টানে। সেইজন্য অতি সাম্প্রতিককে সামনে আনতেই হবে। সেটা আনবো। তবে অতীতের নানা রংএর দিনগুলিকে কয়েক মুঠো হলেও আনতেই হবে।

২

সাধারণভাবে সাহিত্যের দুটি অন্যতম প্রধান ধারা। একটি সৃষ্টিমূলক ও আরেকটি তাত্ত্বিক। মার্কসীয় ক্ষেত্রেও তাই। সৃষ্টিমূলক ধারায় মার্কসীয় বাতাবরণের প্রাধান্য। তাত্ত্বিক ধারায় মার্কসীয় সূত্রের প্রাধান্য। সৃষ্টির দৃষ্টান্ত গোর্কির 'মা', ব্রেখ্‌টের নাটক, মায়াকভস্কি ও হো চি মিন ও পাবলো নেরুদার কবিতা, লু সুনের গল্প। তত্ত্বের দৃষ্টান্ত গোর্কি, ফিনকেলস্টাইন, লুকাচ, লুই আঁরাগ, রালফ ফক্স ও ক্রিস্টোফার কডওয়েলের বই। তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের লেখাও এর মধ্যে পড়ে। একেবারে ঘরোয়া দৃষ্টান্ত গোপাল হালদারের উপন্যাস 'ত্রিদিবা' এবং নিবন্ধের বই 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। প্রথমটি সৃষ্টিমূলক, দ্বিতীয়টি তাত্ত্বিক। একই ব্যক্তির সৃষ্টি ও তত্ত্বের কাজ থেকে দুটি ধারাকে বিশিষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও নিবন্ধে ভিন্ন মেজাজ ও পদ্ধতি। যেমন রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভল্‌গা থেকে গঙ্গা' এবং 'মানব সমাজ'। একটি উপন্যাস, আরেকটি নিবন্ধ। পদ্ধতির দিক দিয়ে দু'টি ধারা কখনও কাছাকাছি আসতে পারে, কখনও সম্পর্কটিকে খুঁজে বার

করতে হয়। অবশ্য মার্কসীয় বাতাবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লব এবং এদের বাতাবরণ গত এক শতাব্দীর সাহিত্যের সমস্ত রকমের আঙ্গিকের কাজের মুক্তধারাকে কিভাবে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করে আসছে, তার একটা ধারণা উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে করা যেতে পারে বলে আশা করা যায়।

ব্যাপারটা বিশ্বব্যাপী। ছোট ও বড় দেশ নির্বিশেষে কাজ হয়েছে গভীরভাবে ও বিস্তারিতভাবে। সুতরাং, বিশদভাবে কোথায় কি হয়েছে জানাতে গেলে শুধু মাত্র নাম করেও কুলানো যাবে না। সারা বিশ্ব জুড়ে আদিম গোষ্ঠীতন্ত্রের আওতায় রয়েছেন এমন অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে সঙ্গে চুড়ান্ত শিল্পোন্নত বিশ্ব-নাগরিকতার মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করছেন কোটি কোটি নাগরিক যাঁরা মার্কসীয় বাতাবরণে প্রভাবিত। এই অবস্থায় কতকগুলো মূল প্রশ্ন ও বৈশিষ্ট্যকে মাত্র তুলে ধরেই সাহিত্যের মার্কসীয় ধারার অবদানকে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝবার চেষ্টা করছি।

৩

প্রথমেই একটা প্রশ্নে পরিষ্কার হয়ে থাকা দরকার। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে মার্কসীয় সূত্র ও বিপ্লব এবং উভয়ের বাতাবরণকে কিভাবে ও কতখানি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাই আমাদের দেখা উচিত। মার্কস কিংবা বিশিষ্ট মার্কসবাদীদের অথবা এঁদের লেখা কোন বিশেষ বই বা সূত্রের উল্লেখ থাকা-না-থাকা নিয়ে কোন সাহিত্যের কাজের মূল্য যাচাই করা উচিত নয়। মার্কসের অথবা তাঁর লেখার কোন উল্লেখ থাকলে যেমন বাড়াবাড়ি করে দেখা ঠিক নয়, তেমনি না থাকলে সেই সাহিত্যের কাজ মার্কসীয় বাতাবরণের বাইরে পড়ে যায় না।

বেশ কিছুকাল আগেকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য সময়কালের শুরুতে ১৮৮০'র দশকে যুবক বার্নার্ড শ' 'আনসোস্যাল সোসিয়ালিস্ট' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। এর একটা ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, মার্কসের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়ে তাঁর অর্থনীতির ধারণা আমূল বদলে গিয়েছিল। এই উপন্যাসটিও ছিল, সমাজ সম্বন্ধে বোধোদয়, সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-ঘেঁষা। এতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দারুণভাবে নিন্দিত এবং নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে চিন্তাচেতনার তাগিদ ছিল। কিন্তু একে কখনও কেউ মার্কসীয় তত্ত্বের প্রলেতারীয় উপন্যাস বলে দাবী করেননি। অপরপক্ষে টমাস হার্ডির 'টেস্' উপন্যাসে কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই। এক গ্রামীণ সর্বহারা নারীর বঞ্চিত জীবনের কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসে বাস্তব বর্ণনার পটভূমিতে। টমাস হার্ডি 'ক্যাপিট্যাল' পড়েছিলেন কিনা সেকথা কেউ বলেননি। তবে তিরিশের দশকের এক বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্য সমালোচক

'টেস'কে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম প্রলেতারীয় উপন্যাস বলে অভিহিত করেন। তিনি ইংলণ্ডের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের দাপটে সর্বহারা কৃষিমজুরদের বঞ্চিত জীবনের প্রতীক হিসেবে 'টেস'কে বিচার করেছেন। এই দু'টি উপন্যাসের পাশাপাশি তলস্তয়ের 'রিসারেকসান' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৯০ সাল নাগাদ তলস্তয় 'রিসারেকসান' লিখেছিলেন। এই উপন্যাস তাঁর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তের কাজ। এতে যেমন উদগ্র মানবিকতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাত্ত্বিকতা যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ধরনের খ্রীষ্টীয় সমাচার রয়েছে। শেষের দিকে এক জায়গায় তিনি কার্ল মার্কসের ক্যাপিট্যাল বইটির নাম করেছেন নির্বাসিত বিপ্লবীদের চিন্তাধারার প্রসঙ্গে। এই নামোল্লেখ নিয়ে 'রিসারেকসান' উপন্যাসের মার্কসীয়তা বিচার করতে যাওয়াটা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, মার্কসীয় বাতাবরণের ছাপ আগের দু'টি বইএর মতো এতেও পড়েছে। তলস্তয়ের পছন্দ-অপছন্দকে অতিক্রম করেছে জীবনসত্য।

এবার কাছাকাছি সময়ের কয়েকটা ঘরোয়া উদাহরণ দেয়া যাক খানিকটা বিস্তারিতভাবেই।

আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ শতকের বিশের দশকে মার্কসীয় বাতাবরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ১৯১৭ সালের রুশ সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে। সোভিয়েত বিপ্লবের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হওয়াও এর একটি কারণ। কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কাব্যে এর সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমজীবী জনগণের বিদ্রোহের ব্যাপারটাতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়েই শিবরাম চক্রবর্তীর কাব্য ও তত্ত্বের আবির্ভাব মস্কোপন্থী হিসেবে। 'পথের পাচালী'র রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' উপন্যাসটির উল্লেখ করা দরকার এখানে বিশেষভাবে। এই উপন্যাসে নায়ক অপূর্বের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও আত্মীয় প্রণব যে কমিউনিস্ট হয়ে গেলো তাই নয়, অপূর্ব স্বয়ং এর আরণ্যক অধ্যায়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা করেছে, সেগুলি কমিউনিস্টদের পক্ষে যেতে পারতো। অপূর্ব আর প্রণব পরস্পরের পরিপূরক! এরা বিরোধী নয়। অপূর্ব তার রোমান্টিক ধারায় দেশ-দেশান্তরের পরিক্রমায় যাবার সময় বন্দী কমিউনিস্ট প্রণবকে চিঠি লিখে যায়।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার এই দিকটাকে সাধারণ আলোচনায় কোন আমলই দেয়া হয়নি। এই দিকটাকে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নিরীক্ষায়

আনা দরকার তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে ধারণার জন্যে। তবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অথবা 'অপরাজিতা' উপন্যাসকে মার্কসবাদী বলাটাও খণ্ডিত বিচার হয়ে যাবে।

এইভাবেই 'পথের দাবী' ও 'রক্তকরবী'কে দিয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন অন্যান্য সাহিত্যকৃতিকে ছাপিয়ে গেলে সেটাও খণ্ডিত বিচার হবে। এমন কি কাজী নজরুল ইসলামকে একজন পুরোদস্তুর মার্কসবাদী বলে দাবী করলে মার্কসীয় তত্ত্বের যে একটা অবিভাজ্য দিক আছে তাকে লঙ্ঘন করা হবে।

তবু বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের কাজগুলিতে মার্কসীয় বাতাবরণ অবশ্যই কাজ করেছে। আমাদের বক্তব্য এর বেশি নয়।

আরেকটি কথা।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারার উল্লিখিত শিল্পীদের সাধনার ধারাটিও বিবেচনার দাবীদার। এঁরা সকলেই জীবনশিল্পী হিসেবে জীবন-সত্যকে সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মন ছিল খোলা। শুধু বাস্তবের জন্যে নয়, সম্ভাবনার জন্যেও। আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচীতে বিশের দশকে যুক্ত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব। এর যতটা ছিল বাস্তব, তার চেয়ে বেশি ছিল সম্ভাবনা। আমাদের সাহিত্যের জীবনশিল্পীরা বাস্তবের পাশাপাশি এই সম্ভাবনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বাস্তবের চাইতে কল্পনার বাড়াবাড়ি রয়েছে বলে যে অভিযোগ আমরা অনেক সময় নিজেরাই করে থাকি, সেই বিচারবুদ্ধি এক্ষেত্রে কোন দ্বিধার সৃষ্টি করেনি। সাহিত্যে সম্ভাবনাকে নিয়ে যে বড় কাজ হয়, তারই প্রমাণ বরং এই আলোচ্য লেখাগুলিতে রয়েছে। মার্কসীয় বাতাবরণ এই প্রয়াসকে সুস্থিত করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের এবং উপন্যাস ও গল্পের এবং নিবন্ধের মার্কসীয় সত্তার ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্কের খুব বেশি অবকাশ নেই। তিনি তো আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বাংলাভাষ্যের রচয়িতাও। কিন্তু শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুটি কাজের মার্কসীয় চরিত্র বিতর্কিত হতে পারে। অন্তত 'রক্তকরবী'র অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এখানে আমাদের যুক্তিটা খুব সংক্ষেপে দিয়ে রাখছি।

শরৎচন্দ্র যখন পথের দাবী লিখছেন, তখন কল্লোলযুগের নবীনেরা সমাজের নীচুতলার নরনারীর কলরবকে সাহিত্যে আনছেন কোদালকে কোদাল রূপে চিত্রিত করে। শরৎচন্দ্র কিন্তু রেঙ্গুনের কারখানার শ্রমিকদের একেবারে মাঝখানে 'পথের দাবী' সমিতিকে বসিয়ে নীচুতলার মানুষকে এক বিশাল আয়তন দিয়ে দিলেন। এদের জীবনের মধ্য থেকে তিনি বার করে আনলেন সব্যসাচীর স্বাধীনতা ও সাম্যের বিপ্লবী তত্ত্বকে। সারা উপন্যাস জুড়ে

সব্যসাচীর বিশ্বজোড়া বিপ্লবের ব্যাখ্যার দৈর্ঘ সে সময়ে কারও কারও চোখে রসহানি বলে মনে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র পরবর্তী সময়ের জন্যেও লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাসটি।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' শতাব্দীকালের জন্যে লেখা। শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে তো নিশ্চয়ই। একে বর্তমান ভারতবর্ষের জাতীয়-সংহতির একটা জরুরী-কাজ বলেও প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। সব্যসাচীর বিপ্লবের জন্যে যারা সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকল ধর্মের সকল বর্ণের সকল অঞ্চলের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিও লেখা হয়েছিল কল্লোলযুগের শুরুতে। এর একটা প্রতীকী আবরণ রয়েছে। কিন্তু সেটি নিমিত্ত মাত্র। কারণ, রবীন্দ্রনাথ এর যে ভূমিকা লিখেছেন, তাতে চটকলের বস্তিতে 'মরতে আসা' মজুর ও মজুরনীদের সামনে রেখেই যে বাস্তবকে এঁকেছেন তা' প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেকার লেখা 'অচলায়তন' ছিল শাস্ত্রের লৌহবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'রক্তকরবী' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আলোড়িত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই নাটক। এখানে অবশ্য নানা-রকমের টানাপোড়েন রয়েছে। সেগুলো আংশিকভাবে সেই সময় বাস্তব ; কতকগুলো আবার রবীন্দ্রমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তবে যে কবি আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে বিশ্বপরিচয় লিখেছেন, তিনি মার্কসীয় অর্থনীতির তর্কবিতর্কও একেবারে শোনেননি, তা বলা যায় না। এখানে শুধু তাঁর সাঁওতাল মেয়ে কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি তাঁর চিন্তার আয়তন কিছুটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে ঃ

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে।

ঈষৎ সংকোচে ভাবি, এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনকরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধ সুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁদকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে
নিয়ে আসে মাটি।

(৪ঠা মাঘ, ১৩৪১, শান্তিনিকেতন)

৪

বিশের দশকের পরের পঞ্চাশ বছরে মার্কসীয়-বিপ্লবের সম্ভাবনার বাস্তব অংশ প্রসারিত হয়েছে। এই সময়ের প্রথম দিকে গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' লেখা এবং 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের শুরু। তবে তিরিশের এবং চল্লিশের দশকে মার্কসীয় ধারায় যাঁরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন তাঁরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা বহু প্রচারিত। এঁরা দৃষ্টান্ত হতে পারেন।

এঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর মার্কসীয় ধ্যানধারণাকে খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তিনি তিরিশের দশকের দিন বদলের পালা নিয়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছেন। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' দৃষ্টান্ত। চল্লিশের দশকেও এই ধারাকে তিনি ছাড়েননি। প্রমাণ 'মন্বন্তর' উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকের শেষের দিকে 'শহরতলী' উপন্যাসকে—শ্রমিক আন্দোলনের কাজে লাগান। চল্লিশের দশকে তিনি তিরিশের দশকের তারাশঙ্করের স্থান নেন। তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সমর্থক থেকে যান এবং এদিক দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদকে সামনে আনার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে পরিষ্কার কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার ফলে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁর তরফ থেকে সরাসরি কাজ বেরিয়ে আসে। তিরিশের দশকের শুরুতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্ট হবার ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক ছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত মতাদর্শেরও সংঘাত। চল্লিশের দশকে এই মতাদর্শের সংঘাতকে পুরোভাগে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনেই অবশ্য আমাদের উপমহাদেশের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন বরাবর। এই আন্দোলন ছিল মার্কসীয় বাতাবরণেরই সৃষ্টি। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি প্রেমচাঁদের অভিভাষণটি স্মরণীয়। তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে বসে সর্বাঙ্গীণভাবে একমত হতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা কেউ মৃত্যু পর্যন্ত প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলন থেকে সরে যাননি।

'৪৭ সালের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নতুন নতুন পরীক্ষার পটভূমিতে একটা অভিযোগ উঠেছে যে তত্ত্ব তাঁর দৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। ইদানীং কেউ কেউ এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিটাই খুব সংকীর্ণ। বস্তুতপক্ষে '৪৭ সালের পরে সারা উপমহাদেশের সঙ্গে সঙ্গে দুই বাংলায় গণজীবন ও ব্যক্তিজীবনে যে বিপর্যয় ঘটে এবং বিপ্লবের

ধারাকে নতুন করে তুলে আনবার জন্যে যে সামগ্রিক প্রয়াসের প্রয়োজন পড়ে, তাকে চোখের সামনে রাখলে বরং বলতে হবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরে থেকে সেই সময়ের বিপর্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সত্যস্বরূপকে সাহিত্যে স্থাপন করতে পেরেছেন।

দিনবদলের নতুন পালার জটিলতা ও ব্যাপকতার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের বিপ্লবের অসমান ও অাঁকাবাঁকা ধারাকে পুরোপুরি আয়ত্ত না করতে পারার ফলে সাহিত্যের সৃষ্টিতে ব্রতী লেখক-লেখিকাদের অর্ন্তজ্বালাটা কি বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয় আমাদের! এমনকি তারাশঙ্করের মনেও ছিল অসন্তোষ। একে 'ফ্রাস্ট্রেসান' বলা যেতে পারে।

সুতরাং আমরা বলবো, দোষটা মার্কসীয় তত্ত্বের নয়। বরং, নানা কারণে আমাদের সাহিত্যে মার্কসীয় তত্ত্বকে পরিহার করে চলার একটা প্রবণতার দরুণ দিনবদলের মর্মবাণীকে উচ্ছলভাবে বিশের, তিরিশের এবং চল্লিশের দশকের মতো পাওয়া যাচ্ছে না। একটা নেতিবাচকতার হাওয়া সাহিত্যের আশাবাদকে মুষড়ে দিতে চাইছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নেতিবাচক হাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির ধারাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যে সৃষ্টির ধারা আর তাত্ত্বিক ধারা এক নয় বলেই শিল্পীর মনের চূড়ান্ত যন্ত্রণা অবিশ্রান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে চায়। এই সত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শুরুতেই একটি কৈফিয়ত দিয়ে নিয়েছি যে, এই আলোচনায় কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র দাখিল করবো। সুতরাং পাঠক পাঠিকারা আলোচ্য সমগ্র সময়ের সমস্ত নামী ও অনামী কবি কথাশিল্পীদের কাজের নিজ নিজ হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটিকে খতিয়ে দেখবেন এই অনুরোধ।

এখানে বিশিষ্টভাবে গত তিরিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের একজন দুর্ধর্ষ তাত্ত্বিক ও শিল্পীর নাম শুধু করবো। তিনি হলেন বাংলাদেশের কবি ও নিবন্ধকার হাসান হাফিজুর রহমান। মাত্র ৫০ বছর বয়সে '৮৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার আদর্শের বিপ্লবী ধারাকে প্রথমাবধি লালন করে আসছিলেন তাঁর কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে; ওই চার আদর্শ জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র। '৫২ সালের রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারীর গণ-অভ্যুত্থানের ভাষ্যকার হিসেবে ছাত্রজীবনে তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল নিজস্ব শৈলীতে। আধুনিক বাংলা কবিতার জটিল মানসের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় ওই কবিতায়; তিনি আমৃত্যু এই ধারাতেই বাংলাদেশের বিপ্লবকে রূপ দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি লিখেছেন বাংলাদেশের সমৃদ্ধতম প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর তাঁর প্রবন্ধ দুই বাংলার শতাব্দীকালের একটি সম্পদ।

মার্কসীয় বাতাবরণ তার নিজস্বতাকে বিকশিত করে তুলবার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। তাঁকে আমরা বাংলাদেশের পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁর সমাহার বলতে পারি। এই দুই ফরাসী কবির মতো হাসান হাফিজুর রহমানকেও প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন নতুন শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। দাপটের সঙ্গেই তিনি সেটা করে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই আমরা আরেকটি বিষয়ে এসে পড়ছি।

৫

গত শতাব্দীকালে সাহিত্যে মার্কসবাদ যে অবদান রেখেছে, সেটা অনুকূল পরিবেশে ঘটেনি, প্রধানত প্রতিকূল পরিবেশেই ঘটেছে। বিপ্লব যেসব দেশে সফল হয়েছে, সেখানেও সাহিত্যসৃষ্টি ও তত্ত্বের ধারা নতুন সমাজ গড়ার দুঃসাধ্য প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে। অন্যত্র মূলেই বাধা এসেছে অচলায়-তনের মনিবদের তরফ থেকে। কখনও মারমূর্তিতে, কখনও রক্তকরবী নাটকের রাজার কায়দায়। বাধা একেবারে ভিতর থেকে। ফ্যাসিস্টরা উৎখাত করতে চেয়েছে লেখক-লেখিকাদের। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা লেখক-লেখিকাদের ওপর প্রচ্ছন্ন চাপ দিয়েছে কিংবা কিনতে চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এটা চলছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাহিত্যে মার্কসীয় বাতাবরণকে একটা নতুন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা হচ্ছে যুদ্ধবাজদের স্নায়ুযুদ্ধ। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ফ্যাসিবাদীরা অধিকাংশ লেখক-লেখিকাকেই ইতিপূর্বে বৈরী করেছিল, তাদের কাজকে মূল্য দিতে চায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের দুর্নিবার প্রবাহকে প্রতিহত করার স্নায়ুযুদ্ধের খাতিরে সাহিত্যে সরাসরি দখল নিতে চেষ্টা করে আসছে। ভাবাদর্শের লড়াই স্নায়ুযুদ্ধের বড় ভাগীদার। সাহিত্য ভাবাদর্শের বাহন। এই জন্য সাম্রাজ্যবাদ সাহিত্যে শিবির গড়েছে এবং এই শিবিরে লেখক-লেখিকাদের ছলে বলে কৌশলে ঢোকাবার জন্য একটা রণনীতি গড়ে তুলেছে। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ কোন মানবিক মূল্যবোধ জোগাতে অসমর্থ, সেজন্য তার সাহিত্য শিবিরের ভাবাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানবজীবনের অর্থহীনতা ও নৈরাশ্য, নিছক জৈব জীবনের উৎপ্রেক্ষা।

সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীর সাহিত্য-তাত্ত্বিক গিওর্গি লুকাচ সাম্রাজ্যবাদের এই স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে তাঁর নব প্রকাশিত 'যৌক্তিকতার বিনাশ' বা 'দি ডেষ্ট্রাকশন অব রিজন্' বইটিকে নিয়োজিত করেন। এতে তিনি দেখান যে, মাকিন সাম্রাজ্যবাদ হিটলারের স্থান গ্রহণ করেছে এবং মানুষের বিচারবুদ্ধির

বিনাশ সাধন করে একটা উন্মত্ত জনমতকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত করার চেষ্টা করছে।

বইটি প্রধানত দর্শনভিত্তিক। তবে লুকাচ বিশেষ করে বইটির উপসংহার অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিভাজন ও বিভ্রম সৃষ্টির প্রয়াসগুলিকে উদঘাটিত করেছেন। '৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরেই যে সাম্রাজ্যবাদের ওই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণও এই বইতে রয়েছে। অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিশিষ্ট লেখক সেদিন শূন্যতাবাদের পরিপোষক হিসেবে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের পক্ষভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, লুকাচ তার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবসমাজের তরফ থেকে যৌক্তিকতার নব-অভ্যুদয়ের সমাবেশ হিসেবে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসকে লুকাচ আশার পতাকা হিসেবে স্থাপন করেছেন বইটিতে। সার্ত্রের মতো লেখকরা সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এই তাঁর বক্তব্য।

সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের একটা বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় বিভীষিকা ও সন্ত্রাস। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে অতীতে কোন সময়ে সাধারণ মেলামেশার জন্যেও শতশত সাংস্কৃতিক কর্মী ও লেখক-লেখিকাদের রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা ছাড়াও নানাভাবে নিগ্রহ করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মার্কসবাদী সংগঠনের ওপর প্রচণ্ড নিগ্রহ তো নেমে আসেই। চার্লস চ্যাপলিনকেও তাঁর কর্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সপরিবারে বেরিয়ে আসতে হয়। তাঁর স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী ও পুত্রকন্যা নিয়ে দেশত্যাগ করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। মার্কসবাদী লেখক-লেখিকাদের তো কথাই নেই, সাধারণ বিবেকসম্পন্ন লেখক-লেখিকাদের যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা' চার্লস চ্যাপলিনের লাঞ্ছনা থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের যে তল্পীবাহকেরা বিভিন্ন দেশে সাহিত্যের মার্কসীয় বাতাবরণকে নষ্ট করে দেবার জন্যে প্রয়াস আজও চালিয়ে আসছে, তারা স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-লেখিকাদের নিগ্রহের ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। সাধারণভাবে এই অধ্যায়টা চাপা পড়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশ্ববিদিত লেখক ১৯৪৮ সালের বিভীষিকার দিনগুলিকে তাঁর একটি নতুন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এই লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট। উপন্যাসের নাম 'দি এস্টাব্লিশমেন্ট'। ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রকাশিত।

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ উপন্যাসে রয়েছে ১৯৪৮ থেকে '৫০ সালের

ঘটনাবলী। এতে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, চেকোস্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোরিয়ার যুদ্ধের সূচনা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছাড়া বাদবাকী সবটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবনের ছবি। উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছে একটি বিত্তবান পরিবারের লেখিকা কন্যা। এই কন্যা বিয়ে করেছিল স্পেনে প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে যোগদানকারী আন্তর্জাতিক লিনকন্ ব্রিগেডের একজন মার্কিন ইহুদী স্বেচ্ছাসেবীকে। এদের পরিচয় হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্তে প্যারিসে। মেয়েটি তখন একজন লেখিকা হিসেবে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মীদের সংস্পর্শে আসে। যুদ্ধ বাঁধার পরে দেশে ফিরে আসে। এটা হচ্ছে পশ্চাদ্‌পট। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, গোয়েন্দা পুলিশ মেয়েটির খোঁজ খবর নিচ্ছে। ব্যাপারটা মেয়েটির পরিবার পরিজনের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল। বিশাল বিত্ত এদের সকলের। কালিফোর্নিয়ার সর্বত্র ছড়ানো। মেয়েটির ভাই তখন এস্‌টাব্লিশমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। এস্‌টাব্লিশমেন্টের অর্থ হচ্ছে সেই বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা। মেয়েটি অবশ্য ভিন্ন ধরনের। সে বরং তার অর্থসম্পত্তিকে একটা সেবাসংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। এই সেবাসংস্থার সূচনা হয়েছিল স্পেন থেকে ১৯৩৮-৩৯ সালে ফ্রান্সে শরণার্থী আহত প্রজাতন্ত্রীদের চিকিৎসার জন্যে। সে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যা ছিল না, কিন্তু শ্রমিক ধর্মঘটের সময় সাহায্যকেন্দ্রে কাজ করেছে। লেখাই এখন তার পেশা। এ সব সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো সে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সমগ্র উপন্যাসটির মূল ঘটনাধারা এই অভিযোগ, কংগ্রেসী তদন্ত, বিচারালয়ে বিচার, কারাদণ্ড এবং কারাজীবনের কথা। স্বাধীনচেতা এই লেখিকাকে জেলখানায় পায়খানা সাফ করতে হয়েছে। তারই কারাজীবনের সূত্রে যেসব বন্দিনীর কথা আছে, তাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে মার্কিন সমাজ-ব্যবস্থার গভীর সংকটের ছবি আছে। তবে উপন্যাসটির প্রধান চিত্র লেখিকার নির্যাতন। অন্ধ সোভিয়েতবিরোধী স্নায়ু-যুদ্ধের রণনীতির পাশবিক চিত্র। 'স্পার্টাকাস' ও 'ফ্রীডম রোড' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা হাওয়ার্ড ফাস্টকে ঐ সময়ে যে অভিযোগ ও নির্যাতন ও বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এই 'দি এস্‌টাব্লিশ্‌মেন্ট' উপন্যাস কি তারই কাহিনী? এতদিন পরে লিখলেন কেন? হাওয়ার্ড ফাস্ট তো বস্তুত পক্ষে নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি'র বলয় থেকে। তিনি কেন এ ধরনের উপন্যাস লিখলেন? এই প্রশ্নের জবাবের জন্যে তাঁর গত তিরিশ বছরের সাহিত্য ও জীবনকে জানা দরকার। সেটা এই নিবন্ধে সম্ভব হয়নি। তবে উপন্যাসটিকে এখানে যথাযথ উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমরা যা দেখাতে চাই তা দিতে পেরেছি বলেই আমাদের ধারণা।

বর্তমানে সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ু-যোদ্ধারা সরাসরি নিপীড়ন ও বিভীষিকার পথ নিচ্ছে না অথবা নিতে পারছে না। কিন্তু তারা বিভাজন ও বিভ্রান্তিসৃষ্টির উপায় ও প্রয়াসগুলোকে স্নায়ুযুদ্ধের কাজে জোরেশোরে লাগাচ্ছে। তবে সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকেরা বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায় নিপীড়ন ও বিভীষিকার পথটাকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়াস তো আছেই। তবে আশাবাদ দমিত হয়নি। সমাজতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসারিত হচ্ছে। সাহিত্য এক্ষেত্রে অস্ত্রের চেয়ে কম কাজ করছে না।

৬

লাতিন আমেরিকাতে মার্কসীয় বাতাবরণের কাজ সাহিত্যে সমস্ত বিভীষিকা ও বিভ্রান্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। গত দুই দশকের মধ্যে লাতিন আমেরিকার যে দুটি উপন্যাসকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে তারা হলো গুয়াতেমালার আস্টুরিয়সের লেখা 'দি সাইক্লোন' এবং কলাম্বিয়ার মার্কোয়েসের 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা'। এই উভয় উপন্যাসেই দেখানো হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজিপতিরা লাতিন আমেরিকার ছোট ছোট দেশগুলিতে একইভাবে বৃহৎ ভূস্বামী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'দি সাইক্লোন' উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারটাই এই আগ্রাসন নিয়ে লেখা। 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা'য় এই আগ্রাসন উপন্যাসের একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা দু'টি উপন্যাসেই তীব্রতায় প্রায় সমান। এই আগ্রাসনের ওপর প্রকৃতির প্রতিশোধটা প্রতীকী। ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের চেতনা।

এরা দু'টি দৃষ্টান্ত। এটাই হচ্ছে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সাধারণ ধারা। এখানেও বলে রাখা যেতে পারে যে, এই সব লেখায় মার্কসের নাম কিংবা মার্কসীয় তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই। তা সত্ত্বেও এরা মার্কসীয় বাতাবরণকে শক্তিশালী করেছে। এরা যে একটা বিশেষ অনগ্রসর অঞ্চলের নরনারীর অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে বৃহত্তর জগতের কাছে অপরিচিত একটা পরিবেশকে ভিত্তি করেই কাজ করেছে, সেখানেও মার্কসীয় বিশ্ববিপ্লবের অন্তঃস্রোতগুলি সক্রিয়। এইভাবে আঞ্চলিকতা যুক্ত হয়েছে সমগ্র মহাদেশ কিংবা জগতের সঙ্গে। মার্কসীয় বাতাবরণের এটা একটা বড় কাজ।

সর্বক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজয়বৈজয়ন্তীকে চিহ্নিত না করেও কি প্রখ্যাত মার্কস-পন্থী লেখকেরা এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাননি? তত্ত্বকে ও বাতাবরণকে শক্তি জোগাননি?

এ ধরনের কাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শলোকভের উপন্যাস 'ডন নদীর গতিপথে', হো চি মিনের 'কারাগারের রোজনামচা' এবং পাবলো নেরুদার 'মচ্ছুপিচ্ছু' কাব্যের নাম করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি বা উপন্যাসিক তাঁদের কাজের ভূমিকাতে মার্কসীয় ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্বের কথা জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় সত্য ও প্রাণবন্ত অনুভবকে কোন মার্কসীয় সংজ্ঞা ছাড়াই উপস্থিত করা হয়েছে। এটাও একটা ঘটনা। সম্প্রতি গণচীনের আধুনিক কবি আই চিংএর বেজিং থেকে প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ এই ঘটনার দৃষ্টান্ত।

৭

সাহিত্যের সৃষ্টির ধারার পাশাপাশি তত্ত্বের ধারাও মার্কসীয় তত্ত্ব ও মার্কসীয় বাতাবরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈভব তৈরী করেছে। এই বৈভব সৃষ্টির ধারাকে সঞ্জীবিত ও অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এ সম্বন্ধেও দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে নিবন্ধ শেষ করবো।

গিওর্গি লুকাচ তিরিশের দশকের শেষের দিকে মস্কোতে বসে 'ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদের নিরীক্ষা' (Studies in European Realism) নাম দিয়ে যে বইখানি বালজাক প্রমুখ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, হাঙ্গেরীতে ফিরে গিয়ে তার একটি ভূমিকা লিখেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এই ভূমিকার একটি অংশ নিম্নরূপ।

"মার্কসবাদ প্রত্যেকটি ঘটনার বৈষয়িক মূলসূত্রকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চালায় এবং এই সব ঘটনাকে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কে ও গতিধারায় স্থাপন ক'রে সেই নিরিখে বিচার করে দেখে। মার্কসবাদ এই গতিধারায় বিধানগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে এদের মূল থেকে ফুল পর্যন্ত বিকাশকে প্রামাণ্য বলে প্রতিপন্ন করে নেয়। এইভাবে এগিয়ে চলে মার্কসবাদ প্রত্যেকটি ঘটনাকে নিছক আয়েশী, যুক্তিবহির্ভূত ও অতীন্দ্রিয় কুয়াশার ঘের থেকে মুক্ত করে তুলে আনে এবং বোধের উজ্জ্বল আলোয় উপস্থিত করে।"

মার্কসবাদে গোঁজামিল দেয়া কিংবা মার্কসীয় মূলসূত্রগুলিকে অনমনীয় ও অকেজো বলে অভিহিত করা দূরে থাকুক, লুকাচ সাহিত্যের যত বেশি বিস্তারে ও গভীরে প্রবেশ করেছেন ততই বেশি করে মূলসূত্র নিয়ে কাজ করেছেন এবং মার্কসীয় মূলসূত্রের পুনরুজ্জীবনের বা রেনেসাঁর তাগিদ দিয়েছেন। তবে তিনি এইসব মূলসূত্রের স্থূল প্রয়োগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে মার্কসীয় মূলসূত্রগুলি চূড়ান্ত সূক্ষ্ম জীবনের তন্তুগুলির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় এই সূক্ষ্মতম তন্তুগুলি কাজ

করে। স্থূলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লুকাচের বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ ও নিরীক্ষক বাস্তবতাবাদকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে দেখানোর মধ্যে।

তত্ত্বের প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত।

মার্কসীয় তত্ত্ব ও বাতাবরণ দিয়ে আফ্রিকাতে যারা মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী রয়েছেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট গল্প ও উপন্যাসের লেখক আলেক্স লা গুমা। তিনি ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপত্র 'সেচাবা'তে আফ্রিকার গিনি বিসাউ' এর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমিলকার কাব্রালের বক্তব্যকে সংগ্রামের দিকদ্রষ্টা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আফ্রিকাতে মার্কসবাদী বাতাবরণের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক এই আমিলকার কাব্রাল। তিনি ইউনেস্কোতে পঠিত তার সংস্কৃতি বিষয়ক নিবন্ধে লিখেছিলেন ঃ "সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্যের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক নিপীড়নের আশ্রয় নেয়। অপর দিকে নিপীড়িত জনগণ যে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলতে এবং তাকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, তার মূলে থাকে তাদের সংস্কৃতি। প্রচণ্ড নিপীড়নের মুখেও জনগণ তাদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে। কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ চূর্ণ হবার পরেও তারা যে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়, সেটা সাংস্কৃতিক।"

এখানে মার্কসীয় তত্ত্ব সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় তুলে দিয়েছে প্রচণ্ড আশাবাদ।

দস্তয়েভস্কি ঃ দিন বদলের পালায়

উনিশ শতকের রুশকথাশিল্পী ফিওদর দস্তয়েভস্কি সম্বন্ধে 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থে হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ গিওর্গি লুকাচ ১৯১৪ সালে লিখেছিলেন যে, দস্তয়েভস্কি অনাগত লেখক লেখিকাদের জন্যে এক নতুন ধরনের বাস্তববাদের খসড়া রেখে গিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 'খসড়াগুলো' সমগ্র বিশ শতকের বিশ্ব সাহিত্যের প্রাণবন্ত ধারা হিসেবে আজও সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগের গল্পে উপন্যাসে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' এবং 'দি ইডিয়ট' উদ্দাম মানবতাবাদী যৌবনের ভাবের ঘোর যুগিয়েছিল। সেই থেকে দস্তয়েভস্কির গল্প-উপন্যাস বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাকে টানে তাঁর এই পরিচিতিকে সামনে রেখে। বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিনবদলের পালায় তাঁকে ঘিরে যে ভাবাদর্শের লড়াই চলছে সেটাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

দস্তয়েভস্কির কষ্টিপাথরে সাহিত্যে একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদী-সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে কিছুটা ফুটিয়ে তোলাও এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতন্ত্রের প্রসার ও জাতীয় মুক্তির প্রবাহকে ঠেকাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিজমের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে যুগপৎ ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই চালিয়ে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুদয়কে স্তব্ধ করার জন্যেই পঞ্চাশের দশকে শাসকচক্র আইন করে কমিউনিজমের প্রচারকে নিষিদ্ধ করেছিল। এরা এই লড়াইয়ে সাহিত্যকেও একটা বড় রকমের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

আইরিশ জোটনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কোনার ক্রুইজ ও'ব্রায়েনের লেখা 'রাইটার্স এণ্ড পলিটিক্স' বইটিতে এই সাহিত্যের ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বইটির ১৯৬৫ সালের সংস্করণে 'দুই ভল্লুক' নামের নিবন্ধে ও'ব্রায়েন জনৈক মার্কিন লেখকের 'দস্তয়েভস্কি অথবা

তলস্তয়' নামক গ্রন্থের একটা সারমর্ম দাখিল করেছেন। সারমর্মটা হলো এই যে, গ্রন্থকারের মতে তলস্তয় ও বলশেভিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তলস্তয় বলশেভিকদের মতো বিশেষ কতগুলো নীতির কাঠামোতে জনগণকে কায়িক ও মানসিকভাবে গড়ে তুলতে চান। দস্তয়েভস্কি এই ধরনের কাঠামোর বিরোধী। 'দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়' গ্রন্থের লেখক তলস্তয়কে বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টবিরোধী এবং প্রকারান্তরে বিধাতাপুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকামী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে বলশেভিকদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। তিনি দস্তয়েভস্কিকে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের একাগ্র অনুগামী এবং মানবতাবাদের উদার প্রতিভূ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। এইভাবে দস্তয়েভস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ভাবের লড়াইতে নিয়োজিত করা হয়েছে।

ও'ব্রায়েন তাঁর নিজস্ব জোটনিরপেক্ষতাবাদী বিচার বিবেচনা দ্বারা 'দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়' গ্রন্থের তলস্তয়বিরোধী যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলশেভিকদের সমর্থনে কিছু বলেন নি। তবে ঠাণ্ডা লড়াই-এর পশ্চিমী প্রবক্তারা কি সাংঘাতিক অজ্ঞতা ও অন্ধতা এবং যুক্তিহীনতার আশ্রয় নিতে পারেন, সেদিকটাকে প্রকটভাবেই তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে ও'ব্রায়েনের বিশ্লেষণের বিস্তারিতে যাব না। এখানে শুধু কিভাবে দস্তয়েভস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার একটা নমুনা দেয়া হলো মাত্র।

দস্তয়েভস্কিকে পশ্চিমী স্নায়ুযুদ্ধবিদরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে কমিউনিজম তথা মার্কসবাদী লেনিনবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আরও বহু কায়দায় ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যেসব প্রবক্তা পশ্চিমী স্নায়ুযুদ্ধের পরিচালকদের খপ্পরে পড়েন, তাঁরা দস্তয়েভস্কিকে তাঁদের পথিকৃত বলে ঘোষণা করেন এবং দস্তয়েভস্কির উপন্যাস ও গল্পের ব্যাখ্যাও করেন সেইভাবে। তাছাড়া, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে প্রচার চালান যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কি বর্জিত, উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এই প্রচারও নানা ধরনে করা হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের নায়করা দস্তয়েভস্কিকে শুরু থেকেই বাতিল করে দিয়েছেন। আবার কখনও বলা হয়েছে যে, শুরুতে সম্মান দেখানো হলেও পরে তাঁকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমী প্রচারে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দস্তয়েভস্কি পৃথক মতের, পৃথক ভাবাদর্শের মানুষ। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে 'ডিসিডেন্টের' মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে যাঁরা

ডিসিডেন্ট হিসেবে মাঝে মাঝে উদ্ভূত হয়ে থাকেন, তাঁদের উঁচু শিল্পী ও বিজ্ঞানীর জাতে তুলবার জন্যে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা দস্তয়েভস্কির নামকে ব্যবহার করেছেন। সাধারণত দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ডিসিডেন্টরা খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করেন। দস্তয়েভস্কিকেও যে এই প্রচারণায় খৃষ্টানুসারী ও আধ্যাত্মসাধক রূপে উপস্থিত করা হয়, তার কারণটাকে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

২

এখানে স্বভাবতই আমরা জানতে চাইবো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য ঠিক কি ধরনের। দস্তয়েভস্কির সমাদর ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা, ধারাবাহিকতা, গভীরতা ও মতাদর্শগত মূল্যায়নে কি পশ্চিমী বিরুদ্ধ প্রচারণার যথেষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে?

এ ক্ষেত্রেও দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা দেখাবো যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কিকে বরাবর যে সম্মান দেয়া হয়ে আসছে, তার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। ১৯২১ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দস্তয়েভস্কির জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি লিখেছিলেন, 'দস্তয়েভস্কি হচ্ছেন মহাশক্তির সামাজিক বিবেক'। উনিশ শতকের বস্তুবাদী 'গণতন্ত্রী' লেখক বেলিনস্কির যে রচনাবলী সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়, তাতেও তদানীন্তন উদীয়মান লেখক দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাসের হৃদয়গ্রাহী মূল্যায়ন ছিল। বেলিনস্কী ছিলেন দস্তয়েভস্কির প্রথম দার্শনিক শিক্ষক-সাথী। ১৯৮১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কির মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। ১৯৮১'র সোভিয়েত ইউনিয়নের ইনস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরা (Instrannya Literatura) দস্তয়েভস্কির ওপর যে আলোচনার ব্যবস্থা করে, তার একটি বিবরণ এই পত্রিকার ১৯৮১'র প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এই বিবরণটিই সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির ইংরেজী মুখপত্র 'সোশ্যাল সায়েন্সস' পত্রিকার '৮২ সনের ১নং সংখ্যায় অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনার একটি চুম্বক আমরা এখানে দাখিল করছি। তার আগে একটি কথা বলে রাখা যায়। এই আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলেরই দস্তয়েভস্কির ওপর বই রয়েছে। অর্থাৎ, সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কির বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর ও ব্যাপকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আইনস্টাইন শতবার্ষিকীর

সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি আইনস্টাইন-জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। বইটি লিখেছেন কুজনেতসভ। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানে আইনস্টাইন এবং শিল্পরূপে দস্তয়েভস্কিকে এই লেখক একই ধরনের সঙ্গতির স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ বিপুল অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনবার ক্ষমতার দিক দিয়ে দুজনে তুলনীয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনীতে দস্তয়েভস্কির এধরনের উল্লেখ আমাদের এক মার্কসবাদী বন্ধু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে না শোনালে হয়তো আমরা খেয়াল করতাম না। এই সূত্রেই জানা গেল, আইন টাইনের আলোচ্য জীবনী লেখক দস্তয়েভস্কিরও জীবনী রচনা করেছেন। সেই বইটির তর্জমা পাওয়া যাবে কিনা জানিনা। তবে আইনস্টাইনের জীবনী থেকেই বুঝতে পারা যায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আগ্রহ কত সামগ্রিক।

উপরে উল্লিখিত ইনস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরায় প্রকাশিত আলোচনার সারমর্মটি নিম্নরূপ ঃ

১. দস্তয়েভস্কির চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত গণবৈপ্লবিক রাজনীতিকে বর্জন করে মানুষের আধ্যাত্মিক মোক্ষের দিকটাকে প্রাধান্য দিলেও জনগণের ভ্রাতৃত্বের দাবী ও আদর্শকে প্রবলভাবেই ধরে রেখেছে। ফরাসী বিপ্লবের লির্বার্টি ও ইকুয়েলিটিকে রাজনৈতিকতার দিক দিয়ে পরিত্যাগ করলেও দস্তয়েভস্কির ফ্রেটারনিটি তাঁর রচনাবলীকে শেষ পর্যন্ত ঐক্যসূত্রে গেঁথে রেখেছে।

২. মার্কসের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের মানবাত্মা সম্পর্কিত বক্তব্যের আলোকে দস্তয়েভস্কির মানবাত্মার বিচারকে বুঝতে পারা যায়। দস্তয়েভস্কি বুর্জোয়া অমানবিক অর্থসর্বস্বতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, যেমনটি ছিলেন মার্কস।

৩. ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদের দুটো ধারা। একটা ধারা হচ্ছে, মন ও মানসিকতা থেকে বস্তুজগতে যাওয়া। এই ধারার শিল্পী সার্ভেন্টিস, রাবেলাইস ও স্তান্দাল। আরেকটি ধারা হচ্ছে বস্তুজগত থেকে মন ও মানসে যাওয়া। এই ধারার শিল্পী বালজাক। দস্তয়েভস্কি প্রথম ধারার শিল্পী।

৪. দস্তয়েভস্কির চিত্রকল্পগুলি অস্তিত্বের বিকাশের অভিব্যক্তি। এরা বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গীয় চিত্রকল্পের বিপরীত।

৫. দস্তয়েভস্কির গল্প উপন্যাসের চরিত্রাবলীতে যেসব অতিপ্রাকৃত দিক রয়েছে, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে বাস্তব মানসিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ও বিন্দু বিন্দু ছবি দিয়ে গড়া।

৬. শেকসপীয়র এবং দান্তে যেমন তাঁদের নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ দেশের শৈল্পিক অভিব্যক্তির জাতীয় ধারাবাহী ছিলেন, দস্তয়েভস্কিও তেমনি তাঁর নিজযুগের নিজ দেশের শৈল্পিক অভিব্যক্তির ধারাবাহী ছিলেন।

৭. মানুষকে সমাজতন্ত্র, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র থেকে এবং তার ভাব ও আদর্শ থেকে আলাদা করা যায় না। এটাই হচ্ছে দস্তয়েভস্কির মনস্তাত্ত্বিকতা। দস্তয়েভস্কি নিজেই বলেছেন যে, তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক লেখক বলা হয়, তবে তিনি আসলে একজন বাস্তবতাত্ত্বিক।

দস্তয়েভস্কির প্রথম গুরু হেগেল। তিনি নিশ্চয় হেগেলের ইতিহাসের দর্শন গ্রন্থটি পড়েছিলেন। এর প্রতিফলন রয়েছে তাঁর 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে। তবে তিনি অন্ধভাবে হেগেলের অনুসরণ করেননি। হেগেল তাঁর নায়কদের "যা কিছু বাস্তব তাই যুক্তিসঙ্গত"- সূত্রের মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। কিন্তু দস্তয়েভস্কি তাঁর সময়ের বর্তমান বাস্তবের নিন্দা করেছেন অবিচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে।

৮. দস্তয়েভস্কি চিন্তার রাজ্যে কখনও নিঃসঙ্গ ছিলেন না। শুরুতে তিনি রুশ বস্তুবাদী বেলিনস্কির সাহচর্য পেয়েছিলেন। এর পরে প্রতিটি পর্বে তাঁর দুয়েকজন করে দার্শনিক সঙ্গী ছিলেন। 'দি ইডিয়ট' উপন্যাসটি লিখবার সময় দস্তয়েভস্কি ভলটেয়ার ও ডিডেরোর গ্রন্থাবলী পড়েছিলেন।

৯. দস্তয়েভস্কির 'দি পসেসড' বা 'দানোয় পাওয়া' উপন্যাসটিতে সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের ধিক্কার দেয়া হয়েছে। স্বভাবতই বরাবরই এই বইটি বিতর্কের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটি বিতর্কমূলক সন্দেহ নেই। তবে মতাদর্শগত উগ্রতার পরিণাম চিন্তা করে এবং বিশ শতকের পর্বে পর্বে এই উগ্রতা যে অপহ্নব ঘটাচ্ছে তার আলোকে এই উপন্যাসটিকে দেখতে হবে।

১০. তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের ঠিক পরেই দস্তয়েভস্কির 'দানোয় পাওয়া' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন, তলস্তয়ের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর হিসেবেই দস্তয়েভস্কির এই বই লেখাও তাঁর বক্তব্য।

কিন্তু একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, সমস্ত দিক দিয়ে উপন্যাস দুটি আলাদা। বিষয়বস্তু ও কাহিনী রচনার শৈলী, স্থান ও কাল, কালক্রম ও তার গতি, ছন্দ ও দ্বন্দ্ব সবই আলাদা। এদের যোগ এবং সাদৃশ্যও রয়েছে। দুটি উপন্যাসেই রয়েছে শিল্পরূপের বিন্যাস, বাস্তবতার বিন্যাস, রুশ বাস্তবতার বিন্যাস। দুটি উপন্যাসেই রয়েছে সত্যের উপস্থাপন এবং জনগণের দুঃখকষ্টের জন্যে যন্ত্রণা,—রাশিয়ার জন্যে, মানুষের জন্যে, মানবসমাজের জন্যে যন্ত্রণাবোধ।

সুতরাং, এই দুটি উপন্যাসকে কিংবা তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে তাঁদের একই সুর বিন্যাসের পরিপূরক হিসেবে দেখা উচিত।

১১. দস্তয়েভস্কি যে সম্পদ রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াপন্থী সূত্রগুলির তুলনায় বিপ্লবী সত্যগুলি অপরিমেয় ভাবে প্রবল।

৩

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দস্তয়েভস্কিকে বর্জন করা দূরে থাকুক, তাঁকে সব সময়েই বড় করে সামনে রাখার দিকটাকে সামনে জাগরুক রাখলে দিন বদলের পালায় দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে লড়াই-এর আরেকটা ব্যাপারও পরিষ্কার হতে পারে।

সেটা এই যে, সামাজ্যবাদীরা যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ওপর ভর করে আসছে, তাঁরা শুধু দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে নয় তথাকথিত সমস্ত ডিসিডেন্টদের ক্ষেত্রেই সত্যের নামে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার অধিকার দাবী করলেও নিজেরা সত্য ও সামগ্রিকতার ধার ধারেন না। দস্তয়েভস্কির মাত্র একটা দিককে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়ে তাঁরা তথাকথিত ডিসিডেন্টদের দস্তয়েভস্কির স্তরে তুলতে চান।

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার লৌহনিগড়ে আবদ্ধ দেশগুলিতে বিদ্রোহী শিল্পী সাহিত্যিকদের বরাবরই যে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে সত্যকথনের অপরাধেই, তার কথা এখানে বিস্তারিতভাবে আনার দরকার নেই। শুধু মার্কিন বিপ্লবী মানবতাবাদী ঔপন্যাসিক জ্যাক লণ্ডনের বসতবাড়িটিও যে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াইএর পশ্চিমী সাহিত্য তাত্ত্বিকরা সাহিত্যকে ব্যবহার করার ব্যাপারে নৈতিকতার ধার ধারে না। সুতরাং দস্তয়েভস্কিকে ব্যবহার করাটা একটা পরিহাসও বটে। দস্তয়েভস্কির একটা বড় উপাদান ছিল নৈতিক শক্তির উদ্বোধন। পশ্চিমী স্নায়ুযুদ্ধবিদরা একজন শিল্পীকে সমগ্রভাবে উপস্থিত করার নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে আসছেন। তাঁদের কাছে দস্তয়েভস্কি শুধুমাত্র তাঁদের কাজের কাজি।

৪

সোভিয়েত ইউনিয়নের গত সাত দশকের পর্বে-পর্বান্তরে দস্তয়েভস্কিকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যখন তাঁর কোন কোন দিককে নেতিবাচক বলা হয়েছে, তখন তাঁর ইতিবাচক দিকগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে সামনে আনা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত ইনাস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরার আলোচনার বিবরণটিতে এই পর্যালোচনার ধারা পরিষ্কারভাবে সামনে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বলা দরকার, এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপার নয়। এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ। সকল দেশেই মার্কসীয় বিচারের সাধারণ প্রয়োগ।

এই প্রসঙ্গে হাঙ্গেরীর গিওর্গি লুকাচের সর্বশেষ লেখায় দস্তয়েভস্কির যে উল্লেখ রয়েছে তাকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে দস্তয়েভস্কিকে দেখবার ধারাবাহিকতা হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

গিওর্গি লুকাচ শুধু নিছক দার্শনিক বা সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ ছিলেন না। তিনি ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক হিসেবে জার্মানিতে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি সাহিত্যে, সৌন্দর্যে এবং দর্শনে মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বের ধারাবাহিক প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭১ সালে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বহু উত্থানপতনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই মনীষী একটি আত্মজীবনী লিখে রেখে গিয়েছেন। দীর্ঘজীবনের এবং বিশ্বব্যাপী আলোড়নের কয়েকটিমাত্র চুম্বক তিনি দিতে পেরেছেন এই খসড়ায়। এর মধ্যেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তলস্তয় এবং দস্তয়েভস্কির কাছ থেকেই তিনি প্রথম যৌবনে পৃথিবীকে বদলে দেবার বিপ্লবের একটা আদল ও আদর্শ পেয়েছিলেন।

তলস্তয় এবং দস্তয়েভস্কি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন যদি তিনি অনুভব করতেন তবে তা নিশ্চয় লিখে যেতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। ১৯১৪ সালে যা বলেছিলেন, সেই কথাই আত্মজীবনীতেও বলেছেন। তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি ছিলেন জরাজীর্ণ শোষণ ও বঞ্চনা এবং যুদ্ধে আকীর্ণ পৃথিবীকে নতুন মুক্ত পৃথিবীতে রূপান্তরিত করার প্রথম দিশারীদের মধ্যে দুজন।

লুকাচের এই আত্মজীবনীর খসড়ার আরেকটা চুম্বক আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। লুকাচ তিন জায়গায় তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কিকে একসঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

লুকাচ দেখিয়েছেন যে, মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের কাছে এঁদের দুজনকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করাটা একান্তই স্বাভাবিক। দুজনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। ব্যবহারে দুজনের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুজনেই শোষণমুক্ত ও যুদ্ধ মুক্ত পৃথিবী গড়ার কাজে অপরিহার্য। কারণ দুজনেই যুগযুগান্তের বঞ্চিত ও দুঃখী জনগণকে তাদের শিল্পরূপের মর্মকেন্দ্রে গভীর আন্তরিকতা দিয়ে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দার্শনিক বক্তব্যের তলা খুঁড়লে দুজনেরই লেখা থেকে বেরিয়ে আসে কোটি কোটি ভূমিদাসের মুক্তির আর্তি।

প্রবীণ ও নবীন দুই মহাবিদ্রোহী সহযোগী

১

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদী অবক্ষয়, জাতিগত ও বর্ণগতবৈষম্যের নিপীড়ন ; আরেকদিকে আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়-মুক্তি, শান্তি, গণতন্ত্র ও জাতিগত ও বর্ণগত সাম্য প্রতিষ্ঠার গণঅভ্যুদয়। এই দুইএর পাশাপাশি শতাব্দীর শেষ পর্বে আমরা এমন কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন বা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি যেগুলির মধ্যে কোন-কোনটি প্রাচীন হলেও গত শতকের শেষ দিক থেকে নতুন আকার নিয়েছে। কোন কোনটি আধুনিক হলেও তীব্রতায় শতাব্দীকালের মধ্যেই বহু পুরানো সমস্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

এখানে আমরা এই ধরনের পুরানো ও নতুন মিলিয়ে চারটি প্রশ্নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে দুজন লেখকশিল্পীর সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ডে খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি। এঁরা হলেন ফ্রান্সের রোমাঁ রলাঁ এবং জার্মানীর আর্নেস্ট টলার। রলাঁর জীবনকাল ১৮৬৬-১৯৪৪। টলারের জীবনকাল ১৮৯৩-১৯৩৯। এঁরা দুজনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজনকারীর অবস্থান নিয়েছিলেন। এঁদের কাজে আমাদের আলোচ্য প্রশ্নগুলির মোকাবেলা দুটি প্রজন্মের পরম্পরায় আমাদের সময়ের মধ্যেও এসে গিয়েছে। এই পরম্পরায় রয়েছে সহমর্মিতাও।

যে চারটি প্রশ্নের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে আমরা খতিয়ে দেখবো, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(এক), বার্ধক্য বা প্রৌঢ়ত্ব এবং যৌবন বা তারুণ্যের পারস্পরিক বোঝা-পড়ার সম্পর্ক। সমস্যাটা শুধু দুই বা বহু ব্যক্তির বয়সের ব্যবধান নয়, একক ব্যক্তির বয়সের তারতম্যেরও সমস্যা। ব্যাপারটা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু গত এক শতকে ও সম্প্রতি বার্ধক্য ও যৌবনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধের নিদারুণ অবনতি ঘটেছে। সামাজিক ও পারিবারিক এবং আত্মজীবনে বয়সের তারতম্যের অবমূল্যায়ন নিয়ে আসছে তিক্ততা ও উপেক্ষা। জীবন ও মৃত্যুর ভাবনাচিন্তাদর্শনও এতে জড়িয়ে পড়ছে।

(দুই), ব্যবহারিক জীবনে আধনিক বিজ্ঞানের যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্বিবিধ সমস্যার আমদানী করেছে। প্রথমত, মানুষের প্রকৃতিদত্ত গতিকে

যন্ত্রের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রের দাম মানুষের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটা যেমন মানবিক ও বৈজ্ঞানিক সংকটের, তেমনি এর সমাধানও আধুনিক জীবনে ভারসাম্য আনার এবং মনুষ্যবোধের নতুন প্রয়োজনীয়তার।

(তিন), ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক। এই সমস্যাটি সমাজের এবং সেই সঙ্গে পরিবারের ক্রিয়াকান্ডে জড়িত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতার প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতার প্রশ্ন। আমাদের সময়ে সমাজতন্ত্র ব্যক্তি ও সমষ্টির সহযোগিতাকে স্বচ্ছন্দ ও গভীর এবং প্রসারিত করছে। তেমনি অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস ও মৃত্যু থেকে একটা বিচ্ছিন্নতার দর্শন প্রবল বেগে বেরিয়ে এসেছে। ধ্রূপদী ইউরোপীয় দর্শনের এলিয়েনেশন (অন্যভবন বা খণ্ডীকরণ) তত্ত্বকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতা বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের বদ্ধমূল ধারণা দিয়ে ব্যক্তিকে ঘিরে দিচ্ছে।

(চার) শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্বে নতুন মাত্রা। শ্রমিকশ্রেণী আজ বহুদেশে সমগ্র সমাজের নিছক বাহক থেকে পরিচালকের ভূমিকায় চলে এসেছে। সাধারণভাবেও শ্রমজীবীমাত্রই এই ভূমিকায় যুক্ত হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবীই যুক্ত। শ্রমজীবীর বৈজ্ঞানিকচেতনা এবং আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন। অথচ এটাও সত্য যে শ্রমজীবীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে। চরিত্র ও চেতনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গোঁজামিল। শ্রমিককে নিজের সঙ্গেও লড়তে হবে।

২

এবার আমরা রলাঁ ও টলারের লেখায় ও কাজে যেভাবে যে কোন প্রশ্ন শিল্পীর হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে সেভাবেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবো। এর আগে দুজনের পরিচয়কে নতুন করে ঝালিয়ে নিচ্ছি। কারণ রলাঁ কোন কোন সূত্রে আমাদের সামনে থাকলেও টলার প্রায় না থাকারই শামিল। এটাই বাস্তবতা। টলারের কথা তাই বেশি বলছি।

রলাঁ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জন ক্রিস্টোফার বা 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের রচয়িতা রলাঁ ইউরোপের বিবেক নামে পরিচিত। যুদ্ধের আগেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং বিশেষ করে তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন চলছে এবং লেনিন যখন নির্বাসনে থেকে নতুন করে শ্রমিক আন্তর্জাতিক গড়ে তুলে যুদ্ধ থামাবার

উদ্দেশ্যে দেশে দেশে গণবিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন করছেন, তখন রলাঁ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ার স্থল ও নৌসেনারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের সহযোগিতায় শ্রমিক-কৃষক-জনগণ জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে, তখন লেনিন দেশে ফিরবার সময় রলাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গোর্কিকে লিখেছিলেন, 'রলাঁকেও নিয়ে চলো।' এই ঘটনা থেকে রলাঁর অবস্থানটি তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে আসে। তাঁর নতুন চার খণ্ডের উপন্যাস 'বিমুগ্ধ আত্মা' (The Soul Enchanted) এই অবস্থানের প্রক্রিয়ার শিল্পরূপ। এর প্রধান চরিত্র নারী।

টলার ঃ আর্নেস্ট টলার যুদ্ধকে পেরিয়ে এসেছিলেন ভিন্নভাবে। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন ২০ বছর বয়সে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈনিক হয়ে রণক্ষেত্রে যেতে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে যুদ্ধবাজদের প্রতারণার আবহাওয়ায় তাঁর ধারণা ছিল তিনি ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে তাঁর চোখ ও মন দুইই খুলে গেলো। তিনি কবিতা লেখা শুরু করলেন যুদ্ধের নারকীয় কাণ্ডকারখানা নিয়ে। এই সঙ্গেই তিনি নাটক লিখলেন 'রূপান্তর' (Transfiguration)। এক যুবকের মোহভঙ্গ এবং শান্তি ও বিপ্লবে দীক্ষা। তখন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যুদ্ধকে সমর্থন করায় এর মধ্যেকার বামপন্থীরা বেরিয়ে এসেছে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এবং বিশেষ করে এদের বড় অংশ স্পার্টাসিস্টরা (Spartacist) রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিয়েব্‌কেনেখটের নেতৃত্বে সৈনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন। টলার স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি ট্রেঞ্চের বিপ্লবী কবি হয়ে পড়েন।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে গণঅভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলো। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধফেরত স্থলসৈনিক ও নৌসেনাদের সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। সামন্তবাদী যুদ্ধবাজ সেনা-অফিসাররা এর বিরুদ্ধে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে বার্লিনের শ্রমিক অভ্যুত্থানকে পেশাদার সেনাবাহিনীর সামন্তবাদী অফিসাররা বন্দুকের জোরে দমন করলো। কিন্তু গণতরঙ্গ থামলো না। এপ্রিলে মিউনিখে ব্যাভেরিয়ার শ্রমিক রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে স্থাপিত হলো। তখন টলার মিউনিখে। তিনি ব্যাভেরিয়ার শ্রমিক রাষ্ট্রের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন।

শ্রমিক সমিতিগুলিকে নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র অবশ্য মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। সেনাবাহিনী এসে এখানেও বন্দুকের জোরে শ্রমিকরাষ্ট্র ভেঙ্গে দিল। টলার ও তাঁর যে সমস্ত সাথী বেঁচে রইলেন, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত

হলেন। টলারের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হলো। ১৯১৯ সালের জুলাই মাস শুরু হলো তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ।

এই জেলখানাই কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো টলারের ঝড়ের বেগে নাটক লেখার জায়গা। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন জেলখানায় পাখির বাসা নিয়ে 'সোয়ালো কাব্য'। এই কাব্যে আছে তাঁর কারাগারের গানগুলির মতো বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে পড়া জার্মানী ও সেইসঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তির অধীরতা। নাটকগুলি লিখলেন তিনি তখনকার জার্মানীতে এবং সাধারণভাবে ইউরোপে বিপ্লবের পতাকাবাহী শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে। তাঁর নাটকের নায়ক সবাই একেবারে সাধারণ শ্রমিক। এইসব নাটক বার্লিনে ও জার্মানীর অন্যসব শহরে মঞ্চস্থ হবার পরে তিনি নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই ধূমকেতুর মতো উত্থান এক এক সময়ে নজরুলের উত্থানের সঙ্গে তুলনীয়। টলার পাঁচ বছর পুরোপুরি সময় জেল খেটে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বের হবার আগেই তিনি এত সম্মানিত হলেন যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বিশিষ্ট জার্মান নাগরিকদের আবেদনপত্রে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর নাম থাকতো।

আর্নেষ্ট টলার স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সেই অংশের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলেন যাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগ হয়েছিল। তাঁর এই আনুগত্য সাথী ও জনগণের প্রতি তাঁর অনমনীয় সংহতি-চেতনা। জেল থেকে মুক্তি তাঁর কাছে আনন্দের ছিল না, কারণ তাঁকে হাজার হাজার বন্দী সাথীকে জেলে ফেলে আসতে হয়েছে।

জেল থেকে বেরিয়ে তিনি নিজেকে নির্দলীয় সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন।

জেলে থাকতে তিনি লেনিনের নীতির সমর্থনে বন্ধুদের চিঠি লিখেছিলেন। টলার জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খোলা মন নিয়েই। জেলে থেকে হিটলারের প্রতি ঘৃণা তিনি তীব্রভাবে একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন। হিটলারের সাকরেদরা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে তাঁর নাটকের অভিনয়ের সময় হামলা করেছিল। টলারের নাটককে তারা দুশমন ঘোষণা করেছিল। জেল থেকে টলার বেরিয়ে এসেছিলেন যুদ্ধবাজ হিটলার ও তার ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে তাঁকে দেশ ছাড়তে হলো। তিনি আত্মজীবনী লিখলেন আমি জার্মান ছিলাম। তিনি জার্মানীর যুদ্ধবাজ শাসক ও শোষক ফ্যাসিবাদী চক্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করলেন তিরিশের দশকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে।

নির্বাসনে তাঁর মৃত্যু হলো। তার আগে অবশ্য ১৯৩৭ সালে তাঁর 'কারাগারের চিঠি' এবং 'কারাগারের গান' একত্র করে ইংরেজী ভাষায়

প্রকাশিত হলো। এর ভূমিকায় টলার সংক্ষেপে জানালেন কিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবের পক্ষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান নেবার পরে জেলে পেঁৗছেছিলেন। এর মধ্যে আছে টলার ও রলাঁর সংযোগসূত্রের দলিল। কারাগারের চিঠির গুচ্ছে রোঁমা রলাঁকে লেখা দুটি চিঠি রয়েছে। আরেকটি চিঠি রয়েছে স্তেফান সোয়াইগের কাছে, যার সমগ্র বিষয়বস্তু রলাঁ। আমরা উপরোক্ত দুই লেখক শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব, শান্তি ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে রঁলা ও টলারের চিন্তায় সহমর্মিতা ও কর্মকাণ্ডের সহযোগিতার একটা আভাস আশা করি দিতে পেরেছি।

এবার আমরা উপরোক্ত তিনটি চিঠি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে এমন সব প্রশ্নের ব্যাপারে টলার ও রঁলার সহধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলির উল্লেখ নিবন্ধের শুরুতেই করেছি। এই দুই মহাবিদ্রোহী লেখক শিল্পীর পারস্পরিক প্রগাঢ় বন্ধুত্বও এই চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। রঁলার প্রতি টলারের শ্রদ্ধাবোধ যে কত গভীর ছিল সেটাও জানা যায়।

প্রথম চিঠিটি নিম্নরূপ ঃ

রোঁমা রলাঁকে

প্রিয় শিক্ষক,

প্রায় দুটো বছর জেলখানায় কাটিয়ে দিলাম। মঠের মতোই এই জীবন সঙ্গহীন। ধাবমান দিনগুলোর একঘেয়ে বিবর্ণতা সত্ত্বেও এই জীবন আমাকে অনেকগুলো কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধ প্রহর এনে দিয়েছে। আমি তাই মনে করি না যে, বছর দুটো বৃথা গিয়েছে। মানসিকভাবে আমি জেলখানায় ঢোকার প্রথম দিনগুলোতে যেমন অবিচলিত ছিলাম, আজও তাই রয়েছি। হয়তো আমি আমার জীবনের অজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়েছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাকে আমি একেবারে তলানি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়েছি। অনেক তিক্ত ভাবনাচিন্তাকে এখন সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পেঁৗছে দিতে হবে। সাধারণ কারাবাস হচ্ছে জীবনের শিক্ষাগৃহ। এমন একটা শিক্ষাগৃহ যেখানে মানুষকে তার অন্তঃসারে পাওয়া যায়। জার্মানীর ব্যাভেরিয়ায় বসে এই মুহূর্তে আমি কারাগার থেকে মুক্তির কথা ভাবছিনা, কারণ সারা ব্যাভেরিয়াই হচ্ছে এখন একটা কারাগার। যে পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসাররা সম্প্রতি ক্ষমতাদখলের চেষ্টা করেছিল সেই কাপ্পিসৃট্‌দের জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমা করে দিচ্ছে। কার্ল লিয়েবকেনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের, ৩২ জন নৌ-সেনার এবং গুস্টাফ লাণ্ডাউয়ের খুনীরা প্রজাতন্ত্রের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও

রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। অথচ ন্যায়ের জন্য যারা লড়ছে, তাদের জেলে আটকে রাখা হচ্ছে। জার্মানীর পার্লামেন্টে জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আমাদের 'লাল জানোয়ার' বলে অভিহিত করেছে। এদের ধৃষ্টতা কোথায় পেঁাছেছে সেটা দেখুন।

দ্বিতীয় চিঠি ঃ

রেঁামা রলাঁকে

প্রিয় এম রলাঁ,

আপনার চিঠি আজই পেয়েছি। আমার কাছে এই চিঠি মহামূল্যবান। বিদেশী ভাষায় লেখা বলে আপনার মূল চিঠিখানি আমাকে না দিয়ে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। মা অনুবাদ করে সেই চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন। তাই আপনার চিঠির জার্মান ভাষ্যটি আমি পেয়েছি।

আপনি যদি জানতেন আপনার চিঠি পড়ে কত সুখী হয়েছি। আপনার চিঠি আমার কারাগারের সাথীকে দেখালে সে হাসিমুখে বললো, এই চিঠি পাবার জন্যই জেলে আসা যায়। অবশ্য কথাটা যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেটা গ্রহণ করা গেলেও জেল যে মানবসমাজের ক্ষতি করে এটা মনে রাখা দরকার।

আমি আজ আমার 'কারাগারের গান'গুলি আপনাকে ডাকে পাঠাচ্ছি। এরা আমার কাছে গানের চেয়েও বেশি। এরা লিপিকা, এরা আহ্বান, এরা ঘোষণা। যেসব মানুষ গতানুগতিক জীবন যাপন করে এবং ভুল করেও ভাবে না যে, তারা তাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার দরুণ অপরাধী, তাদের এই গানগুলি উত্যক্ত করে তুলতে চায়।

এই কথাটার এখানেই ছেদ টেনে বলতে চাই, আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীটা হত্যাকাণ্ডের এবং সেই সঙ্গে নানাধরনের জঘন্য অপরাধের এবং মানুষের দেহমনের যন্ত্রণা ও অপমানের ডাইনির কড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কড়াইটা একেবারে ফুটন্ত। তাই নয় কি? এই হট্টগোলের মধ্যে কে আমার কথা শুনবে? আজকের জঁাদরেল রাষ্ট্রনেতারা? যারা তাদের দেশবাসীদের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা? তারা কি নীচু তলার মানুষের কাছে থেকে শুনতে চাইবে?

আমার গানগুলি তাদের কাছেই অর্থবহ হয়ে উঠবে যারা ভবিষ্যতের মানুষ, তারা যুবাযুবতীরা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানবতা সমস্ত রোগ শোক দূর করার ক্ষমতা রাখে। এই যুবাযুবতীদের কাছে মানবতাই হচ্ছে বাস্তবতা। বড় বড় রাষ্ট্রনেতারা যাকে বাস্তবতা মনে করে, তার চেয়েও অনেক বড় এই

বাস্তবতা। এই যুবাযুবতীরা অনুভব করে যে তারা নিপীড়িত। এরা সমস্ত অত্যাচারের অবসান চায়। আমার গানগুলি এদের সঙ্গেই কথা বলবে।

তারপর যেমন করে গমের দানা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে যদি এই গানগুলি থেকে ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড বেরিয়ে আসে, তাহলে চারু শিল্প যতখানি যা করতে পারে তা এই গানগুলিও করবে।

হুইটম্যান বলেছিলেন, "যখন কেউ একটি বইকে ছোঁয়, তখন সে একটি মানুষকেও ছোঁয়।" এই বক্তব্য আমার বইটি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দুঃখের বিষয় অনেক লেখকের লেখায় একটা কথার যন্ত্রকে ছুঁতে হয়।

প্রত্যেকটি কবিতার শিকড় হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমরা যাকে রূপ বলি, সে হলো ভালবাসা।

তৃতীয় চিঠি ঃ

স্তেফান সোয়াইগকে

বিষয় ঃ রোমাঁ রলাঁ

প্রিয় সোয়াইগ,

আপনি রোমাঁ রলাঁ সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি "মানবসমাজকে ভালবাসেন কারণ তিনি মানবসমাজের প্রতি যত না বিশ্বাস রাখেন তার চেয়ে বেশি দুঃখবোধ করেন।" কিন্তু এইটেই হচ্ছে বোধহয় একমাত্র অবিচল ও তিক্ততাবিহীন ভালবাসা।

বিশ্বাস প্রায়শই হতাশ্বাসে পরিণত হয়। এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই বিশ্বাস পরিণত হয় তিক্ততায়, শত্রুতায় এবং মানবসমাজের প্রতি ঘৃণাতেও।

আমি এই জন্যেই সেই সব সংগ্রামীদের সব সময় চোখের সামনে রাখি যাদের কাছে বিশ্বাস থাকা না থাকাটা বড় কথা নয়। এরা একটা আদর্শে বলীয়ান হয়ে সংগ্রাম করে চলে। এই আদর্শ হচ্ছে সমাজে সচেতন আত্মবিকাশের জন্য সহযোগিতার আদর্শ। এই কর্তব্য পালনে এগিয়ে চলার অর্থ হচ্ছে, একটি যৌথজীবন নির্মাণ করে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান করা। (এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের সব চেয়ে বড় করণীয়।) এইভাবেই জীবনের রহস্যময় যুক্তি ছাড়া উপাদানকে একটা পরিসীমার মধ্যে আটকে দেওয়া যায়। এইভাবেই জীবনের অযৌক্তিক উপাদান তার আপন ঝাঁপিতে গিয়ে মুখ গোঁজে এবং দুর্বোধ্যতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

কোন কোন গোঁড়া সমাজতন্ত্রী মনে করে যে, জীবনের যুক্তিছাড়া উপাদানগুলোকে একেবারে নির্মূল করে দেয়া যায়। এই ধারণাটি কিন্তু সঠিক নয়।

এখানে আমি যেভাবে বললাম, ইউরোপের মানুষের ভবিষ্যৎ কি সেই ধরনের সংগ্রামী হয়ে ওঠা নয়? সেই ধরনেরই বীরত্ব নয়?

৪

উপরোক্ত তিনটি চিঠিতে আমরা আমাদের আলোচ্য চারটি প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ করে দুটিকে দ্বন্দ্বাত্মক আশাবাদের মধ্যে প্রসারিত অবস্থায় পেয়েছি। এই দুটি হচ্ছে বার্ধক্য ও যৌবনের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির সহযোগিতা। কাব্যিকতা ও নাটকীয়তা টলারের যুক্তির বাহন। এই চিঠি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর কবিতা ও নাটকের গতি ও শক্তি এবং সত্যনিষ্ঠাকে। এরই মধ্য দিয়ে আমরা আয়নার মধ্যে তখনকার বিশ্বের অন্তরের রূপটি দেখতে পাই।

আরও চিঠি পেলে আমরা দুজনের এবং দুই প্রজন্মের পরম্পরায় পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টাকে আরও বিশদভাবে দেখতে পেতাম। কিন্তু সে উপায় নেই। টলারের পত্রাবলীতে আরেকটিবার চিঠিতে তিনি এক বান্ধবীকে জানিয়েছেন, "রলাঁ আমার কবিতার বইএর ভূমিকা লিখছেন, তুমি জেনে খুশি হবে।"

তবে সমসাময়িক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা এই সময়ে আরেকখানি চিঠি টলার লিখেছিলেন একই মেজাজে। লিখেছিলেন রলাঁর বন্ধু আঁরি বারবুসেকে। সুতরাং এই চিঠিকে দুই প্রজন্মের যুক্ত উপলব্ধি হিসেবে নিতে পারি।

আঁরি বারবুসের জীবনকাল ১৮৭৩-১৯৩৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা বারবুসের 'আগুনের তলায়' (Under Fire) উপন্যাস যুদ্ধের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাস ছিল সমস্ত জাতির যুদ্ধরত সাধারণ সৈনিকদের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে বিশ্বজনগণের শান্তি ইস্তাহার।

যুদ্ধ শেষ হলে বারবুসে তাঁর 'ক্লার্তে' পত্রিকা (পরিচ্ছন্ন চিন্তা) মারফত ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রের ফ্রন্ট গঠন করেন। রোমাঁ রলাঁ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট হয়ে যান, তার মূলে রয়েছে বারবুসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। রলাঁর এই দিকটিকে তাঁর 'শিল্পীর নবজন্ম' (I Will Not Rest) গ্রন্থে পাওয়া যাবে। বিশের এবং তিরিশের দশকে রলাঁ ও বারবুসে যেমন সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁরা দুজনে ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য আয়োজিত গণবিক্ষোভের পুরোভাগে স্থান নিয়েছিলেন। ফ্যাসিবিরোধী পপুলার ফ্রন্ট গঠনেও ছিলেন তাঁরা সহায়। তাঁরা যুক্তভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ নিয়েছিলেন। রলাঁ ও বারবুসের এই একাত্মতাকে মনে

রেখেই আমরা বারবুসের কাছে টলারের চিঠিখানি এখানে দাখিল করছি। চিঠিখানি নিম্নরূপ ঃ

অঁারি বারবুসে-কে

প্রিয় অঁারি বারবুসে,

এইমাত্র সংবাদপত্রে দেখলাম, আপনি আমার লেখা নাটক 'রূপান্তর' (Transfiguration) ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করছেন। আপনি হচ্ছেন সমাজ-তন্ত্রের শিক্ষক ও পথিকৃৎ। সেই আপনিই আমার লেখা নাটককে জনসমক্ষে আনছেন। এতে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

১৯১৭ সালে যখন নাটকটি লিখি তখনই এটি আমার কাছে সৌন্দর্যানুভূতি ও আত্মকথার চেয়ে বেশি কিছু ছিল। যেভাবে প্রচারপুস্তিকা লেখা হয়, সেভাবে আমি নাটকটি লিখেছিলাম। এর মধ্য দিয়ে আমি যুদ্ধকে আক্রমণ করেছিলাম এবং হরতালের ডাক দিয়েছিলাম। এরপরে নাটকটি অনেক জায়গায় গোপনে পড়া হয়। পুলিশ জানতে পারেনি। এই নাটক লেখার মধ্য দিয়েই আমি এমন বেশ কিছু সাথীকে জড়ো করি যারা দৈনন্দিন বৈপ্লবিক্ কাজে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।

আজ জার্মানীতে বিপ্লব পরাজিত। বর্বরতা, নৈতিক ও আত্মিক অবক্ষয়, মিথ্যাচার, কপটতা এবং মুনাফাবাজীর আজ জয়জয়কার। কিন্তু সমাজতন্ত্র পরাজিত হয়নি। বিপ্লবীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু যে আদর্শের জন্য তারা লড়ছে তাকে কি বর্বরতা এবং উপরোক্ত আরও অন্যান্য উপায় দ্বারা হত্যা করা যায়?

এবার আমরা রলাঁর দিক থেকে তাঁর মনের গভীরে যে বিষয়গুলি লালিত হয়েছিল, সেগুলির একটা আভাস পেতে চেষ্টা করবো।

রলাঁর 'জঁা ক্রিস্তফ' উপন্যাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে রচিত হয়েছিল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় এর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জঁা ক্রিস্তফ ঘনায়মান ফরাসী-জার্মান সংঘর্ষ এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধের মুখে আন্তর্জাতিক সমঝোতার একটি ঘোষণাপত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল, এর বিষয়বস্তুর জন্য উপন্যাসের নায়ক জঁা ক্রিস্তফ বা জন ক্রিস্টোফারকে রলাঁ করেছিলেন ফ্রান্স ও জার্মানীর মনন ও জীবনের সেতুস্বরূপ। দুটি দেশই যাতে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার উপরে উঠে হাত মেলাতে পারে, সেজন্য তিনি নায়ককে করেছিলেন সর্বাত্মকভাবে বিদ্রোহী। জঁা ক্রিস্তফ ছিলেন জন্মে জার্মান, বসতিতে ফরাসী। তাঁর জার্মান নাম জন ক্রিস্টোফার ক্রাফ্ট। জার্মান ভাষায় ক্রাফট শব্দটির অর্থ শক্তি বা

ফোর্স। এই ক্রাফট নামকরণটিও নায়কের বিদ্রোহী শিল্পীজীবনের সঙ্গে যেন সঙ্গতি রেখেই দেয়া হয়েছিল। জঁা ক্রিস্তফএর চরিতকথাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ জঁা ক্রিস্তফ জার্মানীর সামন্তবাদী পরিবেশে জন্মালেও সেখানে সঙ্গীতশিল্প চর্চার আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল। শৈশবেই সে ধ্রুপদী ইউরোপীয় সঙ্গীতে বাদনে ও শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। কৈশোরে সে সঙ্গীতেও উদীয়মান প্রতিভা। বার্লিনে পর্যন্ত তার চাহিদা। কিন্তু জার্মানীতে থাকা তার হলো না। কারণ সে যেমন জন্মশিল্পী, তেমনি জন্ম জনগণমুখী। পেশাদার সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের একটা সংকটের সময় সে জনসাধারণের পক্ষ হয়ে লড়ে বসলো। তাকে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য দেশ ছাড়তে হলো। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে সে পেঁাছে গেলো শিল্প ও ললিতকলার বিপ্লব-নগরী প্যারিসে। এখানে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়। চলনে বলনে সমাজে সে ফরাসী হয়ে যায়। প্রেমিক, দরদী, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী জঁা ক্রিস্তফ। কোন বিশেষ মতাদর্শেই অবশ্য সে নাম লেখায় না। সে কোন সীমান্তও মানতে চায়না। বিটোফেন, মে-দিবস, ভগবদ্‌গীতা সবই তার কাছে বিদ্রোহের উপাদান। জীবন হচ্ছে যৌবন। কিন্তু সে যে প্রজন্মের মানুষ, সেই প্রজন্মটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্টোফার দেখতে পাচ্ছে, ইউরোপের জাতিগুলি একদল অন্ধের মতো ধেয়ে চলেছে পারস্পরিক ঘৃণা ও স্বার্থপরতার পিচ্ছিল পথে ধ্বংসের মুখে। জনগণ কোণঠাসা। যৌবনই পারে বিপর্যয়কে ঠেকাতে। নতুন প্রভাতের স্বপ্ন নিয়ে ক্রিস্টোফার নিউমোনিয়ায় মারা গেল বর্ষশেষে।

যে বহুসংখ্যক নারী ও পুরুষচরিত্র জন ক্রিস্টোফারের জীবনে যুক্ত হয়ে একটি নির্ঝরকে নদীতে পরিণত করেছে, তাদের নিয়েই অবশ্য চারখণ্ডের বৃহৎ 'জঁা ক্রিস্তফ'। কিন্তু সংক্ষেপে রোমাঁ রলঁার এবং জঁা ক্রিস্তফের জীবনের ও সংগ্রামের বিষয়গুলিকে সামনে আনার জন্য একটা ছকেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের।

এই ছকটিকে সামনে রেখে জঁা ক্রিস্তফ উপন্যাস থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে মন নিয়ে রলাঁ প্রবেশ করেছিলেন, সেটিকে বুঝবার জন্যে। প্রথমে একটি মুখবন্ধ, তারপর মূল উপন্যাসের একটি সামান্য অংশ।

(এক) 'জঁা ক্রিস্তফ' উপন্যাসের চতুর্থ বা শেষ খণ্ডের একটি মুখবন্ধে রলাঁ নিজেকেই দাখিল করেছেন। মুখবন্ধটি নিম্নরূপ ঃ

আমি একটি প্রজন্মের বিয়োগাত্মক কাহিনী লিখলাম। এই প্রজন্মের এটা হচ্ছে অন্তিম সময়। আমি এর ভাল কিংবা মন্দ কোন কিছুই লুকাইনি। আমি এর গভীর বিষণ্ণতাকে, এর বিশৃঙ্খল আত্মাভিমানকে, এর বীরত্বপূর্ণ

প্রয়াসগুলোকে লুকোতে চেষ্টা করিনি। এই প্রজন্ম একটা অতিমানুষিক কর্তব্যের দুর্বহ বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। বোঝাটা সারা বিশ্বেরই। বিশ্বের নৈতিকতার, সৌন্দর্যবোধের, বিশ্বাসের, নতুন মানবসমাজ গড়ে তোলার কর্তব্যের বোঝাকে এই প্রজন্মই যে বয়ে নিয়ে এসেছে, সে ঘটনাকেও আমি লুকোইনি।

হে যুবকেরা, হে আজকের মানুষেরা! তোমরা আমাদের উপর দিয়ে দল বেঁধে পায়ে পা মিলিয়ে চলে যাও। তোমাদের পায়ের তলায় আমাদের মাড়িয়ে চলে যাও। ঠেলে সজোরে এগিয়ে চলে যাও সামনে। তোমরা আমাদের চেয়ে আরও বড় হও, আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হও।

আমি নিজের দিক থেকে আমার আত্মাকে বিদায় জানাচ্ছি। আমি আমার আত্মাকে খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। এর মধ্যে সারপদার্থ আর কিছু নেই। জীবন হচ্ছে মৃত্যুপরম্পরা, পুনর্জীবনপরম্পরা। হে ক্রিস্তফ, আমাদের নতুন করে জন্মাবার জন্য মরতেই হবে। জঁা ক্রিস্তফ বইটি শেষ করে আমি একে সমস্ত জাতির সেইসব স্বাধীনচিত্ত মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি, যারা কষ্ট পায়, সংগ্রাম করে এবং যারা অবশ্যই জয়ী হবে।

(দুই) জঁা ক্রিস্তফ উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায়ে নায়কের চিন্তাস্রোত এবং কথাবার্তার একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে দাখিল করছি রলাঁকেই বুঝবার জন্য।

এই শেষ অধ্যায়ের কুশীলব হচ্ছে সবাই নতুন প্রজন্মের মানুষ। বিশেষ করে দুজন তরুণ যুবা। একজন হচ্ছে ক্রিস্টোফারের বন্ধু কবি অলিভিয়েরের ছেলে জর্জ। আদর্শবাদী কবি অলিভিয়ের প্যারিসে মে দিবসের শ্রমিক বিক্ষোভের সময় সামরিক পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে শ্রমিকদের পক্ষে ব্যারিকেডে অবস্থান নিলে সামরিক পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে মারা যায়। ক্রিস্টোফার এই সময়ে অলিভিয়েরের পাশে ছিল। বন্ধুর মৃত্যুতে ক্রিস্টোফার গভীরভাবে শোকার্ত ও মর্মাহত হয়েছিল। সুতরাং পিতৃহীন জর্জকে ক্রিস্টোফার নিজের ছেলের মতো দেখেছে। দ্বিতীয় তরুণ যুবা অলিভিয়েরের শিষ্য এমানুয়েল। সে হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের কবি।

ক্রিস্টোফার বুঝতে পারছিল যে, এই দুজনের সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ যেন কিছুতেই সহজ হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না তার প্রজন্ম। ইউরোপীয় চিন্তার বিবর্তন ত্বরিতবেগে অগ্রসর হয়ে চলছে। ঘটনাটা এমনভাবে ঘটছে যেন নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং নতুন মোটর ইঞ্জিনগুলো এর গতিকে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

মানসিক সংস্কার ও আশার যে ভাণ্ডার আগেকার আমলে মানবসমাজকে কুড়ি বছর মনের খাদ্য জোগাতে পারতো, সেটা আজ পাঁচ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

একটা মনোপ্রজন্মের পর আরেকটা মনোপ্রজন্ম ধেয়ে চলেছে। এক প্রজন্মের ঠিক পেছনেই আরেক প্রজন্ম। এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মকে অহরহ মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সময় হাঁকছে, "এগিয়ে চলো সবাই হেঁইও।"

ক্রিস্টোফার এমানুয়েলকে বললো, "এটাই হচ্ছে বিধান। যৌবন বার্ধক্যকে মাটি-চাপা দেয়। তবে আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন আমরা কাউকে বৃদ্ধ বলবার আগে তার ষাট বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। এখন ঘটনাটা অনেক বেশি দ্রুতবেগে ঘটছে। এটা বেতারের যুগ, এরোপ্লেনের যুগ। হত-ভাগা প্রজন্মের এরা কেউ বেশি দিন টিকবে না।"

রলাঁ তাঁর এই উপন্যাসকে নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পতাকা হাতে প্রবেশ করেছিলেন যুদ্ধ থামাবার সংকল্প নিয়ে। ভাসা ভাসা আশাবাদ ও রঙ্গীণ স্বপ্নের লোকই ছিলেন না তিনি। যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধোত্তর সেই বিপ্লব ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য তিনি তৈরী ছিলেন, যার জন্ম হয় বাস্তব থেকে। এই জন্যেই ঝড়ের পাখিদের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক ঐক্য। তিনি জানতেন যৌবনের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে এখানেই। যুদ্ধ থেমে যাবার পরে ঝড়ের পাখি তরুণযুবা আর্নেস্ট টলারের আবির্ভাবকে তিনি যে স্বাগত জানালেন, তার মূল রয়েছে তাঁর এই শিল্পী চরিত্রে।

টলারের মধ্যে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবস্থানের মধ্যে প্রধান সদর্থক ও নির্দেশক শক্তিকে সক্রিয় দেখতে পেলেন। এই শক্তি শ্রমিকশ্রেণী। ধূমকেতুর মতো টলার সেদিন সামনে এসেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর নাট্যকার হিসেবে। অবশ্য নাটক যা করে, টলার তাই করেছিলেন। শ্রমিককে বিপ্লবের নায়কতা করার জন্য প্রায় নিজের সঙ্গেও যুঝতে হয়েছে। এই নিজের সঙ্গে লড়াইটা বরং টলারের নাটকে প্রাধান্যই পেয়েছে। এখানে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার ভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্যেও তীব্র লড়াই করতে হয়েছে শ্রমিককে। এই লড়াই অবশ্য কোন বিমূর্ত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিকতার জন্য নয়। এই লড়াই মানব সমাজের মুক্তির লড়াই, সংহতিসাধনের লড়াই। সংহতির মুক্তিতে ব্যক্তির উত্তরণের লড়াই।

রোমাঁ রলাঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, এই নাও তোমাদের হাতে আমার হাত। মনে রাখতে হবে, সমস্ত বাস্তবতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়েই যে শ্রমিকশ্রেণী নতুন সমাজ গড়তে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন রলাঁ।

এজন্য প্রকৃতপক্ষে রলাঁর প্রস্তুতিও অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। রলাঁ রচনা করেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের গণনাট্য। রলাঁ রচনা করেছিলেন

গণ-উপন্যাস 'কোলা দ্য ব্রিউগঁ।' (Colas de Breugnon)। লুকাচ ১৯৩৭ সালে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। এর একটি অধ্যায় রোলাঁর উপরোক্ত উপন্যাস ও রলাঁ। টলারের নাটকের মতো এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা এসেছে গতরখাটা জনগণের মধ্য থেকে তাদের মুখের ভাষা নিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর নাট্যকার টলার ও গণনাট্যকার রলাঁর বন্ধুত্বের সেতু এই ঘটনাটিও। টলার এ ঘটনাকে সামনে না আনলেও গতরখাটা মানুষ যে দুই নাট্যকারের মেজাজকে ঘনিষ্ঠ করেছে, এই সত্য আমাদের আনন্দিত করে।

এই নাট্যকারের মেজাজের দরুণও রলা প্রচণ্ড গতির প্রতীক যৌবনের জয়গান করেছেন। যৌবন মানুষকে বড় করেছে যন্ত্রকে অতিক্রম করে।

রলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ জীবনীতে যৌবনেরই জয়গান করেছেন।

৫

অন্য দিক থেকে তরুণযুবা টলার রলাঁকেই যেন অভয় দিতে চেয়েছেন যন্ত্রের ব্যাপারে বেতারযন্ত্রকে বিশ্বব্যাপী জনগণের শান্তির সমাবেশের খবরা-খবরকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে।

টলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়ঙ্কর রূপকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর সোয়ালো-কাব্যগুচ্ছে একটি কবিতায় লিখেছিলেন,

> "ইউরোপ তার এরোপ্লেনের জন্য গর্বিত
> আমি গর্বিত আমার সোয়ালো পাখিদের জন্য।"

কিন্তু কোন মানুষ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, তার উপরে তো নির্ভর করে যন্ত্রের ভালমন্দ দিক। টলার বেতারযন্ত্রকে বিশ্বের জনগণের বৈপ্লবিক শান্তির অভিযানের সীমান্তলঙ্ঘী বাহক রূপে দেখিয়েছেন।

রলাঁ নিশ্চয় এতে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।

আমাদের সাম্প্রতিক জীবনে যন্ত্রের দ্বন্দ্বাত্মক প্রশ্নেও টলারের 'বেতারযন্ত্র' নিয়ে আবেদনে রলাঁর সম্মতি রয়েছে বুঝে নিতে আমরা যন্ত্রের প্রয়োগের মানবিক উপায়গুলি নিয়ে ভেবে দেখতে পারি।

৬

আলোচনার সমাপ্তি টানছি টলারের একটি কবিতা দিয়ে। এই কবিতাটি টলার রলাঁকে জেল থেকে পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

উষাকালের আগে

একটি বছর, একটি প্রহর সময়ের প্রান্তরে কি পরিচয় রাখে? এরা হচ্ছে সেই অকর্ষিত ক্ষেত, যা আমাদের বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ধ্রুপদী কবি মায়াকভস্কি

১

শ্রমজীবীরা বিশ্বের দেশে দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে অথবা আজ হোক কাল হোক করবে। সমস্ত মৌল অর্থনৈতিক সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা জারী প্রথম কাজ। শিল্পকলা সাহিত্যেরও দখল নেয়া এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। এই একান্ত বাস্তব ও অনিবার্যভাবে সম্ভাব্য বাস্তব থেকে উদ্ভব হয়েছে সাহিত্য শিল্পকলার নতুন সংজ্ঞা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের। এই সংজ্ঞার মূলসূত্র, শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ড এবং ইচ্ছা ও অনুভবই সাহিত্যশিল্পকলার চালকশক্তি।

এই সংজ্ঞার সূচনা ঐতিহাসিকভাবে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে, কারণ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই প্রথম শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সাহিত্য শিল্পকলার প্রবর্তন হয়েছে।

মায়াকভস্কির বিশেষত্ব এই যে, যাঁরা সাহিত্য শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের দখল নেয়ার কাজে সৃজনশীলতায় এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পথিকৃত তাঁদের মধ্যেও তিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন। মায়াকভস্কি তাঁর কাজ ও চিন্তা দ্বারা যেমন সোভিয়েত দেশে তেমনি সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের জন্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী কবি হিসেবে ব্রতী ছিলেন, রয়েছেন এবং আগামীতেও থাকছেন।

মায়াকভস্কির কবিতার ভূমিকা ও দায়িত্বের মূলে শুধু কি এই মূলবীজটিই বিবেচ্য? অর্থাৎ তিনি কাব্যে শ্রমজীবীদের প্রাধান্য ঘটাবার সঙ্গে আরও কি করেছেন, যেগুলোর আবশ্যকতা ছিল এবং পরেও থাকবে?

এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা দরকার এ জন্য যে, ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাঠামোর নতুন বিন্যাসের প্রবহমান প্রক্রিয়া কাব্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং তরল অনুভবের সংস্থান প্রধানত কাব্যেই চাইবে মানুষ আগামীতেও।

অগাস্টিনো নেতো, পাবলো নেরুদা, নিকোলাস গিলেন, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কাজের ধারায় আমরা গণ-বিপ্লবের কাজের কথা ও সৌন্দর্য উভয়কেই খুঁজি।

সুতরাং প্রশ্ন, মূল ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মায়াকভস্কি ব্যক্তিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও তরল অনুভবগুলোর মধ্যে কী ধারার পরিসর তৈরি করেছেন নিজের কবিতার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সকল কবিতার জন্যে ?

২

এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মায়াকভস্কির কবিতার গনগনে অঙ্গার ঘাঁটলেই দেখা যাবে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ধ্রুপদী কবি তিনি নতুন ভিত্তি স্থাপন ও অধিকাঠামো বিন্যাসের কাজ একই সঙ্গে করেছেন।

মায়াকভস্কির কবিতা ও তার সহযোগী কাজগুলোতে প্রথমে ভিত্তি স্থাপনের এবং পরে অধিকাঠামোর উপাদানগুলোকে পরীক্ষা করলে আমাদের এ বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বেরিয়ে আসবে।

৩

কাব্যে শ্রমজীবীদের পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিসম্বাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মায়াকভস্কির কাজের একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে তাঁর একাগ্রতার মধ্যে।

মায়াকভস্কি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন, 'তাকে আমি কমিউনিস্ট বলবো না যে অতীতের সেতুটাকে না ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ভবিষ্যতে যেতে চাইবে।'

কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তাগিদের তীব্রতা বুঝতে পারা যায় এই উক্তিতে।

মায়াকভস্কি ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯৩০। যখন তিনি ১৯১৭ সালে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে শরিক হন, তখন তাঁর বয়স ২৪। অর্থাৎ তিনি তাঁর আয়ুষ্কালে ১৪ বছর মাত্র পেয়েছিলেন সোভিয়েত পর্বের কাজের জন্য। নতুন কাজের পরিমাণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সোভিয়েত কয়লাখনির শ্রমিক বীর স্তাখানভের মতোই দৃষ্টান্ত স্থাপক।

বিপ্লবের আগেই রাগী আধুনিক নতুন ধরনের পরিশীলিত কবি হিসেবে নাম করেছিলেন তিনি। ১৭ বছর বয়সেই রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাদী কবিদের অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে কাজ শুরু করে ম্যাক্সিম গোর্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম যৌবনের কাজও শক্তি ও পরিমাণের দিক দিয়ে নিরন্তর সাধনারই পরিচায়ক। কিন্তু সোভিয়েত বিপ্লবের শ্রমজীবীদের কবি হয়ে যে কাজ তিনি করলেন, তা গুণে ও পরিমাণে ১৪ বছরের সময়ের মধ্যে অভাবিতপূর্ব। কবির ১৩ খণ্ডের রচনাবলীর মধ্যে ১২ খণ্ডই বিপ্লবোত্তর।

ঝড়ের সঙ্গে ঝড়ের বেগে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে সঙ্গে থেকে একাদিক্রমে বছরের পর বছরের ৩৬৫ দিনের নিরন্তর মুক্তিযুদ্ধ

ও নির্মাণের হাজার কাজের অভিজ্ঞতাকে বিদ্যুৎ জ্বালার মতো সংগ্রহ করে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী ধারা তৈরী করতে হয়েছিল। কাব্যের দুটি মূল ধারা যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে। একটি লোককাব্য, আরেকটি মহাকাব্য ও গীতি কবিতার পরিশীলিত ধারা। লোককাব্যে শ্রমজীবী জনগণের অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলেও এতকাল পরিশীলিত কাব্যে এবং সাধারণভাবে পরিশীলিত সাহিত্যে শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের স্থান ছিল অকিঞ্চিৎকর। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এসে এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। মায়াকভস্কি কাব্যে এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীর ভাঙ্গার অগ্রদূত।

পরিশীলিত এবং বিশেষ করে আধুনিক ধারার কবিতায় শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত বিপ্লব ও জগৎব্যাপী অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দেবার জন্যে কবি হিসেবেই উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে মায়াকভস্কিকে। কারণ, কবিতা লিখে যে ধ্রুপদী কাজ করেছেন, তার যাচাই হয়েছে তৎক্ষণাৎ। বিপ্লবী সৈনিক সমাবেশে, কারখানা ও যৌথখামারে গণসমাবেশে নিত্য নতুন লেখা আবৃত্তি করতে হয়েছে। অসংখ্য বৃত্তি ও বিভাগের অগণিত ধরনের শ্রমজীবী নরনারীর অভিজ্ঞতাকে কষ্টিপাথর করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন তিনি। চারণের মতো তাঁকে যেতে হয়েছে দূরে দূরান্তে। এই সময়সাপেক্ষ ভ্রাম্যমানতার মধ্যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কি ঘটেছে তা লক্ষ্য করতে হয়েছে। তাঁর ১৪ বছরের সোভিয়েত পর্বেই তিনি ফ্রান্সে, জার্মানীতে, মেক্সিকোতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিবাদীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। কবিতার কাগজ বের করেছেন সোভিয়েত পর্বেও একাধিক। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯২০ সালে জনগণকে সর্বশেষ খবর জানানোর জন্যে সংবাদসংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন। ওই সময়ে ৩ হাজার পোস্টার ও ৬ হাজার শিরোনামা লিখেছিলেন। এগুলো ছিল ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গবাণী। ১৯২৮ সালে সারা সোভিয়েত দেশে পরিভ্রমণ করার সময় কবিতার শ্রোতাদের কাছ থেকে ২০ হাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একটা বই লেখার কথা ভেবেছিলেন।

অর্থাৎ, শ্রমজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমজীবীর সমস্ত গুণ আয়ত্ত করেছিলেন।

যখন চিন্তা করা যায়, 'বেডবাগ' ও 'বাথ হাউস' নামের দুটি পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক লিখেছিলেন তিনি এই ১৪ বছরের মধ্যেই তখন তাঁর শ্রমময়তাকে উপলব্ধি করা যায় তীব্রভাবে।

মায়াকভস্কি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী চলচ্চিত্রেরও একজন নীতিনির্ধারক ও নির্মাতা। তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন। বছরের পর বছর আইজেনস্টাইন ও অন্যান্য সাথীর পাশাপাশি কাজ করেছেন তিনি।

সুতরাং বুঝতেই পারা যায়, কী বিস্ময়কর তাঁর পরিশ্রম ও জেদ এবং চেতনা এবং গতি ও নির্দিষ্টতা।

এর মধ্যে সময় করে একটি আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন তিনি গদ্য কড়চার রীতি

একটি কড়চায় তিনি বলেছেন, একটি উপন্যাসকে তিনি মাথায় নিয়ে ঘুরেছেন, কিন্তু লিখে উঠতে পারেন নি।

তার অবস্থাটা ছিল এই রকম।

তাঁর সাথী কবি আসেয়েভ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, মায়াকভস্কি কোন খসড়া না করেই কবিতা লিখতেন। কাটাকুটি কম থাকতো। প্রকৃতপক্ষে ভাবনাগুলোকে তিনি মাথায় করে নিয়ে ঘুরতেন এবং সেখানেই ঠিকঠাক করে নিতেন। এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তার তীব্রতা তাঁর একটি উক্তি দ্বারা অনুধাবনীয়। মায়াকভস্কি একটি কবিতায় লিখছেন ঃ

'এক টন শব্দের ধাতু ছেঁকে আমি বার করে আনি একেকটা কথা।'

মায়াকভস্কি ১৯২০ সনে 'পুশকিনের প্রতি' কবিতায় লেখেন, "আমার লঘু মস্তিষ্কে হাজার টনের ভার চাপানো রয়েছে।"

এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই অবশ্য মায়াকভস্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী কবি।

তিনি শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন সারা সোভিয়েত দেশে এবং সীমান্ত ছাড়িয়ে।

'ইহা' কাব্যে মায়াকভস্কি কবিতা লেখার প্রক্রিয়াকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কবির মস্তিষ্ক থেকে কবিতার উৎপাদন যেন যন্ত্র থেকে একটা সুন্দর কিছু বেরিয়ে আসার শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। কমিউনিজমের আদর্শে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের সঙ্গে মায়াকভস্কির একাত্মতার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত দুটি অনুচ্ছেদ ঃ

(ক)

"শ্রমজীবীরা
কমিউনিজমে আসে
পাতাল থেকে খনি থেকে
কাস্তে থেকে কারখানা থেকে।
আমি কমিউনিজমে
নিজেকে নিক্ষেপ করেছি
কবিতার উঁচু চূড়া থেকে।

কারণ এছাড়া আমার জন্যে
কোনো প্রেম নেই।"

(ঘরে ফেরার পথে—১৯২৫)

(খ)

আমি যে কবি আমার
বজ্রনাদী শক্তি সমস্তই
সঁপেছি তোমাকে হে
আমার শ্রেণী
তুমি ন্যায়যুদ্ধে ব্রতী।
'শ্রমিকশ্রেণী' কথাটাকে কাব্যে ব্যবহারে
বড়ই বেয়াড়া মনে করে তারা
যারা কমিউনিজম কথা শুনলেই
আঁতকে ওঠে।
এই কথাটা কিন্তু আমাদের কাছে
বিশাল সঙ্গীত
এ সঙ্গীতে মৃত জেগে উঠে
অবতীর্ণ হতে পারে সংগ্রামে।

(লেনিন—১৯২৪)

৪

মায়াকভস্কি যে কমিউনিজমের আদর্শে তাঁর কবিতার ধারাকে কিভাবে উৎসারিত করেছিলেন, তার প্রকাশ শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের দিশারী লাল পতাকা ব্যবহারে।

প্রেক্ষাপটটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঝড়ের গতিতে অগ্রসর সোভিয়েত বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ডে বহুজাতিক শ্রমজীবী জনগণকে সমমর্যাদা দিয়ে একত্রিত করেছে, এগিয়ে নিয়ে এসেছে লাল পতাকা। শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রক্ষমতার বর্ণিল ঘোষণা। চেতনার তড়িৎশিখা। সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের ভ্রাতৃত্বের শপথ-ছবি।

এই লাল পতাকার মধ্যেই তাই পাওয়া যাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী উপাদানকেও।

এই প্রয়োগ যে মায়াকভস্কির কবিতা রীতিতেও একটা বৈশিষ্ট্য, তার দৃষ্টান্ত—নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলি ঃ

ঈগলের চোখ কি কখনো ঝাপসা হয় ?
আমরা কি মান্ধাতার আমলের দিকে ফিরে তাকাতে পারি ?
বুক টান করো, কাঁধ সোজা করো
আকাশে আকাশে আটকে দাও
হিল্লোলিত লাল পতাকাগুলোকে।
প্রশ্নই ওঠে না ডানে যাবার।
বাম!
বাম!
বাম!

(লেফ্‌ট্‌ ১৯১৮)

চিরকাল মনে আমাদের থাকছে
লাল পতাকা
অনেভা অঙারের মতো
জ্বলন্ত।

(সেভের্দলভেস্ক)

এগিয়ে চলো। ঐ সম্মুখে লাল পতাকা।
ঘরকুণোর পঙ্কশয্যা ছেড়ে বার হও।

আমাকে বার চারেক ধরবে বার্ধ্যকের জুজু,
তবে ফিরিয়ে আনবো যৌবনকে প্রতিবারই
শেষটায় কবর নাগাল পেতে পারে আমার।

তখন যেখানে মরিনা কেন
গান গেয়েই মরবো।

যে আঘাটাতেই ঢলে পড়ি না কেন,
নিশ্চিত জানি,
যারা শুয়ে আছে লাল পতাকার তলায়
আমি তাদের একজন হবার যোগ্য।

(ইহা—১৯২২-২৩)

(আমার কাব্যের)
শেষ পাতাটাও
তোমাদের দিচ্ছি
হে শ্রমিকশ্রেণী পৃথিবী গ্রহের
আমাদের সবাইকেই
লাল পতাকার তলায়
একত্রিত করেছে
অশ্রান্ত শ্রম অনশন অনাহার।

(উচ্চকণ্ঠে—১৯৩০)

৫

লাল পতাকার এই ব্যবহার থেকে একটি সিদ্ধান্তে যেতে চাই।

মায়াকভস্কি যে কবিতায় শ্রমজীবীর প্রাধান্য প্রকাশের জন্যে দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নিয়েছিলেন, লাল পতাকার উপরোক্ত ব্যবহারগুলি তার স্মারক।

এই সূত্রেই মূর্ত প্রতীক নিয়ে কাজ করার বহুকালের কাব্যিক সংকোচকে ভাঙবার জন্যেও এই লাল পতাকার ব্যবহার লক্ষণীয়।

আধুনিক কবিতার বিমূর্ত প্রতীক এবং স্বপ্নমঙ্গলের রীতির ব্যবহার করেননি মায়াকভস্কি। মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীককে নানাকৌণিকতায় প্রয়োগ করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। লাল পতাকার প্রতীক ব্যবহারেও এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্তু মায়াকভস্কি কখনও তাঁর রূপকল্প ও প্রতীকের কৌণিক প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করেননি। তাঁর মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীক এইজন্যে অসংখ্য। মায়াকভস্কি মহাজীবনের কবি। শ্রমজীবীদের বিপ্লব সোভিয়েত দেশে একটা বহুকালের জনগণের ঈপ্সিতকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং সারা বিশ্বেই তা করতে যাচ্ছে—এই প্রক্রিয়াটি তাঁর কবিমানসে উদঘাটিত হয়েছিল। দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও যে অজস্র বিচিত্র অনন্য রূপ উন্মোচিত হচ্ছিল তাকে মনের পটে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না যেন। কিন্তু যে অসংখ্য মূর্ত রূপকল্প তাঁর মনে জেগেছিল, সেগুলিকে সীমাহীনভাবে সজাগ থেকে থেকেই ধরেছেন।

এত অজস্রতার দরুণ তাঁর মূর্ত রূপকল্পগুলিও দুর্বোধ্য হয়েছে প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমত, অভিজ্ঞতার এত বেশি কৌণিক বাস্তব আলেখ্যের খেই রাখতে পারেন নি তাঁর সমসাময়িকরা সকলে। দ্বিতীয়ত, বিশাল ও বিচিত্র ও বহমান অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখার জন্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বাকরীতি প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং বিদগ্ধ বাকরীতি সত্ত্বেও মায়াকভস্কি তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাকেই শ্রমজীবী জনগণের কাছে হাজির করে যাচাই করে নিয়েছেন তার সত্য ও সৌন্দর্যকে।

লেনিনের অনুসারী মায়াকভস্কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূলসূত্র—'জনগণের জন্যে সংস্কৃতি'কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই যেন এক ধরনের গণভোট-দ্বারা মায়াকভস্কি নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন।

মায়াকভস্কির একটি নিশ্চয়তা, মেহনতী নরনারী যে বিশাল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন মানবতার আঁচ নিয়ে গড়ে উঠেছে, তিনি সেখান থেকেই মানবমানবী ও উপকরণ নিয়েছেন। এমনকি কিম্ভুতকিমাকার কিংবা ভোজবাজী ধরনের কাণ্ডকারখানাও যখন নিয়েছেন তখন নিশ্চয় জেনেছেন, শ্রমজীবীরা ব্যাপারগুলোকে তাঁর চেয়ে বেশি ভাল জানেন।

শ্রমজীবী জনগণও তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। তাঁরা যেটা বুঝতে পারেন নি, সেটা হাঁকডাক করে বুঝে নিয়েছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কবিতা শুনেছেন লালফৌজের সৈনিকরা, কলকারখানার শ্রমিক নরনারী, যুব সমাজ এবং কৃষকরাও।

আরও একটি কারণ ছিল দুরূহ কাব্যের এই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আদরের। মায়াকভস্কি শতকরা শতভাগ বিদগ্ধ কবিতাতে লোককাব্য বা রূপকথার রীতি কাজে লাগাতেন।

১৯২৭ সালে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছর পালন করার সময় মায়াকভস্কি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাজের ভিত্তিটা কোথায়—

কিংবদন্তী নয়,
মহাকাব্য নয়,
পুরাণ নয়,
সবই নিঃশেষিত।

ডানা মেলে উড়ে চলো,
হে কবিতা
টেলিগ্রাম-কায়া
কাজে লেগে যাও, নত হয়ে
তৃষ্ণায় চৌচির ঠোঁটে
পিপাসা মিটাও সেই নদী থেকে
যার নাম বাস্তব ঘটনা।

(উত্তম)

এই বাস্তব ঘটনার যারা কাজের কাজি তাঁদের জয়গানে মন্দ্রিত করেছেন তিনি তাঁর কাব্যকে। দৃষ্টান্ত, একই সঙ্গে ভারি ও কোমল।

কবিতার নাম 'কুজনেত্‌ সকস্ত্রয় ও তার নির্মাতাদের কাহিনী'। শিরোনামায় একটি গদ্য মুখবন্ধ ঃ

এখানে ১০ লক্ষ ওয়াগন গৃহনির্মাণের জন্য জিনিসপত্র পাঠানো হবে। একটা বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বিশাল কয়েকটা কয়লা খনি এবং লক্ষ লক্ষ লোক থাকার জন্যে এক নগরী তৈরি হবে পাঁচ বছরের মধ্যে—

মূল কবিতাটির আংশিক তর্জমা ঃ

"মেঘেরা চলেছে ভিড় করে দল বেঁধে আকাশ ভেদ করে
ঝরঝর বৃষ্টি বুকচাপা।'
কয়েকজন শ্রমিক বিছানা পেতেছে
একটা রদ্দি ছ্যাকরা গাড়ির তলায়।
ঐ শ্রমিকেরা ফিসফাস করছে
পরস্পর,
'গড়ে উঠবেই একটা বাগান নগরী এখানে
চার বছরেই পারা যাবে।'

দড়ির মতো মোটামোটা ধারার বৃষ্টি
একেকটা যেন চাবুকের ঘা।
শিসার মতো ভারী রাত কালির মতো অন্ধকার।
পরনের জামা কাদায় কাদাময় শ্রমিকদের।
মশাল জ্বলছে মিটিমিটি মিটিমিটি
ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জাম ফলের মতো নীল শ্রমিকদের ঠোঁটগুলো।
তবু ফিসফিস ফিসফিস
'এখানেই তৈরি হবে
বাগান নগরী!'
কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয় ক্রমে
বৃষ্টি আর মেঘের তর্জন চাপা পড়ে।
বাগান নগরী তৈরী হবেই
কারণ গড়বে এমন সব লোক যারা আমার
চোখের সামনে ঐ
সোভিয়েত রুশে।"

৬

উপরোক্ত অগণিত বাস্তব ঘটনাকে ঝাড়াই বাছাই করে কবিতায় ঢালবার ব্যাপারটাকে মায়াকভস্কি আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলেন বলে তাঁর এমন লেখা প্রায় পাওয়াই যাবেনা যা তাঁর ভাষাতেই তাঁর 'কবিচিত্তের চুম্বকাক্ষেত্র' থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

ভাব-প্রবণতা বেশ কিছু পরিমাণে তাঁর মধ্যে না থাকলে বিপ্লবের বিশাল ভাবপ্রবাহে শরিক হতে পারতেন কি? তিনি ছিলেন একটা 'সূক্ষ্ম তারের বাজনা'। বিপ্লবের আগে মায়াকভস্কির কবিচিত্তে ভাবের ঘোর খুব বেশি ছিল বিদ্রোহের বস্তুগত অবলম্বন না থাকায়। কিন্তু এই ভাবপ্রবণতাকে তিনি সংহত করতে পেরেছিলেন বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই।

কোন কাজের মধ্যে গতানুগতিকতা ও হুকুমনবিশী তাঁর কাছে ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী, কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে। আত্মসমালোচনা ছিল তাঁর কাছে অপরিহার্য। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে জড়িয়েছিলেন যে, একটু উনিশ-বিশ দেখলে চীৎকার করে উঠতেন। এই সূত্রে তিনি এমন সব ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন যেগুলি সাংঘাতিক রকমের আক্রমণাত্মক। কর্তাব্যক্তিদের কাগুজে জল্পনা-কল্পনাকে তিনি সুযোগ পেলেই ঠুকতেন। কর্তৃত্ববিলাসীদের একান্তভাবে হাস্যাস্পদ করে লেখা কবিতা যখন তিনি জনসমাবেশে রসিয়ে রসিয়ে প্রত্যেকটা শব্দের উপর জোর দিয়ে পড়তেন, তখন তিনি এবং শ্রমজীবী শ্রোতৃবৃন্দ তা' তারিয়ে উপভোগ করতেন। এ ব্যাপারটাতেও মায়াকভস্কি-কাব্যে কোন বিচ্যুতির প্রশ্নের উদ্রেক হয়নি। কারণ বিপ্লবই একমাত্র বিচার্য বিষয় থেকেছে। বিভিন্ন সংস্থার ভারপ্রাপ্তেরা একই সঙ্গে গোটাকয়েক সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় সংস্থার কাছ থেকে কাজ না পেয়ে যে রাগ ঝেড়েছেন মায়াকভস্কি তাঁর 'সম্মেলন সংঘটিত' কবিতায়, তাতে তিনি দেখিয়েছেন ভারপ্রাপ্তদের ধড় একটা সম্মেলনে, মাথা আরেক সম্মেলনে। আসল কাজের সঙ্গে দেখা নেই, কাগজে কাগজে সয়লাব—এই প্রবণতাটাকে কঠোর ব্যঙ্গ দ্বারা ঠুকেছেন কবি তাঁর 'কাগুজে' কবিতায়। শ্রমজীবীদের বিপ্লবের অস্থির অশান্ত সন্তান মায়াকভস্কি এখানে আপসহীন। বেশ কিছু ভোগবাদী কর্তাব্যক্তি এতে রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মায়াকভস্কি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি আল্সেদের কোপানলে পড়েছিলেন। তবে বিপ্লব প্রসারিতই হয়ে চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকেরা এবং বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বলতে গেলে 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি পেয়েছিলেন লেনিনের সম্মতি।

এখানে মূল কথাটা এই যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কমিউনিজমের আদর্শ জনগণের যৌথ ও ব্যক্তির মুক্তির সংঘটক হিসেবে বাস্তব ঘটনারূপে মায়াকভস্কি এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই বৈপ্লবিক সম্মতির আবহেই মায়াকভস্কির লেখার তাগিদ দশটা সাংগঠনিক কাজের মধ্যেও থেকেছে দ্বিধাহীন। দীর্ঘ কবিতা দাবী করেছে একেকটা বিষয়ে দীর্ঘ একাগ্রতা এবং দারুণ পরিশ্রম। মায়াকভস্কি এ দাবী মিটিয়েছেন।

মহাকাব্য লেখার দীর্ঘকালের রেওয়াজে সায় না দিলেও মহাকাব্যিক বড় কবিতাও তাঁকে লিখতে হয়েছে সোভিয়েত বিপ্লবের বিশালতা এবং তার মধ্যকার অসংখ্য সূক্ষ্ম কাজগুলোকে ভাষা দেবার উদ্দেশ্যে। লিখেছেন তিনি কাব্যনাট্য 'মিস্ট্রি বুফে', কাব্যনাট্য '১৫০০০০০০০'। লিখেছেন আধুনিক মহাকাব্য 'লেনিন'। 'উত্তম' নামে দীর্ঘ কবিতাও যেটিকে লুনাচারস্কি বলেছিলেন, 'এ কবিতা কাঁসার ধাতুতে অক্‌টোবর বিপ্লবের ভাস্কর্য।' লিখেছেন তিনি 'ইহা' অর্থাৎ 'প্রেম বিষয়ক'। এই সব কবিতাই এমন একেকটি মূল্যবোধে আশ্রিত, যাদের প্রত্যেকটি বিশ শতকের ঘটনাবলীতে উন্মোচিত হয়ে চলেছে এবং এই কারণেও মায়াকভস্কি ভাবীকালেরও কবি হয়ে রয়েছেন।

১৯১৮ সালে লেখা 'মিস্ট্রি বুফে' অক্‌টোবর বিপ্লবের জয়ের সংগ্রামী উল্লাসকাব্য। রূপকের ছাঁচে ঢালা। মেহনতী মানুষ আজ স্বর্গ মর্ত নরক বা ত্রিভুবন জয়ী। মেহনতী মানুষেরা দুঃখের অধ্যায়গুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই মর্তভূমি পৃথিবী গ্রহ নতুন জগতের কর্মভূমি হিসেবে নির্বাচিত। সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের বা পরগাছা পরশ্রমভোগী বিলাসব্যসন-ভোগকারীদের উৎখাত করে, নরকে পাঠিয়ে ধূলোমাটি কালিঝুলি মাখা অপরিছন্ন শ্রমজীবীরা, খাদ্য বস্ত্র যন্ত্রের উৎপাদকরা দখল নিয়েছে পৃথিবীর। শেষ দৃশ্যের একটি চুম্বক লক্ষণীয়; বুর্জোয়ারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীর যে ক্ষতি করেছে, মেহনতী মানুষেরা পৃথিবীর দখল নিয়ে সেগুলোকে মেরামত করে নিয়ে পত্তন করেছে মানুষের বহু প্রতীক্ষিত সাম্যের।

পর্দা উঠতেই দেখা যায়, কারখানা ও আবাসগৃহগুলো আকাশ ছোঁয়া। রেলগাড়ি, ট্রাম, মোটরগাড়ি, রংধনু গায়ে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগরীর মাঝখানে উদ্যান, তাতে তারা, চাঁদ আর সূর্যের আলোকমালা। নানারকমের পণ্যের 'হাতুড়ি ও কাস্তের' নেতৃত্বে মঞ্চে প্রবেশ। তাদের হাতে উৎসবের রুটি আর নুন। ভিড় করে জোট পাকিয়ে—দাঁড়িয়ে আছে একধারে—একদল অপরিচ্ছন্ন মানুষ।

অপরিচ্ছন্নরা—আহা আহা আহারে।
তৈজসপত্র—হা হা হা হা হারে।
চাষী—তোমরা কারা ? কাদের তোমরা ?
তৈজসপত্র—কাদের আবার ?
চাষী—তোমাদের অধিকারীর নাম কি ?
তৈজসপত্র—আমাদের কোন অধিকারী নেই।
আমরা সবাই প্রতিনিধি।
হাতুড়ি ও কাস্তে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।
এরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতীক।

যন্ত্রদের প্রবেশ :

যন্ত্রেরা ঃ আমাদের দোষ ভুলে যাও শ্রমজীবীরা।
তোমাদের হাতে আমরা গড়া
তোমরাই জোড়া দিয়েছ
তোমরাই শক্ত পোক্ত করেছ ঃ
কিন্তু বুর্জোয়ারা আমাদের জবর দখল করেছিল।
ওদের হুকুমে তোমাদের খাটাতাম।
ছিঁড়তাম খুড়তাম।
এবার ঐ চর্বিওয়ালারা খতম।
এখন আমরা স্বাধীন।
এখন আমরা তোমাদের
তোমাদের জন্যে কাজ করবো।
তৈজসপত্র—আমাদের তোমরা নাও, শ্রমজীবীরা।
খাদ্যেরা—পরগাছা আল্‌সেদের শেষ করেছ তোমরা।
রুটি এখন স্বাধীন এবং মিঠে দুই-ই।
এতদিন যা চোখে দেখেছ অথচ না পেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষেছ,
সবই তোমাদের শ্রমজীবীরা, ধরো, খাও।

অপরিচ্ছন্ন শ্রমজীবীরা এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়।

চাষী—মাটি,
এই মাটি
আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি।
ঘরামি—আমি একটা করাত নেবো।
এতকাল বেকার থেকে থেকে
আমার হাত দুটো ঢিলে হয়ে গিয়েছে।

অথচ আমার এখনও যৌবন, দেখো।
করাত—আমাকে নাও তুমি।
সেলাইজীবীনী—আমার দরকার একটা সুঁচের। আমার
হাতটা নিশ্‌পিশ্ করছে।
সুঁচ—আমাকে নাও।
ছুতোর—-আমার দরকার একটা হাতুড়ির৷
হাতুড়ি—নাও আমাকে।

অপরিচ্ছন্নরা, তৈজসপত্রেরা. যন্ত্রেরা, খাদ্যেরা একটা বৃত্ত রচনা করে উদ্যানে।

সমবেত ঘোষণা ঃ ওটা কি আকাশ না ক্যালিকোর ছিট কাপড় ?
ঐ ছিট কাপড় যখন আমরা বানিয়েছি
তখন কোন্ দরজাটা আমাদের জন্যে হাট করে খোলা না থাকবে ?
আমরা পৃথিবীদের স্থপতি
আমরা গ্রহদের রূপকার।
আমরা স্রষ্টা সমস্ত আশ্চর্যের।
বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে আকাশ থেকে ঝেটিয়ে ফেলে দেব মেঘ।
আমরা নদীগুলোকে ভরে দেব মধুতে।
খোঁড়ো। চাং তোলো। সেলাই করো।
ছেঁদা করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপরিচ্ছন্নদের গান ঃ

রূপকথা আজ সত্য হলে।
বিশ্বকে আমরা মিলিয়েছি কমিউনে
শ্রমজীবী মানুষের মালায়
সমস্ত দেশ জড়ানো।

এই কাব্যনাট্যকে সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চের প্রথম নাটক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। সোভিয়েত নাট্য পরিচালক মেয়ারহোল্ড এই কাব্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন। শোস্‌টাকোভিচ এর সুর সংযোজনা করেন। এঁরা সারা বিশ্বে দিকপাল হিসেবে পরিচিত। ১৯২১ সালে এই কাব্যনাট্যের জার্মান ভাষ্য মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। কয়েকটি কারখানাতেও এই কাব্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ এর মধ্যে থাকে কবিতা, শিল্পী ও তাত্ত্বিক এবং খেটে খাওয়া নরনারীর সহযোগিতা।

মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের মূল কথা যে বিশ্বের রূপান্তর ঘটানো, তার ভিত্তি স্থাপিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। শ্রমজীবীরা যাতে সারা বিশ্বকে

তাঁদের ধ্যানধারণায় পরিষ্কার রাখতে পারেন, তারও পথ করে দেয় এই অক্টোবর বিপ্লব। মায়াকভস্কি এই বিশাল দার্শনিক প্রেক্ষাপটকে প্রত্যেকটি শ্রমজীবী মানষের অভিজ্ঞতার আওতায় স্থাপন করে 'মিস্ট্রি বুফে' লিখেছেন। অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে নি। কারণ মানুষ জয় করেছে ত্রিভুবনকে। এতে রয়েছে বিজ্ঞানের বাহাদুরি আর শ্রমজীবী মানুষের কেরামতী। এই কাব্যনাট্যের অনুষ্ঠানে আছে সার্কাসের হাসি উল্লাস ও উল্লম্ফন আর ভাঁড়ের খেলা। শারীরিক বিস্ময়কর কসরত মেহনতী মানুষের প্রিয়। কারণ তারাই এটাতে পারদর্শী। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, গ্রীক পুরাণের মহাশক্তিধর হারকিউলিসকে গোর্কী প্রথম শ্রমবীর বলেছেন। এই সব কিছু নিয়ে এদের ছাপিয়ে রয়েছে কবিতার বাণী। সোভিয়েত বিপ্লবের দর্শন। জ্বালানির মতো একই সঙ্গে বিশাল যন্ত্রচালক এবং ঘরোয়া উনুনের উত্তাপ।

'মিস্ট্রি বুফে' লেখা এবং তার মঞ্চায়ন হতে না হতেই মায়াকভস্কি ১৯১৯-২০ সালে লেখেন ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্য। সাম্রাজ্যবাদীরা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে এবং অবরোধ ও হামলা করে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যে প্রয়াস করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সোভিয়েত জনগণ। এটাও ছিল জনগণের এক বিরাট অভ্যুত্থান। কবি এই বিশাল অভ্যুত্থানকে ভাষা দিয়েছিলেন ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্যে।

এই ১৫ কোটি নাম দেয়া থেকে শুরু করে এর বাক্-পদ্ধতি অভিনব এদিক দিয়ে যে, কবি যেন শুধু গণবাণীর উৎসমুখ খুলে দিয়েই গা হাত পা ঝেড়ে বসে থাকতে পেরেছেন। ভাষা আধুনিকতম, এইজন্যে একে লোককাব্যও বলা যায় না। অসাধারণ পরিশ্রম করে মায়াকভস্কি লিখেছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অহংকার নেই, কারণ, যে জনগণ বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রকে তাড়িয়েছে, তাদের কথারই তো তিনি শুধু লিপিকার। ১৫ কোটি এক ধরনের 'অটোমেটিক' লেখা, যা বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবী জনগণের সংস্পর্শে।

এইজন্যেই প্রথমে নাম দেননি নিজের। অপেক্ষা করেছেন, অন্যেরা কাব্যনাট্যটিকে প্রসারিত করুক। কেউ এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসায় এবং কে লিখেছে তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পরে মায়াকভস্কি নিজের নামে ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্য প্রকাশ করেন। এই ঘটনাটা তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন ১৯২৯ সালে।

এই কাব্যের দুটি অনুচ্ছেদ লক্ষণীয় ঃ

১. ১৫০,০০০,০০০ কথা বলছে
আমার দুটি ঠোঁটে।

২. আমি যেন মানবসমাজের নববসন্ত
শ্রমের এবং সংগ্রামের ব্যূহসজ্জায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি
আমার সমাজের গান গাইছি আমি
গাইছি আমার এ মাতৃভূমির গান।

এরপর মায়াকভস্কি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন 'ইহা' নাম দিয়ে। প্রেমকে বিপ্লবের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এভাবে প্রেমকে উদ্দীপিত করার যুক্তি দেখান। এই কবিতায় লাল পতাকার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, তবে প্রেমিকের অন্তর্জগৎ বর্ণনার মঞ্চ।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর পরই মায়াকভস্কির শোকগাথা আবার বিশ্বব্যাপী বিশাল পটভূমিতে লেখা। স্থান এবং কাল উভয় দিক দিয়েই। সময়ের দিক দিয়ে দুশ বছরে এবং স্থানের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে লেনিনের জীবনতরঙ্গের অভ্যুদয়। কার্ল মার্কস এখানে লেনিনের বড় ভাই। বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের দুশ' বছরের প্রধান লড়াইগুলো একসঙ্গে ও এমন মেজাজে বলা হয়েছে যে মনে হয় শ্রমজীবীরা আলাপ করছেন ঘরোয়া ভাবে। মানবতা ও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা স্বার্থান্ধ যুদ্ধ ও ধ্বংস নিয়ে আসে স্বদেশে ও উপনিবেশিক দেশগুলিতে। তার বিরুদ্ধে লেনিন সংহত করেন সমস্ত নিপীড়িত জাতিকে ও সমস্ত নিপীড়িত মেহনতী মানুষকে এবং সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র স্থাপন করেন। বীর লেনিন ও বীর শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র কৃষক এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনার নায়ক।

লেনিনের জীবন এমন ভাবে বলা হয়েছে যে, তত্ত্ব আছে পুরোপুরি, উন্মাদনাও আছে। মার্কসীয় তত্ত্বে খুঁত নেই, ঘটনার শিথিলতা নেই। তবে মূলত চরিত্র কাব্য। এবং এই জন্যই বলা যায়, লেনিন আধুনিক মহাকাব্য। প্রস্তাবনাটি একেবারেই মহাকাব্যিক রীতিতে বলা,

মানুষ
সাগর পাড়ির নৌকা যেন, যদিও ডাঙ্গায়।
জীবনের
টানা হেঁচড়ায় হরেক রকমের জঞ্জাল
পাথুরে সাগর থেকে খসে খসে
আমাদের নৌকার গায়ে লেপটে যায়, তারপরে
ঝড়ের উন্মত্ত ফেনিলতা কাটিয়ে উঠতেই
রোদে পিঠ রেখে কিছুক্ষণ বসে
আঁঠালে শেওলা আর পিছল মাছের আঁশ

কাঁচিয়ে ফেলে দি আমাদের
নৌকার গা থেকে
নৌকার গায়ের মত আমারও আষ্ঠেপৃষ্ঠে জঞ্জাল
তাকেও নিংড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবকে সাথে নিয়ে
সাগরে দিয়েছি তুলে পাল আমি
হয়েছি অনুসারী লেনিনের।

তিনটি দৃষ্টান্ত দিলে লেনিন কাব্যের মেজাজ এবং মূলমর্মটিকে পাওয়া যাবে ঃ

১. একজন ব্যক্তির দৌড়ে কতদূর ?
কারও উপকারে আসে না সংসারে।
একজন ব্যক্তি,
যত বড়ই হোক
একটা দল ছাড়া কাঠের গুঁড়িকে তুলতে
পারে না
উঁচু বাড়ি তোলা তো দূরের কথা।
কিন্তু পার্টি মানে লক্ষ লক্ষ
বাহু,
মাথা,
চোখ,
সংযুক্ত
এবং একসঙ্গে একই কাজে ব্রতী।
পার্টি
কম্পাস
আমাদের পথে ঠিক রাখে।

শিরদাঁড়া
সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর
লেনিন
এবং পার্টি
যমজ সহোদর।
কে বলবে
জননী ইতিহাসে
কে বেশি আদৃত ?

২. যখন শ্রমিকেরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েও
তাদের বিপ্লবী পথে
প্রথম পদক্ষেপ করেছিল
দৃঢ়চিত্তে
তখন বিশাল
প্রজ্জ্‌লন্ত চুল্লিতে
মার্কস তাঁর মন ও হৃদয়কে ঝালিয়ে ছিলেন।
মার্কস যেন প্রত্যেকটা কারখানায়
কাজের পালায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে
হাতে তেলকালি মেখে, প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছেন,
তাই বাড়তি মূল্যগ্রাসী পুঁজিপতি তস্করেরা
বমাল ধরা পড়ে গেছে তাঁর হাতে।

৩. (লেনিনের মৃত্যুর পরে পথে পথে জনতা)
পতাকা নিয়ে কিংবা
পতাকা ছাড়াও ওরা এসেছে
যেন সমস্ত রুশিয়া
আবার যাযাবর হয়ে গেছে কিছুকালের জন্যে।

৪. ক. বরখাস্তের নোটিশ
খাদ্যের দোকানে জানালার ধার দিয়ে
বেকারেরা চলে যায় তাকিয়ে তাকিয়ে
পেট গিয়ে পিঠে ঠেকেছে।
ডাক তাই এলো কুঁড়েঘর আর বস্তি থেকে,
শিশুদের কান্নাকে ছাপিয়ে,
"এসো, কে বাঁচাবে
এসো অন্যায়ের প্রতিকার করবে যে,
এসো আমরাও
সংগ্রামে নামবো,
এবং যেখানে বলবে যেতে যাবো
সেখানেই।"

খ. ঐ শোন নিগ্রো কি বলছে, তার পিঠে—
চাবুকের কত মার, বলছে ভুট্টা আর কলার বাগিচা থেকে,

"ওগো নীল, আমাদের নীল নদী,
একটা দিনকে করে দাও
কুমিরের ঝাপ্‌টা কিংবা
আমার রক্তের মতো---অগ্ন্যুৎপাত।
সে আগুনে সাদাকালো দু রং-এরই বেশি-ভুঁড়োগুলো
ঝলসে চৌচির হয়ে ফেটে যাক।
আমার দেহের রক্ত দেয়া যেন ব্যর্থ না হয়।
এসো তুমি আমাদের সন্ততিদের জন্যেও
হে সূর্যমুখ। হানো বিচার, আমাদের
সহায়তা করো।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো দু'শ বছরের ঘটনার চুম্বক।

'লেনিন' কাব্যের পরেই মায়াকভস্কি দীর্ঘতম কবিতা লেখেন 'উত্তম'।

অকটোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে লেখা এ কবিতার মূল সুরটি হচ্ছে, বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে---সোভিয়েত জনগণকে দেয়ালে পিঠ রেখে যে কার্যক্রম নিতে হচ্ছিল কয়েক বছর, তা সফল হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগে প্রবেশ করেছে। সারা দেশে বিশাল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাড়া, কলে কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে।

জনগণের উদ্দেশে লিখলেন---"আনন্দের ধারা উপচে উপচে পড়ছে।
এসো তোমাদের বালতি নিয়ে ভরে ভরে নিয়ে যাও"।

আরো দুটি অনুচ্ছেদ থেকে কবিতাটির গঠন ও মেজাজ এবং উত্তরণ বঝতে পারা যাবে ঃ

ক. বই-এর দোকানগুলো
স্তূপীকৃত বই-এ বোঝাই।
আমার নামও আছে
কবিতার গ্রন্থ তালিকায়।
ব্যাপারটা খুব মজাদার,
গর্বেরও, তাই নয় কি ?
আমার মুখে মিষ্টি হাসি।

ঐ যে ওখানে
আমার দেশের কাজে
আমার ছোট একটুকরো কাজ।

২. ভস্
ভোঁ,
ভস
ভোঁ,
চলো কাজ করে চলো আমার কারখানারা।
ভস্ ভস্ ভস্
চলো ইঞ্জিনগুলো আমার
কাজ করে চলো।
থেমো না
কখনো,
তৈরী করে দিও সূতির কাপড়
দেদার,
খুশি হবে আমার যুবসংঘের বালিকারা।
সুগন্ধ ঐ যে আসে ভেসে
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
ওটা ওদের জামার আতরের।
ক্ষেত
দিগন্ত ছোঁয়া।
চাষীরা
তাদের ক্ষেতে।
প্রখর বুদ্ধি রাখে ওরা।
ইয়া বড় বড় দাড়ি
যেন ঢাল
যেন লতা গুল্মের ঝোপ।
যখন মাটি পালটে দেয় ওরা
কী দক্ষতা,
মনে হয়,
কবিতা লিখেছে।

৭

১৯২২-২৩ সালে লেখা 'ইহা'। দীর্ঘ কবিতাটি ঘটনাক্রমিকতায় 'মিস্ট্রি-বুফে', '১৫০০০০০০০', 'লেনিন' ও 'উত্তম' কবিতা চতুষ্টয়ের সহমর্মী। এই 'ইহা' যেহেতু প্রেমের বিশেষ ব্যাখ্যা সে জন্যে এর কিছুটা অর্থোদ্ধার আলাদাভাবে করা দরকার।

বিপ্লবের আগে মায়াকভস্কি ২২ বছর বয়সে যে 'ইজার পরা মেঘ' কবিতা লিখেছিলেন, সেটি ছিল পুরুষ ও নারীর যৌবন বয়সের সেই সর্বাত্মক প্রেম, যাকে উভয়েই মনে করে নেয় বিশ্বসংসারের মূলাধার বলে। ইতিপূর্বেও কবি বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন এই একই প্রেম নিয়ে। তবে এগুলি আকারে ছোট।

সোভিয়েত পর্বে প্রবেশ করে মায়াকভস্কি যে কয়েক হাজার কবিতা লিখলেন, সেগুলিতে নরনারীর প্রেম মূলাধার হওয়া দূরের কথা, কদাচিৎ উল্লিখিত হয়েছে। এই অবস্থায়, কবির নিজের মনের মধ্যে এবং বেশ কিছু সংখ্যক কাব্যরসিকের তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল, কাব্যের মূলাধার হিসেবে যে প্রেম আদৃত হয়ে এসেছে, তার সম্পর্কে কবির কি কোনো বক্তব্য নেই ?

১৯২২ সালে মায়াকভস্কি এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে লিখেছিলেন, প্রথমে 'আমি ভালবাসি' নাতিদীর্ঘ বিদগ্ধ ধারার গীতিকবিতা। দয়িতাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন অনুপম মধুর ভঙ্গীতে। কিছুটা আত্মকথা, সামান্য স্বীকারোক্তি। জীবনের উপলব্ধি শুধু নারীর মন পাবার জন্যে নিয়োজিত থাকেনি। কবি তবু বলেছেন, "আমার হৃদয়টা প্রকান্ড হয়ে গেলো কবিতায়।" তার পরেই বলেছেন,

যদি একলা বইতে হয়
তাহলে পিয়ানোটা কত ভারী লাগে,
একই কথা ইস্পাতের আলমারীটাকে নিয়ে।
তাহলে তোমার কাছ থেকে একা
আমার হৃদয়টাকে
ফেরত নিতে হলে কি করে
পিঠে বয়ে
নিয়ে ফিরবো ?
জাহাজ কূলে ফিরে আসে
যাত্রীবাহী ট্রেন
ওরাও ফিরে আসে স্টেশনে যার যার
আমিও তোমার কাছে ফিরে আসি প্রিয়তমে।
আমার হৃদয়টা জমা তোমার কাছেই
তুমি বাক্স হৃদয়ের,
তুমি বাঞ্ছিতা, তুমি প্রেম-পাত্রী।

অতঃপর মায়াকভস্কি লিখলেন, 'ইহা'। প্রস্তাবনাতে এই সর্বনামটিকে নিয়েই বক্তব্য রেখেছেন। 'ইহা কি বিষয়ে' শিরোনামা দিয়ে শুরু করেছেন ঃ

এ বিষয়ে, ব্যক্তিগত এবং লঘু উভয়ত,
পূর্বে বহুবার যা হয়েছে গীত
কবিয়াল কাঠবিড়ালির খাঁচে
ঘুরেছি চকির মতো,
ফের একবার ঘুরতে চাই।
বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী ঃ 'সত্য চাই।'
বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী ঃ 'চাই সৌন্দর্য।'
বিষয়টা জরাজয়ী
কখনোই যাবে না বাইরে দৃষ্টির।
সুতরাং বিশ্ব জুড়ে দোলায়িত যে লাল রেশমের অগ্নিশিখা
বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে তোমার হাতেও তুলে ধরো।
এ বিষয় পুরানো চতুর চালে চলে যায় ডুবুরির মতো
ঘটনার নীচে
গায়ের চামড়ার নীচে প্রবৃত্তির পুঞ্জে মুখ গুঁজে
তারপর ঝাঁজিয়ে উঠে বলে
'কী স্পর্ধা যে ভুলে আছো'?
গায়ের চামড়ার তলা থেকে টেনে
আত্মাকে ঝাঁকানি দেয় একচোট।
বিষয়টা একদিন এসে আমার দরজাটাকে
প্রায় ভেঙ্গে ঢুকে বললো আমার
মাথা ঝামা-ইঁট।
সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ গৌণ হয়ে গেলো।
এ আমাকে কামারের মতো
মাথা থেকে পা অবধি করলো হাতুড়ি পেটা।
এর নাম ঃ

মায়াকভস্কি এখানে এর নাম আর বললেন না। কিন্তু পরবর্তী সর্গে প্রণয়িনীর জন্যে প্রণয়ীর অভিসারের যে পালা গাইলেন, তাতে মনে হল, সত্য-সত্যই প্রেম নামক কামারের হাতুড়ির পাল্লায় তিনি পড়েছেন। এ এক আত্মিক ঝড়ো হাওয়া আকাঙ্ক্ষার। মিলন হল না। বিরহের ইতিকথা সার শুধু। তবে প্রেম ও বিরহ যে একান্ত বাস্তব, এ সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কবি।

এই সত্যকে আরও প্রসারিত করলেন কবি শেষ পর্যন্ত। মেহনতি মানুষরা যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে, সেখানেই প্রেম পেলো চরিতার্থতা।

একটা দিনকে হাত পেতে নিতে ভিক্ষা
তারপর জরার অশেষ দুঃখে ডুবে যাওয়া আর নয়।
বরং ঐ ভূমণ্ডল কাম্য
'কমরেড' বলে ডাকতেই
সাড়া দিয়ে কাছে চলে আসে।
নিজের ভিটেতে পড়ে মরে থাকা নয়,
বরং ডাকবো ভাই বোন বসুধাকে
সারা পৃথিবীতে আছে স্বজন আত্মীয়।
সত্যি তাই। সমস্ত জগৎ
পিতা, মাতা।

সমগ্র মানব সমাজের আত্মীয়তার বিশাল সম্ভাবনাকে চোখের উপর বাস্তবায়িত হতে দেখতে পেয়ে কবি বিরহের আঘাত ভুলেছেন।

এরপরে ১৯২৮ সনে প্যারিতে বসে কবিতা লিখেছিলেন—'প্রেম বিষয়ে কমরেড কস্তরভের কাছে পত্র'। যৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য, প্রসাধন, প্রেমালাপ সবকিছুকেই বাস্তব নাম দিয়ে কবি লিখেছেন, প্রেমের অনুভূতি থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা পান। তবে এখানে নিজের জন্যে খুব বেশি আশা না করে কবিতা লিখে আনন্দিত করতে চেয়েছেন সেই প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদের, যাদের ভালবাসা সরল, মানবিক, সত্য।

কবির কাছে ভালবাসা একটা মহৎ অথবা পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এখানে তিনি কোপার্নিকাস হতে চেয়েছেন, অথবা আঙ্গিনায় দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি কাঠ চিরতে চেয়েছেন। বুঝতে পারা যায়, প্রেমকে জৈবিকভাবে অথবা ভাবের ঘোর হিসেবে আবদ্ধ করেন নি। তবে 'দূরে যা দূরে যা'ও করেন নি ভালবাসাকে।

'আমি ভালবাসি' এবং 'ইহা'র বক্তব্য এগিয়েছে ভালবাসা সম্পর্কিত সাম্যবাদী মূল্যবোধ গড়ে তুলবার দিকে।

এখানেও প্রেমিকের সেই 'প্রকাণ্ড' হৃদয় নিয়ে ঝামেলা। তবে কবিতা লেখার জন্যে কবিকে উদ্বেলিত করেছে এই প্রকান্ড হৃদয়টাইঃ

রূপকল্পের,
ভাবের,
দৃষ্টির একটা ঘূর্ণিবাত্যা
বেরিয়ে এলো নগরীর চনচনে গরম থেকে

তারপর তৃতীয় শ্রেণীর পানাগারে ভাপে সেদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতেই—
বাণী
আকাশের দিকে উঠে সোজা তারার দিকে ছুটে গেলো
যেন ধূমকেতু,
প্রোজ্জ্বল,
লেজটাকে অর্ধেক আকাশে ছড়িয়ে দিলো বর্ণিল পাখায়
আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল আকাশে।
জুড়োক চোখ প্রেমিক-প্রেমিকার
কুঞ্জে বসে ফুলের সুরভী নিতে নিতে ওরা তাকাক।
ওর কাজ,
  জাগানো,
    পথ দেখানো,
      প্রেরণা জোগানো,
ঐ তাদের যারা দ্বিধায় হতমান।

৮

মায়াকভস্কির এই 'প্রেম' বিষয়ক লেখাটি থেকে বুঝতে পারা যায়, ভালবাসা সম্পর্কিত মূল্যবোধকে তিনি শুকনো ঝামার মতো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করেন নি সোভিয়েত পর্বেরও যেকোন পর্যায়ে, যদিও কবিতার উৎপাদনের রিপোর্ট তিনি স্তালিনের কাছে চেয়েছেন লোহার উৎপাদনের পরিমাণের পাশাপাশি।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কুস্তীর তাত্ত্বিকরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারের একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করে আসছে, যার মোদ্দা বক্তব্য, মায়াকভস্কি বিপ্লবের আগে ভাল কবিতা লিখতেন, সোভিয়েতের পাল্লায় পড়ে শুকিয়ে গেলেন। এই প্রচার যে কত ভিত্তিহীন, তার প্রমাণ উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলো। বরং, সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেই প্রেমের সবুজ বৃক্ষ মায়াকভস্কির কাব্যে মঞ্জরিত।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। মায়াকভস্কির প্রাক্‌বিপ্লব কবিতা এবং বিপ্লবোত্তর কবিতা অবিভাজ্য। তাঁর প্রাক্‌বিপ্লব ব্যক্তিসত্তা এবং বিপ্লবোত্তর ব্যক্তিসত্তা অবিভাজ্য।

১৯২৮ সালে কড়চার ধরনে একেকটা বছর ধরে ধরে যে আত্মজীবনীর চুম্বক লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি গদ্যে, সেটি হচ্ছে এই অবিভাজ্যতার ধারাবাহিকতার দলিল।

১৯৩০ সালে মস্কোতে তাঁর কুড়ি বছরের কাজের যে প্রদর্শনী হয়, তার নামকরণও প্রমাণিত করে, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা প্রাকবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কবিতাকে একটি মালাতেই গেঁথেছিলেন। এই উপলক্ষে কবি যে ভাষণ দেন তাতেও তিনি তাঁর কাব্যের বিকাশকে তাঁর ১৭ বছর বয়স থেকেই হিসেবে ধরেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের উপযোগী চরিত্র গঠনে এবং কাব্যের কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে মায়াকভস্কি প্রস্তুত হয়েছিলেন তাঁর শৈশব থেকেই।

যে মায়াকভস্কি ১৯২৮ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দেন, তিনি ১২ বছর বয়সে জর্জিয়াতে স্কুলে থাকতেই মার্কসীয় পাঠ-চক্রে যোগ দিয়েছিলেন। তখন ১৯০৫ সালের বিপ্লব। ১৪ বছর বয়সে মস্কোতে স্কুলের ছাত্র। এই সময়ে তাঁর দেরাজে এঙ্গেলসের এন্টি-ডুরিং থাকতো। তিনি এই সময়েই বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মস্কোর রুটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি সংগঠনের কাজ করতেন। ১৯০৮ সালে ১৫ বছর বয়সে তিনি বলশেভিকদের গোপন ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। প্রায় এক বছর জেলে থাকার পরে বয়স কম থাকায় মুক্তি পান। কারারুদ্ধ হওয়ার আগেই 'উচ্ছ্বাস' নামের গোপন বিপ্লবী কাগজে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল। জেলখানায় বসে তিনি কবিতা লিখে খাতা ভরেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা বাজেয়াপ্ত করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর নেতৃস্থানীয়কে বলেছিলেন, 'আমি সমাজতান্ত্রিক ছবি আঁকবো।' শৈশবেই ছবি আঁকায় হাতেখড়ি। জেলে যাবার আগেই স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছিল দারিদ্রের জন্যে মাইনে দিতে না পারায়। রাজনীতিতে থাকলেন না এই কারণে যে, শিক্ষা নেই এবং তাছাড়া সে সময়ে গোপন আস্তানায় চলে যেতে হতো। ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকলেন এবং মস্কোর কলেজ অব পেইন্টিংএ ভর্তি হলেন। ইতিমধ্যে কবিতা লিখছেন মাঝে মাঝে। বন্ধু সহপাঠী শিল্পী ও কবি বারলিউক মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর কবিতায়। ছবি আঁকার এবং কবিতা লেখার সমবয়সী সাথীরা মিলে 'রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাণী' দল গড়লেন। মায়াকভস্কির যখন ১৭ বছর বয়স তখনই তাঁর কবিতা একটার পর একটা সংকলনে প্রকাশিত হতে লাগলো। মায়াকভস্কি ও বারলিউক কলেজ অব পেইন্টিং থেকে বহিষ্কৃত হলেন ভবিষ্যৎবাদী দলে থাকার অভিযোগে। এরপর থেকে মায়াকভস্কি হলেন সারা সময়ের কবিতাকর্মী। ১৯১৫ সালে মায়াকভস্কি ম্যাক্সিম গোর্কীর সান্নিধ্য লাভ করলেন, তাঁর কাগজে লিখলেন এবং তাঁর সামনে 'ইজার পরা মেঘ' কবিতা পড়লেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধকে উপলক্ষ করে 'যুদ্ধ ও শান্তি' নাম দিয়ে

দীর্ঘ কবিতা লিখলেন। তারপর লিখলেন দীর্ঘ কবিতা 'মানুষ'। এই দুটির কোনটিই সেন্সরের দরুণ প্রকাশিত হলো না। এতে বস্তুতপক্ষে সৈনিকদের যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাগিদ ছিল। প্রত্যেকটি কবিতাতেই আহ্বান ছিল শান্তি ও মানবতার জন্যে মহাবিপ্লবের, মহাবিদ্রোহের। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে মায়াকভস্কি বললেন, 'এ আমার বিপ্লব'।

রীতিদ্রোহী বিদ্রোহবাদী হলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী। কবিতার বস্তু ও রূপ উভয় দিক দিয়েই মায়াকভস্কির একটা অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা রয়েছে তার দুই পর্বের কাজেই।

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে এ সম্পর্কে এই ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

১. ভবিষ্যৎবাদ। ২. সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা। ৩. যৌবনের প্রচণ্ড আবেগের শক্তি এবং নির্যাতিত মানুষ ও জাতিমাত্রের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের প্রতি গভীর একাত্মতা। ৪. দলবেঁধে কবিতা লেখার চেষ্টা এবং তার মধ্যেই নিজের এবং একই সঙ্গে অপরের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি। বিপ্লবী সংঘ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক বিদগ্ধ কবিতাতে অনেকগুলো নতুন নতুন কোণ থেকে আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল সত্য সৌন্দর্য ও বাস্তব এবং ভাবের জগতে। এগুলোর মূলে ছিল যেমন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলোর ভাংচুর, তেমনি ছিল নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যে ক্রন্দন। এদের মধ্যে ছিল একই সঙ্গে বিকৃতি এবং সজীবতা। কবিতাতে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারাই তখন পর্যন্ত প্রচণ্ড দাপটে অধিষ্ঠিত। বিদ্রোহ ছিল চাপা আগুন। এই সময়েই বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটা রীতি দেখা দিয়েছিল। ভবিষ্যৎবাদ। এতে একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল, 'যন্ত্র এবং তার গতির মধ্যেই রয়েছে গতানুগতিকতার উচ্ছেদ।' রীতিদ্রোহ বা এই রীতিদ্রোহীদের কথা ছিল, 'আমরাই আমাদের পূর্বপুরুষ'। রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎবাদ আত্মস্থ করেছিল একদল তরুণ কবিকে। ১৯১০ সালে মায়াকভস্কি ১৭ বছরের যুবক, ভবিষ্যৎবাদী পন্থাকে পছন্দ করেছিলেন।

ভবিষ্যৎবাদী পন্থার একজন কট্টর প্রযোজক হিসেবে 'ভ্‌লাদিমির মায়াকভস্কি' নাম দিয়ে তিনি একটি নাটকও লিখেছিলেন। নাম ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছিলেন। তিনি তখন একটা হলদে কামিজ পরে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেলো, যে মায়াকভস্কি চোদ্দ বছর বয়সে এঙ্গেলসের এন্টি ডুরিং এবং লেনিনের 'দুই কৌশল' পড়েছিলেন, তিনি ভবিষ্যৎবাদের রীতিদ্রোহের

মধ্যেও নায়ক করেছেন দুঃখী শোষিত বঞ্চিত মানুষকেই। বুর্জোয়ারা যেভাবে ভবিষ্যৎবাদকে হাউইবাজীর খেলা হিসেবে প্রয়োগ করছিল, মায়াকভস্কি শুরুতেই তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ইতালীয় ভবিষ্যৎবাদী মারিনেট্টিকে মস্কোতে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে মায়াকভস্কি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তার পরেই তিনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ কবি সাথীর সঙ্গে মিলে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ইতালীয় ভবিষ্যৎবাদী রীতির সঙ্গে তাদের মতভেদ আছে।

বুর্জোয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে মায়াকভস্কি যে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায় যুদ্ধ বিরোধী কবিতা লেখেন, তাতে তিনি বুর্জোয়াদের প্রিয় অহংবাদী ভবিষ্যৎবাদী কবি সেভেরিয়ানিনকে লালসা-জর্জর গাইয়ে বলে ধিক্কৃত করেন।

মায়াকভস্কির রীতিদ্রোহিতার সেই সময়কার চূড়ান্ত প্রকাশ বিরহ-বিক্ষুব্ধ 'ইজার পরা মেঘ' কবিতায়। তদানীন্তন প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর উপর এলোপাথাড়ি আঘাত করেছিলেন তিনি তারুণ্যের ভাবোদ্বেলতা দিয়ে।

বিরহী চিত্তের স্বগতোক্তি এখানে চীৎকারের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই তরুণ বিপ্লবী কবি দুটি বক্তব্য এনেছিলেন, যাদের নিয়ে তিনি বিপ্লবোত্তর পর্বেও কাজ করেছেন। একটি অতিরিক্ত ভাবাবেগকে হাসির খোরাক করা। আরেকটি, 'ঐ মহাবিপ্লব আসে।' একটি বাস্তববাদী প্রেম। আরেকটি পরিবর্তনে আস্থা।

১. মারিয়া, আমার বড় ভয় পাছে তোমার নাম ভুলে যাই
ঠিক যেমন কবির মনে ভয়
বুঝিবা হারিয়ে গেল সদ্য পাওয়া একটা কথা যা
এখনও শুকিয়ে যায়নি কিংবা বিবর্ণ হয়নি,
বিধাতার মহিমার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো যার জেল্লা।
মারিয়া তোমার দেহকে
আমি সেইভাবেই ভালবাসবো এবং আদর করবো
যেমন করে যুদ্ধে পঙ্গু একজন সৈনিক
তার একটি অবশিষ্ট পায়ের সেবা করে।

২. আমি সে ব্যক্তি যাকে নিয়ে
সমসাময়িক গোষ্ঠী হাসাহাসি করে
যেন আমি একটা একটানা অশ্লীল ঠাট্টা
সেই আমিই দেখতে পাই সময়ের পর্বতমালাকে ডিঙিয়ে
যে আসছে তাকে,
অথচ যাকে এখনও দেখেনি কেউ।

যেখানটাতে ব্যাহত হয়ে মরা মানুষের চোখ থমকে থেমে যায়,
উপবাসী বিপুল জনতার পুরোভাগে
দাঁড়িয়ে সেখানেই দেখি আমি মাথায়
কাঁটার মুকুট পরে বিদ্রোহের
১৯১৬ সাল ঐ
আগত অদূরেই।

রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাদী বলে যখন তিনি জাঁক করে বেড়াতেন তখনকার এই কবিতাটি অথবা 'যুদ্ধ ও শান্তি' কিংবা 'মানুষ' ছিল প্রকৃতপক্ষে জীর্ণ সামাজিক রাষ্ট্রিক অচলায়তনের দুঃসহতার বিরুদ্ধে বজ্রনাদ প্রতিবাদ। তাঁর ভবিষ্যৎবাদের সারসত্তাটি ছিল নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত।

এই কারণেই বিপ্লবের পরেও মায়াকভস্কি যখন 'হলদে কামিজ'টি খুলে ফেলে দিয়েছেন এবং শ্রমজীবীদের লাল পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন, তখনও তিনি নিজেকে ভবিষ্যৎবাদী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি।

বিপ্লবের পরেই তিনি যে কবি সংঘ গড়ে তোলেন, তার নাম দেন 'ভবিষ্যৎ-বাদী লেখক সংঘ'। তিনি যে বামপন্থী শিল্পকলা সংস্থা গড়ে তোলেন, তাতে তাঁর ভবিষ্যৎবাদী সাথীরাই হয়েছিলেন মূল সহায়। সোভিয়েত পর্বের অসংখ্য কবিতায় নিজেকে তিনি 'ভবিষ্যৎবাদী' বলে চিহ্নিত ও সম্বোধন করেছেন।

১৯১৮ সালে 'শিল্পকলার সেনাবাহিনীর জন্যে বিধান' কবিতা লিখে তিনি জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎবাদীদের তিনি জনতার মধ্যে নামিয়েছেন ঃ

রাস্তাগুলো হবে আমাদের ছবি আঁকার তুলি,
চৌকোনা ময়দানগুলো হবে রং গুলাবার সরা।
সময়ের হাজার পাতার খাতায় টোকা থাকবে
বিপ্লবের গানগুলো
হে ভবিষ্যৎবাদীরা, নামো রাস্তায়
ঢাকীরা এবং কবিরা এগিয়ে চলো।

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাদের মর্মবস্তু বলে যাকে তিনি মনে করতেন তাকে তিনি সোভিয়েত বিপ্লবে সমর্পণ করেছিলেন।

৯

ভবিষ্যৎবাদী ভাবধারার একটি উপাদান 'যন্ত্র' সম্বন্ধে তিনি বিপ্লবের আগে খুব বেশি না লিখলেও বিপ্লবের পরে তাঁর কাব্যের একটা বড় উপকরণ হয়েছিল এটি।

প্যারির 'ইফেল টাওয়ার', কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্রুকলিন ব্রিজ' নিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা রয়েছে তাঁর। যন্ত্রের কীর্তি তাঁকে চমৎকৃত করতো বুঝতেই পারা যায়। কিন্তু মায়াকভস্কির উচ্ছ্বাস বুর্জোয়া ভবিষ্যৎবাদীদের উচ্ছ্বাসের বিপরীত মেরুতে উৎসারিত হতো। তার প্রমাণ রয়েছে এই দুটি কবিতাতে। 'ইফেল টাওয়ার'কে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন ফ্রান্সের নিপীড়িত মানুষদের বিদ্রোহের নিশানা দিতে এই লৌহমিনার ব্যর্থ হচ্ছিল বলে। 'ব্রুকলিন ব্রিজের' প্রকৌশলী বিস্ময়ের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, বেকাররা এখান থেকে অতল তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

যন্ত্র তার যন্ত্রী শ্রমজীবীর হাতে বিপ্লবের উপকরণ হিসেবে পরালে বিশ্বের রূপান্তরের সোনার কাঠি।

যেখানে এর বিপরীত ঘটনা, সেখানে যন্ত্রের ব্যর্থতা।

কখনও কখনও যন্ত্র আর মানুষকে তিনি একাকার করে দিয়েছেন বিপ্লবের প্রযোজক রূপে। দৃষ্টান্ত, 'কমরেড নেট্রো—স্টিমার ও মানুষের উদ্দেশে।' লাতভিয়ার কমরেড থিওডোর নেট্রো সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ করার অবস্থায় শত্রুর হাতে খুন হয়েছিলেন। তাঁর নামে একটি স্টিমারের নাম হয়েছিল। বন্দরে এই নামাঙ্কিত স্টিমারটিকে ঢুকতে দেখে মায়াকভস্কি কমরেড নেট্রোকে স্মরণ করেন ঃ

> একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের মরা বাঁচা
> এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের লৌহঐক্য।
> সকলে মানবসমাজের জন্যে বাঁচবো একটি ভ্রাতৃত্বের আবেষ্টনীতে।
> কয়েকটা লাতভিয়া কিংবা কয়েকটা রাশিয়াতে খণ্ডিত হবেনা
> আমাদের পৃথিবী।
> যখন মরবো,
> তখন অমর হবার জন্যেই মরবো
> স্টিমারে
> কবিতায়
> এবং যা কিছু স্থায়ী হয় তাতে ঢালাই হয়ে থাকবো।

যে দ্বিতীয় বিষয়টা প্রাক বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর মায়াকভস্কির কবিতায় ধারাবাহিকতাকে জোরদার করতো সেটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, যার একটা প্রচণ্ড প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি ঘৃণায়।

বিপ্লবের আগে 'যুদ্ধ ও শান্তি' এবং ১৯২৪ সালে লেখা 'লেনিন' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা একই ধরনের রূপকল্পের ব্যবহার করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটাবার মহাকাব্যিক বীর 'লেনিন' কাব্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের শোষণ ও শাসনের বর্ণনা দিয়ে তার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জানানো হয়েছে, সেই রকম ঘৃণাই জানানো হয়েছে বিপ্লবের আগেও একাধিক কবিতাতে। দৃষ্টান্ত 'পেরু' কবিতাটি। লেখা ১৯১৫ সালে।

সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক শোষণের কর্তাব্যক্তিদের তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এই বলে যে তারা—

> নাচের এবং পাখির এবং তোমার
> এবং আমার, পেরুর জন্যে অভিশাপ।

বিপ্লবের পরে 'পুশকিনের প্রতি' কবিতায় পুশকিনকে 'আফ্রিকার সন্তান' বলে সম্বোধন কিংবা আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা একাধিক কবিতায় নিগ্রোদের প্রতি ভালবাসা বন্ধুত্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত।

প্রাক্‌বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কবির সংযোজনা এসেছে উৎসর্গিত যৌবন থেকেও।

মায়াকভস্কি প্রেমকে বিশাল মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন কামুকতা ও সুরাসক্তির উপর খড়্গহস্ত। যৌবন তাঁকে ভবিষ্যৎবাদী করেছিল, যৌবন তাঁকে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের কর্মী হবার পরিশ্রম ও সাহস জুগিয়েছিল। প্রেমের কাছেও এটাই চেয়েছিলেন তিনি। প্রেম ও যৌবনকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন শ্রমজীবী জনগণের পৃথিবী রচনার কাজে।

পুশকিনের ১২৫তম জন্মদিনে ১৯২৪ সালে মায়াকভস্কি যে কবিতা লেখেন, তাতে বলেছিলেন,

> আমি মায়াকভস্কি যুবশক্তির কাছে আলোকস্তম্ভ।

'মায়াক' শব্দের অর্থ আলোকস্তম্ভ। এই শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি কিছুটা কৌতুক এবং কিছুটা গর্বের সঙ্গে।

এই 'যৌবন' প্রশ্নে তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেটা মায়াকভস্কির সমসাময়িক অসন্তুষ্ট বুর্জোয়া কবি টি এস এলিয়ট থেকে তাঁর আধুনিকতাকে স্বতন্ত্র করে বুঝবার জন্যে সহায়ক। 'প্রুফ্রকের' মতো প্রেমের কবিতাতে টি এস এলিয়ট অবক্ষয়ী বুর্জোয়াদের প্রতি ধিক্কার দিলেও বিপ্লবের পথে পা দিতে পারেন নি। এই কারণে তাঁকে লিখতে হয়েছে 'ফাঁপা মানুষরা' অথবা 'বুড়ো মানুষ'।

মায়াকভস্কি বিপ্লবের পথে ছুটে চলেছেন এবং এই জন্যেই বারংবার যৌবনকে ফিরে পাবার শপথ নিয়েছেন।

মায়াকভস্কির প্রাক্‌বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর পর্বের কাজের আরও দুটি সংযোগ—১. ছবি আঁকার কাজ, ২. দল বেঁধে কবিতা লেখার কাজ।

প্রথমত, ছবি আঁকার কাজ মায়াকভস্কির কবিতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। এই পদ্ধতি 'প্রকটবাদ' বা অভিব্যক্তিবাদ। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষ হয়েছে কবিতায় প্রকটবাদের অবলম্বন। বিপ্লবের আগে যেমন ছিল, তেমনি পরেও রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দল বেঁধে লেখার মধ্য দিয়ে নতুন ধারাকে জোরালো এবং অপ্রতিরোধ্য করার জন্যে ভবিষ্যৎবাদী মায়াকভস্কি বিপ্লবের আগে যত জোর দিয়েছিলেন, তার চেয়ে আরও বেশি সচেষ্ট হয়েছিলেন সোভিয়েত পর্বে।

কিন্তু এই দল বাঁধবার মধ্যে কোন গোষ্ঠীগত অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি।

পাস্তেরনাক ও ইয়েসেনিন—এই দুই কবি তাঁর গোষ্ঠীতে ছিলেন না। তাদের লেখার পদ্ধতি কিংবা সাধারণ কাব্যিক মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা ছিল। কিন্তু সমগ্র সোভিয়েত সাহিত্য এবং বিশ্বের প্রগতিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে এই দুই কবির সূক্ষ্ম অনুভবের কাজগুলিকে অথবা মানবিকতা ও সৌন্দর্যগুণকে তিনি জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

তরুণ বয়সী কবিরা তাঁর কাছে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কবিতা লিখবার জন্যে কি কি করণীয়? মায়াকভস্কি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে শেখাতে পারেন পাস্তেরনাক, যাও তার কাছে।

ইয়েসেনিন সুরাসক্ত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে গ্রামিণতা ছিল বলেও মায়াকভস্কি মনে করতেন যে, 'এ ছোকরা বিপ্লবের প্রচণ্ড কর্মকাণ্ডের দাবি মেটাতে পারবে না।' কিন্তু যখন ইয়েসেনিনের মৃত্যু হলো আত্মহত্যা দ্বারা, তখন মায়াকভস্কি তাঁকে উদ্দেশ করে যে কবিতা লেখেন, তার তুলনা হয়তো কীটসের মৃত্যুতে শেলীর কবিতা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধ্রুপদী কবি নতুন কালের পটে নতুন অগ্নিরেখাকে তরঙ্গিত করে দিয়ে লিখলেন ঃ

ভাষা-বসনের সেরা তাঁতি জনগণ
ইয়েসেনিন তার সেরা সাকরেদ কারিগর।

এলেক্সি টলস্টয় ও তাঁর অগ্নিপরীক্ষা

'আনা কারেনিনা,' 'রিসারেকসান' এবং 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের রচয়িতা লিও টলস্টয়ের জীবনসূর্য যখন অস্তমিত-প্রায় তখন 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের রচয়িতা এলেক্সি টলস্টয়ের জীবন সূর্যের উদয়। একজনের শিল্পরূপ সাধনার যখন সমাপ্তি, তখন আরেক জনের সাধনার উপক্রমণিকা। লিও টলস্টয়ের মৃত্যু ১৯১০ সালে। এলেক্সি টলস্টয়ের জন্ম ১৮৮৩ সালের ১০ই জানুয়ারী। মৃত্যু ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

লিও টলস্টয় উনিশ শতকের, এলেক্সি টলস্টয় বিশ শতকের। 'আনা কারেনিনা—রিসারেকসান—যুদ্ধ ও শান্তি'র লিও টলস্টয় উনিশ শতকের রুশ মহাজাগরণের মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পরূপকার।

'অগ্নিপরীক্ষা'র এলেক্সি টলস্টয় বিশ শতকের রুশ মহাবিপ্লবের মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পরূপকার।

লিও টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের ঘটনাকাল উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক। নেপোলিয়নের মস্কো অধিকার এবং মস্কো ত্যাগে বাধ্য হওয়া এবং নেপোলিয়নের পরাজয়ের বিস্তারিত ঘটনা এবং যে তদানীন্তন রাশিয়াতে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল—তার মানবমানবী চরিত কথাই 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। রক্তাক্ত যুদ্ধ, স্বাধীনতা, শান্তি, প্রেম, মানবতা, দেশপ্রেম ও উদারতা নিয়ে নতুন মূল্যবোধ জাগানোর কাহিনী।

এলেক্সি টলস্টয়ের 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের ঘটনাকাল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবর বিপ্লব, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের পটভূমিতে মানব মানবী কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। জাগানো হয়েছে সাম্যবাদী কমিউনিস্ট মূল্যবোধ।

লিও টলস্টয় 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে যাদের নিয়ে লিখেছেন তাদের অনেকেরই দেখা তিনি তাঁর যৌবনে পেয়েছেন, তবে ঘটনাটি তাঁর জন্মের আগেকার ঘটনা।

এলেক্সি টলস্টয়—অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসে যাদের নিয়ে লিখেছেন তারা তাঁর যৌবনের সমসাময়িক, ঘটনাও তাই।

লিও টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'কে ইতিহাসের দলিল ঘাঁটতে হয়েছে। দলিল থেকে বেছে নিতে হয়েছে শিল্পরূপ বক্তব্যের জন্য মালমসলা।

এলেক্সি টলস্টয়ের 'অগ্নিপরীক্ষা'কে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে। জীবন থেকে বেছে দিতে হয়েছে শিল্পরূপ বক্তব্যের মালমসলা। দুটো কাজই কঠিন সন্দেহ নেই। দু'টি উপাখ্যানই প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবু দু'টি উপন্যাস পড়েই মনে হয়, বড় বেশি সংযত। দু'জনেই বড় শিল্পী, তাই বড় নির্বাচক। এখান থেকে সূত্র নিয়ে 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসটি সম্বন্ধে এবং তার শিল্পরূপকার এলেক্সি টলস্টয় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

উপন্যাসটির তিনখণ্ড। প্রথম—দুই বোন, দ্বিতীয়—১৯১৮, তৃতীয়—বিবর্ণ সকাল।

প্রথম খণ্ডের কথা। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের জার্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তার পূর্বাহ্নে রাজধানী পেট্রোগ্রাদে রুশ বুদ্ধিজীবী যুবক যুবতীদের একটা অংশ যে অবক্ষয়ী জীবনযাপনে লিপ্ত, তার ছবি নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে।

তাঁর ইতিবৃত্তের কেন্দ্র হিসেবে লেখক বিশেষ করে বেছে নিয়েছেন দু'টি বোনকে। তারা এক বুর্জোয়া ডাক্তারের কন্যা।

দাশা আর কাতিয়া। দাশা ছাত্রী, কাতিয়া এক উকীলের স্ত্রী। দাশার বয়স ১৯, কাতিয়ার ২৪। জগদ্দল পাথরের মতো বিলাসী অভিজাত পেট্রোগ্রাদের চেহারা। স্বৈরাচারী শাসন চেপে বসে আছে উপর থেকে। মধ্য স্তরে ক্ষোভ, হতাশ্বাস এবং ভোগবাদী জীবন। এর মধ্যেই কিছু কবিতা।

একেবারে নীচতলার কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের বিস্ফোরণের সামান্য প্রকাশ।

দাশা এক ইঞ্জিনিয়ারের প্রেমে পড়লো। নাম তেলেগিন।

একই সঙ্গে সে আকৃষ্ট আধুনিক কবি বেসোনোভের প্রতি।

প্রথম আকর্ষণটি ভাববাদী।

দ্বিতীয় আকর্ষণটি ভোগবাদী।

এই দ্বৈত আকর্ষণটিকে এলেক্সি টলস্টয় অবচেতন মনের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে অবচেতন মনের কাজ সোভিয়েত উপন্যাসে দাশার জীবনেই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি অভিব্যক্ত।

কাতিয়া বলতে গেলে এক সুন্দরী ভাবপ্রবণা যুবতী হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই এক আকর্ষণীয় যুবা পুরুষের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

উদারপন্থী স্বামী ভাল মানুষ গোছের হলেও কাতিয়াকে সুখী করতে পারেনি।

স্বামীকে ছেড়ে কাতিয়া ফ্রান্সে চলে গেল।

দু'টি বোনেরই মন দ্বন্দ্বাত্মক অবস্থায় ছিল।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে যুদ্ধ এসে স্থাবর মহলগুলিতে এনে দিল ওলটপালট। তেলেগিন যুদ্ধে বন্দী হলো। বন্দীশিবির থেকে পালালো। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ এই দুই বছরের ঘটনাবলীকে চুম্বকের মতো উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ সম্ভবত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিটাকেই বড় করে সামনে আনা। ১৯১৬ সালের শেষের দিক। মস্কোতে কাতিয়ার স্বামী নিকোলাই আইভানোভিচ যুদ্ধের আয়োজনে কাজ নিয়েছে। কাতিয়া ফিরে এসেছে। দাশাও ইতিমধ্যে মস্কোতে।

তেলেগিন ফিরে এলো। দেখা হলো দাশার সঙ্গে। দাশাকে নিয়ে গেল পেট্রোগ্রাদে, যেখানে সে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়েছে আবার। বিবাহিত জীবন শুরু হলো।

এদিকে কাতিয়ার স্বামীর মৃত্যু হলো মস্কোতে। এর আগেই তার স্বামীর মারফত পরিচয় হয়েছিল ক্যাপ্টেন রসচিন নামক যুবা সেনানীর সঙ্গে। কাতিয়া খুঁজে পেয়েছিল এই যুবার মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষিত দয়িতকে। শুরু হলো ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব।

যুদ্ধ তখনও চলছে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় কারখানাতে শ্রমিকদের অধিকার, যুদ্ধাবসান করে শান্তি এবং জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার অকটোবর বিপ্লবের আয়োজন হচ্ছে। নৌ-সেনা আর পদাতিক সেনাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতা দখলের আয়োজন করছে পেট্রোগ্রাদের শ্রমিকরা। এই সময়ে রসচিন পেট্রোগ্রাদে কাতিয়ার খোঁজে আসে। কাতিয়া মস্কো থেকে পেট্রোগ্রাদে এসেছিল। এখানে দু'জনের বিয়ে হয়। সামনে একটা ঝড় আসছে।

ঝড়ের মুখে দু'টি দম্পতি, যারা প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী এবং রুশ প্রেমিক। তেলেগিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় শ্রমিকদের সঙ্গে তার একটা হৃদ্যতা জাগে। তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মত না থাকলেও সে প্রগতিমুখী। ক্যাপ্টেন রসচিন সেনানী হিসেবে সাবেক শৃংখলাবোধকে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। সুতরাং তার চিন্তা সেই সময়ে বিপ্লবের বিপরীত মুখী।

দাশা আর কাতিয়ার কোন নির্দিষ্ট মত নেই—তারা নিজ নিজ স্বামীর ভাবনায় শরিক। এখানেই প্রথম খণ্ড শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ড—১৯১৮। পেট্রোগ্রাদে অক্‌টোবর বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বিলাসী পেট্রোগ্রাদের শ্রীহীন চেহারা। বিলাসী বিলাসিনীরা পালিয়ে গেছে দক্ষিণে। কাতিয়া রসচিনকে নিয়ে তার বাবার কাছে চলে গিয়েছে।

দাশার একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে। সে উদ্‌ভ্রান্ত।

গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তেলেগিন লালফৌজে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। কাতিয়াকে পথে এক জায়গায় ফেলে রেখে ক্যাপ্টেন রসচিন প্রতিবিপ্লবী সাদা-ফৌজের সঙ্গে যোগ দিল।

শুরু হলো সংঘর্ষপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে কাতিয়ার যাযাবর জীবন। দাশা গেল প্রতিবিপ্লবীদের ফাঁদে পা দিয়ে মস্কোতে। সেখানে তখন সোভিয়েত সরকারের সদর দফতর। মস্কো থেকে সরে পড়লো ষড়যন্ত্রকারীরা। দাশা এরপর উপায়ন্তর না দেখে ফিরে গেল বুর্জোয়া ডাক্তার রাজনীতিক বাবার কাছে, যাকে নিয়ে সেই এলাকায় প্রতিবিপ্লবীরা একটা শ্বেত সরকার গঠন করেছে।

এখানে তেলেগিন এসেছিল দাশার খোঁজে। কিন্তু বেড়াজালে আটকে পড়ায় দাশা তাকে ছেড়ে চলে যেতে বললো।

ক্যাপ্টেন রসচিনের এদিকে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। কী করবে ভাবছে। কাতিয়াকে কি করে খুঁজে পাওয়া যায় সে কথা ভাবছে।

এখানেই দ্বিতীয় খণ্ড শেষ।

তৃতীয় খণ্ড হচ্ছে লালফৌজের সিদ্ধান্তকারী জয়ের কাহিনী। ক্যাপ্টেন রসচিন যোগ দিয়েছে লালফৌজে। কাতিয়া শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে। দাশা নিয়েছে নার্সের কাজ। দু'জনেই তাদের অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন-সত্যকে বুঝতে পেরে অক্‌টোবর বিপ্লবের জয়ের মধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে জীবন রহস্যের সমাধান। দুই বোনই শেষ পর্যন্ত পেল তাদের নিজ নিজ দয়িতকে।

বিপ্লব তাদের জীবনের ধারাকে, চিন্তার ধারাকে একই দিকে বিন্যস্ত করে দিয়েছে। সেটা সাম্যবাদী সমাজে যাবার দিক।

তাদের কাছে রয়েছে কমরেড লেনিনের সোভিয়েত গণপঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিকীকরণের সাম্যবাদের কর্মসূচী। দু'টি দম্পতি সাম্যবাদী দেশ গড়ার কাজে উৎসর্গিত। বিরাট কর্তব্য। বিরাট দায়িত্ব। দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক ভাবোচ্ছ্বাস বহু দূরে ফেলে আসা স্মৃতি মাত্র। পুনর্মিলনে এ জন্যই উৎসবের অবকাশ নেই। অভিজ্ঞতা যে চেতনা দিয়েছে, সেটি হচ্ছে উভয় দম্পতিরই কাহিনী। পরস্পরকে বুঝে নেয়ার প্রেমের উপকরণ। এখানেই তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসের উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসারের মধ্যেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে একটা দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক অগ্রগতি ধারা। সমস্ত উপন্যাসটি অগণিত ঘটনায় পূর্ণ। এতে রয়েছে পাঁচ বছরের কাহিনী। রণাঙ্গনের এবং বিপ্লবাঙ্গনের। সমস্ত উপন্যাসটি যেন এক বিশাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ নদী প্রবাহ। অসংখ্য চরিত্র এই সব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তারা কেন ঘটাচ্ছে সেটাও বলা হচ্ছে। কারণ বিপ্লবের পক্ষে হোক অথবা বিপ্লবের বিপক্ষেই হোক, প্রত্যেকটি চরিত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং সকলেই তাদের বক্তব্য বলছে। ধ্রুপদী উপন্যাসের একটি মূল বিশেষত্বকে অর্থাৎ মুক্তকণ্ঠে কথা বলাকে অগ্নিপরীক্ষার লেখক পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রতিবিপ্লবীরা যা বলেছে, সবই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। বিপ্লবীরা যা বলেছে, তাও সবই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এত ঘটনা, এত চরিত্র এবং এত কথা তবু ছড়িয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়নি। এর কারণ, চারটি মূল চরিত্রের একটি না একটির যোগ রয়েছে এই সব ঘটনা, চরিত্র ও কথার সঙ্গে। এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্যে যেহেতু চারটি চরিত্র শেষ পর্যন্ত নিয়োজিত হয়েছে, সে জন্য অসংখ্য ঘটনা, চরিত্র এবং কথাও বিন্যস্ত হয়েছে একটি সুষম শিল্পরূপেও। স্বাধীনতা আর ইতিহাসের দুর্নিবার গতিপরিণতির মধ্যে একটা সম্মিলন ঘটাতে পেরেছেন বলেই এলেক্সি টলস্টয় এই ধরনের একটা সত্য ও শিল্পরূপ সম্মত মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখতে পেরেছেন।

এখানে সোভিয়েত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং সোভিয়েত সাহিত্য বা উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এলেক্সি টলস্টয়ের শিল্পী জীবনের এবং শিল্পরূপ চিন্তার একটা বিশেষ গতি পরিণতিও প্রকাশ পেয়েছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কিংবা সোভিয়েত সাহিত্য বা উপন্যাস যদি স্বাধীনতাকে পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারতো, তাহলে এলেক্সি টলস্টয়ের মতো শিল্পীকে সোভিয়েত সাহিত্য টেনে নিতে পারতো না। অপর পক্ষে এলেক্সি টলস্টয় যদি না বুঝতেন যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সাম্যবাদী পরিকল্পনার মধ্যে মানব মানবীর স্বাধীনতা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তাহলে তিনি যে অক্‌টোবর বিপ্লবের পরে প্যারি কিংবা বার্লিনে চলে গিয়েছিলেন, সেখানেই শেষ হয়ে যেতেন। গোর্কীর আহ্বানেও ফিরতেন না মস্কোতে। দাশা কাতিয়া তেলেগিন এবং ক্যাপ্টেন রসচিনের মতো যে সব বুদ্ধিজীবী বিপ্লবের আগে বিপ্লব থেকে দূরে ছিল, তারা যে বিপ্লবের পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নিল—সে কথা তিনি লিখতে পারলেন এ রকম ঘটনা জীবনে ঘটেছিল বলেই। অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন স্বাধীনতা রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে।

তিনি বিপ্লবী দর্শন এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা একজন কমিউনিস্ট হিসেবেই দিয়েছেন।

উপন্যাসের এক জায়গায় একটি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর উক্তি, 'দর্শনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য দর্শন।'

আরেক জায়গায় লালফৌজের একজন নায়ক বলছে, 'বিপ্লব হচ্ছে বিজ্ঞান। এটা খামখেয়ালী ব্যাপার নয়।'

দাশা লালফৌজের এক সৈনিক মেয়েকে বলছে : 'কি জন্য লড়াই করছো বলতো? একজন নারী আকাশের তারার দিকে তাকাবে, চোখে তার জল থাকবে না, সে জন্য। আমিও চাই এই আনন্দকে।'

'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসে তিনটি বিষয় সামনে এসেছে। রুশ সোভিয়েত বিপ্লবের ঐতিহাসিক চিত্র। এই বিপ্লবে রুশ নরনারীর রূপান্তর এবং শিল্পী হিসাবে ও মানুষ হিসাবে এলেক্সি টলস্টয়ের গণবিপ্লবের পথে উত্তরণ এবং এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারা। এলেক্সি টলস্টয় আলাদাভাবে আত্মকথাও লিখেছেন। কিন্তু 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর যে আত্মকথা প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিত অনেক বড় এবং গভীরতাও অনেক বেশি

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সাহিত্যে শিল্পকলায় প্রতিনিধিত্ব-মূলক এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রের বৈপ্লবিক সংমিশ্রণের যে ধারা প্রবর্তনের তাগিদ দিয়েছে, 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাস তার একটি প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত।

অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে আমরা এলেক্সি টলস্টয়ের চরিত কথা পাবো। এলেক্সি টলস্টয় লিও টলস্টয়ের দূর সম্পর্কের অভিজাত কাউন্ট পরিবারের ছেলে হলেও প্রকৌশলী হিসাবেই তিনি প্রথম দিকে জীবনের দিগন্তকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন প্রকৌশলী স্নাতক। কিন্তু তিনি কবিতা এবং ছোট গল্প লিখতেও শুরু করেছিলেন। সুতরাং একটা সিদ্ধান্ত তাঁকে বেছে নিতে হলো। তিনি শেষ পর্যন্ত লেখক হলেন। একান্তভাবে একজন লেখক। লেখা যে একটা শিল্পরূপ তার মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন।

লিও টলস্টয় চেয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ—শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব হৃদয় পরিবর্তনের পথে।

এলেক্সি টলস্টয় চাইলেন সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদকে বিপ্লবের পথে।

লিও টলস্টয় নিজেকে লেখার কাজ ছাড়া আরও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োজিত করেছিলেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক এলেক্সি টলস্টয় লেখার মধ্য দিয়েই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন।

সোভিয়েত সাহিত্যের বিশিষ্ট বৈপ্লবিক ধারার কথা এবং বিশেষ করে সোভিয়েত উপন্যাসের বিশিষ্ট ধারার কথা তাই এলেক্সি টলস্টয়কে ছাড়া ভাবতেই পারা যায় না।

সোভিয়েত উপন্যাসের বিশিষ্ট ধারার মধ্যে এলেক্সি টলস্টয়ের বিশেষত্বটি স্মরণীয়।

সোভিয়েত সাহিত্যে আরও দুটি মহাকাব্যিক উপন্যাস রয়েছে। একটি হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির 'ক্লিম সামগিনের জীবন'। এটি লেখা হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব। দ্বিতীয় উপন্যাসটি হচ্ছে শলোকভের 'ধীরে বহে ডন'। এই বইটিও গোর্কির উপন্যাসটির প্রায় সমসাময়িক কালে লেখা হয়েছিল। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ।

তিনটি উপন্যাসই বিশাল নদী প্রবাহ। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর 'ক্লিম সামগিনের জীবন' উপন্যাসে একজন বুদ্ধিজীবীর চরিত কথা বলেছেন, যে প্রথমে বিপ্লবের আয়োজনকে দেখেছে আলগা থেকে, তারপর চুম্বকের টানে তার মধ্যে নেমে এসেছে, এবং তার পর ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে পথ খুঁজেছে। এখানে পটভূমি প্রধানতঃ নগর। শলোকভের উপন্যাসে কসাক যুবক গ্রেগর আর কসাক যুবতী আকসিনিয়ার প্রেমের গ্রামীণ কাহিনীতে এসে মিশেছে বিপ্লবের অমোঘ পরিবর্তনের তাগিদ। এখানে বারবার ফিরে এসেছে কসাক চাষীদের জীবন।

এলেক্সি টলস্টয় একটা সামগ্রিক ছবি দিতে চেয়েছেন। গ্রাম নগর নিয়ে যে সমগ্র রাশিয়া বিপ্লবের পথে ও নতুন জনগণের সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে বেরিয়ে এল, তাকে উপজীব্য করেছেন এলেক্সি টলস্টয়। কিন্তু তিনি এটা করেছেন প্রধানত উপলব্ধির মাধ্যমে। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরাই এখানে প্রধান।

তিনি যে 'ঘটনাবলীকে' তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন, সেগুলিকেও তিনি একটা সামগ্রিক রূপ দিতে পেরেছেন একজন বিশ্লেষক বুদ্ধিজীবী হয়েও।

এলেক্সি টলস্টয়ের এই বিশেষত্বকে নিয়ে আমরা যত বেশি আলোচনা করবো, তত বেশি গভীরে যেতে পারবো তাঁর চরিত বিচারে এবং সোভিয়েত উপন্যাসের চরিত বিচারে।

এলেক্সি টলস্টয়ের অন্যতম সুহৃদ সোভিয়েত লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় এলেক্সি টলস্টয় সম্বন্ধে যে কথাগুলি এখানে লিখেছেন, তার কয়েকটি পংক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য।

"তিনি একজন স্থপতির মতো কাজ না করে বরং একজন ভাস্করের মতো কাজ করতেন। তাঁর লেখক জীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি পরিকল্পনা করে লেখার রীতি পরিত্যাগ করেন। তাঁর চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠতো ক্রমপর্যায়ে, কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হতো এবং লেখককে নির্দেশ দিত গল্পের পরিণতি সম্বন্ধে। অনেক লেখক আছেন যাঁরা চিন্তাবিদ। এলেক্সি এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি চিত্রকর। মাছকে যেমন জল থেকে আলাদা করা যায় না তেমনি তাঁকে শিল্পকলা থেকে আলাদা করা যেত না।"

'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসটিতে রয়েছে এই শিল্পীর চূড়ান্ত একাগ্রতা এবং একই সঙ্গে কমিউনিস্ট গতিধারার প্রতি আনুগত্য। এই আনুগত্য তিনি কোন সময়েই যান্ত্রিকভাবে নেননি। তিনি যে একজন প্রকৌশলী ছিলেন, সেটা কখনও কাঁটার মতো বেঁধেনি তাঁর লেখায়। তিনি তাঁর 'আয়েলিতা' নামক বিজ্ঞানোপন্যাসে প্রধানতঃ মানব মানবীর প্রেমকে বড় করে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসটিতে কিংবা অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসে তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে। অগ্নিপরীক্ষা বইটিকে যে তিনি সমাপ্ত করেছেন সমাজতান্ত্রিক বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার ক্রজিজানভ্‌স্কির বক্তব্য সামনে এনে সেখানেও শেষ পর্যন্ত প্রেম এবং মানবতাই কাম্য।

পাবলো নেরুদা ঃ অবিরত কাব্যকৃতি

১

কমরেড পাবলো নেরুদার অমর বিপ্লবী চরিতকথা ও গীতিকবিতা, আধুনিকতম কাব্যরীতির প্রয়োগ এবং মহাকাব্য 'সাধারণ সঙ্গীত' যেমন কবির মাতৃভূমি চিলির জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের, তেমনি সমভাবেই লাতিন আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবীর শোষণমুক্ত নতুন সমাজ গড়ার প্রয়াস-ধন্য।

বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মানসের যে মৌলিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় ব্যাপক ও বিশাল বিপ্লবে নিয়োজিত এবং যার চালিকাশক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার কাব্যের দিকটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজে পাবলো নেরুদা সামনের সারিতে থেকেছেন। দেশ-দেশান্তরে কাব্যেও যে মৌল নতুনত্ব এসেছে শত শত জাতিসত্তার সাম্যের দাবিতে এবং মুখখোলা লোকসমাজ ও বিশেষ করে নিপীড়িত শ্রেণীমাত্রের বিদ্রোহী ভাষণে, সেখানে পাবলো নেরুদা একজন বহুজনের কাজ করেছেন। যুগযুগান্তের পরাধীনতা ও শ্রেণীগত পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনাকে হৃদয়বান কমিউনিস্ট কবি পাবলো নেরুদা বস্তুতপক্ষে সারা বিশ্ব পটভূমিতেই কাব্যের সূক্ষ্মতম অনুরণনের রূপ দিতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যে তাই যেমন বিশালতা, তেমনি অসংখ্য সূক্ষ্ম ছোট ছোট কাজ। স্বভাবতই নেরুদার কবিতায় রাজনীতি এসেছে, কারণ চিলির সংগ্রামী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবেই হোক অথবা বিশ্ব-শান্তি পরিষদের বিপ্লবী চারণ হিসেবেই হোক, কবি পাবলো নেরুদা কর্মী ও সৈনিক হয়েছিলেন। তবে মানুষের মনোজগত এসেছে তার সমস্ত উল্লাস ও রোদন নিয়ে, বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে, জৈবিকতার সাংস্কৃতিক গড়নের উত্তরণ নিয়ে তাঁর কাব্যে। আজও যা স্পষ্টরূপ হয়নি তাকে নেরুদা জোর করে স্পষ্ট করতে চাননি, কারণ তাঁর স্পষ্ট করার জন্যে প্রয়োজন মানুষের সাধনা। তিনি বাস্তবের পাশে রেখেছেন সম্ভাব্যকে, করণীয়কে। এই সমগ্র পাবলো নেরুদাকাব্য তাঁর মৃত্যুর পরে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছ থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশী চর্চা ও অনুশীলন এবং মনোযোগ দাবি করে, কারণ,

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে তত্ত্বের ভূমিকা বেড়ে চলেছে। কাব্যের ভূমিকাও বেড়ে চলেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নেরুদা তাঁর 'মচ্চুপিচ্চু' কাব্যের মধ্য দিয়ে লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের এবং এই সূত্রে বিশ্বের সর্ব দেশের শ্রমজীবী আদিবাসীদের বিশ্ব বিপ্লবে যেসব কথা বলে শরিক করেছেন, সেকথাগুলিকে সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে অনুরণিত করে তুলবার দায়িত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাব্য জিজ্ঞাসুদেরও এবং সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের তো বটেই।

১৯৭৩-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের নজরবন্দী অবস্থায় ৬৯ বছর বয়সে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত পাবলো নেরুদার মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহবহনকারীরা সান্তিয়োগোর কবরখানায় এবং কবরখানার পথে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গান করে যে নজির স্থাপন করেছেন, সেটা দিক-নির্দেশক। সাম্রাজ্যবাদীদের যে ফ্যাসিস্ট জল্লাদ সামরিক চক্র নেরুদার বন্ধু ও সাথী প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে হত্যা করেছে এবং যারা নেরুদাকে মৃত্যুশয্যায় নজরবন্দী রেখেছিল, তাদের আরোপিত সমস্ত বিভীষিকা ও নিষেধাজ্ঞাকে তুচ্ছ করে কবির সম্মানে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাওয়ার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবী কবি ও কবিতার এই মর্যাদা আমাদের ঈপ্সিত মূল্যবোধেরই পরিচায়ক। এই সূত্রেই স্মরণীয় 'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা' নামক আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের রচয়িতা ইউজিন পতিয়ে-র যখন ১৮৮৭ সালে মৃত্যু হয়, তখন তাঁর মৃতদেহবহনকারী শ্রমজীবীদের লড়তে হয়েছিল তদানীন্তন গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে। ইউজিন পতিয়ে ছিলেন প্যারি কমিউনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যে বুর্জোয়ারা প্যারি কমিউনের পতন ঘটিয়ে ২৫ হাজার শ্রমিককে প্যারি শহরে হত্যা করেছিল, তাদের বিঘোষিত শত্রু ছিলেন ইউজিন পতিয়ে। পতিয়ে-র মৃতদেহ নিয়ে ফ্রান্সের শ্রমজীবীরা আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাইতে গাইতে সরকারী শান্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রমজীবী জনগণের জগৎ রাজনৈতিকভাবে দুই কবির জন্যে যা করেছে, তাকে কাব্যিক বা সাংস্কৃতিক মানসিক দিক দিয়ে প্রসারিত করতে হবে সামগ্রিকভাবে ও সুদূরপ্রসারী অনুশীলনসূচী নিয়ে।

২

এই অনুশীলন বিষয়ে বিশ্বের সকল দেশেই কিছু কিছু কাজ হয়েছে। প্রয়োজন নেরুদা-চিন্তায় আরও পরিচ্ছন্নতা। প্রধানত সমগ্র নেরুদাকাব্যের ব্যাপক প্রচার এবং বিশ্লেষণ। নেরুদার সমগ্র কাব্যকে সুরক্ষিত করবার দরকার রয়েছে। এর কারণ ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারা নেরুদার প্রথম যৌবনের

কবিতাগুলিকে তাঁর পরবর্তী লেখা থেকে পৃথক করে নিয়েছে সৌন্দর্যের নামে, রসের নামে, শুদ্ধ কাব্যিকতার নামে, ব্যক্তিতার নামে। যদিও বিপ্লব, কিংবা জনগণ কিংবা শ্রমজীবী জনতা ফরমায়েস দিয়ে কবিতা লেখালে সে-কবিতার জাত যায় বলে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারা প্রচার করে আসছে, তবু তারাই কাব্য বিচারের কতকগুলো সূত্র বেঁধে দিয়েছে এবং এই সূত্র অনুযায়ী কবিতা লেখা হলেই শুধুমাত্র সেটিকে তারা স্বীকৃতি দেয়। নেরুদার অধিকাংশ লেখা তাদের সূত্রের সঙ্গে মেলে না। অথচ কিছু লেখাকে নিয়ে তারা এমনভাবে মাতামাতি করে যেন নেরুদা তাদের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে কাব্য জগতের রহস্যপুরীর দরজা খুলেছেন। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' নামক বইটি একটি দৃষ্টান্ত।

এই বইটিকে সচেতনভাবে আমাদের তরফ থেকে নেরুদার সমগ্র বিপ্লবী কাব্যে গ্রথিত রাখতে হবে। এতে প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে কবির যে তন্ময়তা ও জৈবিকতা রয়েছে, সেগুলি কমিউনিস্ট বিপ্লবী শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বকবি নেরুদার মূল কাব্য 'সাধারণ সঙ্গীত' অথবা 'স্পেন আমাদের হৃদয়ে' এবং এই ধরনের কাব্য থেকে পৃথক নয়।

আমাদের এই বক্তব্যের এবং বিচারের পক্ষে ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত কবি ও ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গ যে-যুক্তি তাঁর 'পাবলো নেরুদা-পরিচিতি' নামক প্রখ্যাত নিবন্ধে পেশ করেছিলেন, সেটি এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি নেরুদার সামগ্রিকতাকেও বুঝে নেবার জন্যে।

এরেনবুর্গ লিখেছিলেন ঃ

"কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান—এই কবিতার বইটি ১৯২৪ সালে প্রথম ছেপে বেরুলো। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি কবিতার সমস্ত সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো চিলির এক অখ্যাত লেখকের দিকে। ইনি নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন পাবলো নেরুদা নামে। কবির কয়েকজন অন্তরঙ্গই জানতেন যে, এটা হচ্ছে টেমুকোর অধিবাসী নেফতালি রিকার্ডো রেইসের ছদ্মনাম। বয়স তখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর এবং তিনি কাব্যমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন (তিন বছর আগে) ১৯২২ সালে একটি খুদে কবিতা গ্রন্থ নিয়ে।

লাতিন আমেরিকার কবিতার সেটা এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তীর্ণ হবার মাঝামাঝি অবস্থা। 'আধুনিকতাবাদ' নামে সাহিত্যিক ধারার শেষ বড় প্রতিনিধি রুবেন দারিও মারা গেলেন ১৯১৬ সালে। তিনি ছিলেন এমন একজন কবি যিনি ভার্লেনের জরাগ্রস্ত বিষণ্ণ সুরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিকারাগুয়ার ঝাঁঝরের উল্লাসমুখর সঙ্গীত। রুবেন দারিওর মৃত্যুর পর নানা

সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও দল অতীতের কাব্যের পাথরের মতো প্রাণহীন ও কঠিন প্রতীক এবং গতানুগতিক আবেগ সমেত সেই কাব্যকেই চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেউবা প্যারির সবচেয়ে নতুন চালচলন অনুসরণ করলেন সোৎসাহে, কেউ বা আবার স্থানীয় 'মতবাদ' উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু এইসব জিনিস অবাস্তব ভোজবাজির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারল না। পারল না 'মার্কুইস', 'রাজহাঁস', 'বীণা' এবং কাব্যের অন্য সব পচা পুরানো ঠাটঠমককে ঘসে মেজে পালিশ করে বাজারে চালু করতে।

'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' বইখানিতে কোনো আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু যারাই এ বই পড়লো তারাই বুঝলো যে, এমন একজন কবির জন্ম হয়েছে যিনি বাঁধাধরা নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন, নিজের পথ খুঁজে নিতে পারবেন।

গ্রীষ্মের বুকের মধ্যে
এই প্রভাত ঝড়ে ভরপুর।
মেঘেরা ভেসে চলে যাচ্ছে
বিদায় জানানো সাদা রুমালের মতো
সহযাত্রী বাতাস ওগুলোকে দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে।
আমাদের প্রণয় বিধুর নীরবতার ওপরে
বাতাসের অসংখ্য বক্ষের স্পন্দন।

গোড়ার দিককার লেখা এই বইটি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি এই কারণে যে, এদের ভিতরে ইতিমধ্যেই পাবলো নেরুদার শিল্পরূপের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। সেগুলি হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ, তাঁর কবিতার ভিতরকার চিত্রাবলীর সজীবতা, তাঁর কন্ঠস্বরের পরিপূর্ণতা।"

ইলিয়া এরেনবুর্গ কর্তৃক উল্লিখিত নেরুদার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যে আত্মনিমগ্নতা বা বিচ্ছিন্ন একাকীত্ব ছিল না, তার একটি আশ্চর্য প্রমাণও দাখিল করা রয়েছে 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' বইটির মধ্যে কিছুটা অন্যভাবে। এই বইটির ১৬নং কবিতার নামের নীচেই লেখা রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের ৩০নং কবিতার শব্দান্তর।

নেরুদার এই কবিতাটি এবং গার্ডেনারের রাবীন্দ্রিক ভাষ্য 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর'—উভয়েরই মূলসুর ভাবলৌকিকতা। তবে এখানে যে সামীপ্যটি কাজ করেছে তা কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন ক্ষয়িষ্ণু একাকীত্বের ব্যক্তিতা নয়। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' বইটি সম্বন্ধে এরেনবুর্গের বক্তব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যের লেখাগুলিকে সাজালেই বুঝতে পারা যায়,

জীবনকে বিশাল সংসারের অঙ্গনে দেখবার এবং বুঝে নেবার জন্যেও নেরুদা নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন একান্তভাবে প্রেমকে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্নে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের লেখা প্রেম প্রকৃতি ও লোকায়ত বিষয়ক ছোট ছোট কবিতার ইংরেজী তর্জমার ভূমিকাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি বলেছিলেন, এটি গীতাঞ্জলি থেকে স্বতন্ত্র। নেরুদা এই বইটির ইংরেজী অথবা স্পেনিশ তর্জমা পড়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে প্রধানত প্রেমোচ্ছল ও জীবনমুখী এই বইটিতে (ইংরেজী সংস্করণে) রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের একটি ছবি ছিল। যৌবনের হৃদয় রাঙানো কবিতাও ছিল সাধারণ গুণনীয়ক দু'জনেরই। কিন্তু 'গার্ডেনার' নিশ্চয় জীবনমুখী কথাই বলেছিল নেরুদাকে। নেরুদার বইটিতে যে প্রেম আছে এবং একান্ত নিজস্ব বাণী ও ভঙ্গীতে যা বলা আছে, তাতে জৈবিকতার প্রকাশ আছে কোথাও কোথাও, কিন্তু তাতে ক্লিন্নতা নেই, কোনো ভোগবাদী দর্শন নেই; রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যের সামীপ্য এই মনোভাব গঠনে সক্রিয় ছিল, ধরে নেওয়া যায় না কি?

আরেকজন কমিউনিস্ট কবিকেও 'গার্ডেনার' গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি জার্মানীর বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬। জার্মানীর একটি কাগজে 'গার্ডেনার' কাব্যের জার্মান অনুবাদের সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি ১৯১৪ সালে।

ব্রেখ্‌ট্ লিখেছিলেন, "এইসব প্রতি দিবসের অতি কিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম আর বিস্ময়কর স্পর্শপ্রবণ, অতিরিক্ত কবিতার জন্ম দিয়েছে। শব্দগুলি কোনো কাব্যিক নিয়ম, মিল বা ছন্দস্পন্দনের শিকল পরে না। এই পবিত্র রাখালিয়া নিসর্গের আছে নিজস্ব সঙ্গীত।" বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্ জার্মান কবিতায় যে একান্ত নিজস্ব ধারা এনেছেন শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি ও বিপ্লবের কাব্যিক ভাষ্যকার হিসেবে, তাতে 'গার্ডেনার' কাব্যের সুর প্রতিবন্ধকতা করে নি, বরং মানসিক উন্মেষে সাহায্যই করেছিল।

'গার্ডেনার' কাব্যের সামীপ্য ব্রেখ্‌টের মতো নেরুদার যৌবনের কবিতায় যে সুরটি ঝংকৃত করেছিল সেটি ক্ষয়িষ্ণু ছিল না, ছিল বর্ধিষ্ণু। যদিও তাতে তখন যৌবনের মাদকতা ছিল এবং স্বপ্নবিলাসও ছিল প্রচুর পরিমাণে, তবু তাতে গাঁজিয়ে যায় নি তাঁর চিত্ত। চিলির বাইরের পৃথিবীর হাওয়া বইছিল নেরুদার স্বদেশের নিসর্গে লালিত বিরহী চিত্তের আকাশেও। সে হাওয়াকে গ্রহণ করার মতো মন এবং কাব্যে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠেছিল সেই সময়েই। সুতরাং ১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে রক্তাক্ত

গণযুদ্ধ যখন নেরুদার কবিতায় মুক্তি সংগ্রামী জনগণকে ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে সবেগে একযোগে নিয়ে এল, তার জন্যে কাব্যিক রূপকল্প ও বাণীর আয়োজন সেদিনই করতে হয় নি তাঁকে। ১৯২৪ সালেই এ কাজ করে রেখেছিলেন তিনি ব্যাপক সংবেদনশীলতা ও কণ্ঠস্বরের প্রবণতাকে ব্যক্তিক আকুতির সঙ্গে মিশ্রিত করে।

এর পরে এই ধরনের আরও দ্বন্দ্বাত্মক উপাদানের অতি সাবলীল সংযোজন তিনি ঘটিয়েছিলেন 'পৃথিবী আবাসভূমি' (১৯২৫-৩৫) কাব্যপর্যায়ে। সেখানে অবশ্য আধুনিকতম বাস্তববাদী ইউরো-আমেরিকান কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বোদলেয়ার ও র‍্যাঁব থেকে শুরু করে পরাবাস্তববাদী সুররিয়ালিস্ট ফরাসী কবিদের লেখার অনুষঙ্গ, অনিবারণীয় মৃত্যুর যবনিকা সম্বন্ধে চিন্তা এবং দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক তনুরক্ষার আচার-বিচার ক্ষুধা ও যৌনতার চক্রায়নের দুর্বোধ্য জটিল এবং স্থূল ও তীব্র তীক্ষ্ণ সহজভাষী প্রকাশনা ঘটেছিল। এই চক্রায়নের মধ্যেও গড়ে তুলেছিলেন তিনি বিপ্লবেরই মালমসলা।

১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতান্ত্রিক শক্তির মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে শরিক করে নেরুদা তাঁর কবিতায় যখন একটা নতুন পরিচ্ছেদ ঘটালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পৃথিবী আবাসভূমি' (১৯৩৫-৪৫) কাব্যপর্যায়ে আধুনিক স্বপ্নকাব্য ছেড়ে আধুনিক জাগরণী কাব্যের সূচনা করলেন, তখনও তিনি তাঁর ১৯২৫-৩৫ পর্যায়ের লেখাকে বাতিল করে দেননি, কারণ, তাতে বিপ্লবের উপাদান ছিল। এর একটা দৃষ্টান্ত তাঁর ১৯২৫-৩৫ পর্যায়ের 'পৃথিবী আবাসভূমি'তে লেখা 'ক্রোধ-উত্তেজনা-দুঃখেরা' কবিতার শীর্ষে ১৯৩৯ সালের সংস্করণে তাঁর মন্তব্য। মন্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

"এই কবিতাটি ১৯৩৪ সালে লেখা হয়েছিল। তারপরে কত ঘটনাই না ঘটে গিয়েছে। যে স্পেনে বসে আমি এই কবিতা লিখেছিলাম সে এখন ধ্বংস-বেষ্টনীতে। আহা, যদি এক ফোঁটা কবিতা কিংবা ভালবাসা দিয়ে আমরা পৃথিবীর ক্রোধকে শান্ত করতে পারতেম। কিন্তু সে করা যেতে পারে শুধু সংগ্রাম করে সংকল্পবদ্ধ হৃদয় দ্বারা। বিশ্ব বদলে গিয়েছে এবং কবিতাও বদলে গিয়েছে। এই কবিতাটির ওপর যে একফোঁটা রক্ত পড়েছে, তা এই কবিতাতে থেকে যাবে, প্রেমের মতোই তা অনপনেয়। মার্চ, ১৯৩৯।"

এই মন্তব্যটি থেকে বুঝতে পারা যায়, নেরুদা তাঁর আগেকার কবিতাকে বর্জন করেন নি। পদ্ধতিকেও বর্জন করেন নি। ধারাবাহিকতার উপকরণ এবং যোগসূত্র না থাকলে এভাবে তিনি শহীদদের বুকের রক্তের ফোঁটা দিয়ে 'ক্রোধ উত্তেজনা ও দুঃখেরা' কবিতাকে শুদ্ধ করে নিতে পারতেন না।

৩

যে ধারাবাহিকতা ও যোগসূত্রের উপাদানগুলি গড়ে উঠেছিল তাঁর গোড়ার দিকের লেখাতেই সেগুলিকে আপাতত নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমত, নেরুদা বাস্তববাদী মেরুতে অবস্থান নিয়েই ভাববাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর যৌবনে চিলির নিসর্গের উদার আকাশ, বিশাল সমুদ্র ও প্রসারিত মৃত্তিকাভূমি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যেই মৃত্তিকাভূমির সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল ঘনিষ্ঠতম। বন্দর একটা প্রধান প্রতীক এই কারণেই তাঁর লেখার। এই বন্দরই লোকালয় ও নাবিকদের আশ্রয়।

দ্বিতীয়ত, নেরুদা দ্বন্দ্বমূলক গতিধারাকে তাঁর ১৯২৫-৩৫ সালের কাব্যপর্যায়েই গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন, এটা কখনও ভোলেন নি। শ্রমজীবীদের সঙ্গে নাড়ি বাঁধা ছিল তাঁর।

চতুর্থত, জীবনতৃষ্ণা মৃত্যুর অমোঘ উপস্থিতিকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। জীবনকণা, গাছের শিকড়, ফলের গুচ্ছ, গমের শীষ হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করার একান্ত বস্তুগত প্রতীক।

আগেকার জটিল পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেই বিভিন্নভাবে এই উপাদানগুলিকে নেরুদা অঙ্গীভূত করেছিলেন।

এই পর্যায়ের 'গার্সিয়া লোরকার প্রতি' কবিতাটিকে নেরুদা বোধ হয় লোরকার সহজ কাব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন।

এতে প্রথম দিকে সম্ভাষণের রূপকল্প যতই কেননা জটিল হোক, শেষের দিকে তা সহজ সরল এবং আমাদের উত্থাপিত যোগসূত্রের দু-একটি উপাদানকে সোজাসুজি সামনে এনেছে। মৃত্তিকার স্নেহধন্য প্রকৃতি-মানব ও চিরযৌবনের প্রতিভূ লোরকাকে নেরুদা সমকালীন জীবনের গভীর দুঃখের কথা জানিয়েছেন দারিদ্র্যের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেঃ

> সর্বোপরি রাতের বেলায়
> রাতের বেলায় অনেক তারা,
> এরা সবাই একটি নদীর ভিতরে,
> গরীব মানুষে ভর্তি বাড়িঘরের
> জানালাগুলির ধার দিয়ে ফিতের মতো টানা।
> কেউ মারা গেছে, বোধ হয় কেউবা
> ওরা চাকরি হারিয়েছে অফিসে,

হাসপাতালে, এলিভেটারে,
খনিতে,
মানুষেরা পাশবিকভাবে আহত হয়ে—ক্ষত নিয়ে ধুকছে
সর্বত্র রয়েছে অভিপ্রায় এবং কান্না।

নেরুদা আরেক জায়গায় বলেছেন,

এই হচ্ছে জীবন, ফেদেরিকো
এই হচ্ছে একজন বিষণ্ণ পুরুষোচিত মানুষ
যা তোমাকে জানাতে পারে।
ইতিমধ্যে তুমি নিজে নিজেই জেনেছ অনেক কিছু
বাদবাকি জানবে ক্রমে ক্রমে, সময়মতো।

১৯২৫ থেকে '৩১ সালের মধ্যে লেখা 'পৃথিবী আবাসভূমি' কাব্যে নেরুদা লিখেছিলেন, 'আহা, আমি যেন পারি অবিরত হতে এবং বিরত হতে।' 'লোরকার প্রতি' কবিতার উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ এই দ্বন্দ্বাত্মক গতি-চেতনারই আরেকটা রূপ।

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারা যায়, নেরুদা বৈপ্লবিক বিস্ফোরক উপকরণ জমা করেছিলেন অনেক আগে থেকেই।

একেবারে শুরুতেই পাওয়া যাবে এমন একটি উপকরণ ঃ

তুমি মৌমাছিদের উন্মত্ত যৌবন,
তরঙ্গের মদমত্ততা,
গমের শীষের শক্তি।

(১৯নং কবিতা—'কুড়িটি প্রেমের কবিতা')

নেরুদার কাছে এই শস্যবীজ শ্রমজীবী মানুষের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রাণ ও শ্রমের প্রতীক। একে তিনি 'সাধারণ সঙ্গীত' অথবা আরও পরে খোলাখুলি বিপ্লববাদী কবিতায় ব্যবহার করেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত ঃ

বুনো হাঁসের দল আর আপেলগুচ্ছ
প্রান্তর আর জলরাশি
আর অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে
অঙ্কুরিত বীজ।

(জাগো কাঠুরিয়া জাগো)

কিংবা

আমি যখন বলি, সময় হয়েছে
তখন আমি বুঝি, আবার ফিরিয়ে
আনা হচ্ছে স্বাধীনতা

আমি বুঝি হাজার হাজার থরো থরো কম্পমান
সে বীজ,
যা কিউবার মাটিতে ভালবাসায় মঞ্জরিত।
আর আমাদের মর্যাদার সেই শস্যকণা
দীর্ঘ অতীতের বিড়ম্বনা আর আতঙ্কিত
হৃদয় নিয়ে
দলিত লুন্ঠিত ক্ষেতে খামারে
আর আমাদের আমেরিকার বিপ্লবের
পতাকা
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।
(স্বাধীনতা)

বস্তুতপক্ষে নেরুদার কাব্যের সামগ্রিকতার নিরীক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছি যে, প্রথমত তিনি তাঁর তথাকথিত অরাজনৈতিক কাব্যপর্বের পদ্ধতি ও উপকরণ ফেলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়েছেন, তা আমরা কেউ দাবি করব না। তাঁর অন্তর্মুখিতা এবং বহির্মুখিতা, স্বগতোক্তি ও প্রকাশ্য ঘোষণা, একাকীত্ব ও জনতা-প্রবণতা যোগসূত্র ধরে পরবর্তী কবিতায় মিশ্রিত হয়েছে কমিউনিস্ট হয়ে জনগণের কাছে কবিতা আবৃত্তি শুরু করার পরে পর্যন্ত।

৪

নেরুদা ১৯৪৩ সালে মেক্সিকো থেকে স্বদেশে ফিরবার পথে পেরুতে ইনকা আদিবাসী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 'মচ্ছুপিচ্ছু'তে আরোহণ করে ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পাশাপাশি 'মচ্ছুপিচ্ছু' নিয়ে যে মহাকাব্যিক কবিতা লিখেছেন, তাতে 'পৃথিবী আবাসভূমি' ১৯৩৫-৪৫ কাব্যপর্যায়ের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষণের পদ্ধতি ছেড়ে বেশ খানিকটা আগেকার অস্পষ্ট সান্ধ্য ভাষণের পদ্ধতিতে কাজ করেছেন।

তবে, প্রাচীন ইনকা সভ্যতার নিদর্শন 'মচ্ছুপিচ্ছুর' নির্মাতা যে বিভিন্ন বৃত্তির সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষেরা, তাদেরই জয়গান 'মচ্ছুপিচ্ছু' কাব্য। 'প্রাচীন আমলে প্রত্যাবর্তন নয়, নতুন পৃথিবীতে অভ্যুত্থান'—এই আহ্বান রেখেছেন তিনি লাতিন আমেরিকার আদিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত চাপাপড়া নিপীড়িত মানুষের জন্যে। কিন্তু, প্রথমত, সম্ভবত একটি রহস্যময় অতীতের নির্মাতাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে নেরুদা বেছে নিয়েছেন সান্ধ্য পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত তিনি নিয়েছেন অতিরিক্ত আসক্তি-ভাষী অবচেতনার সাহায্য। এটা তিনি করেছেন কবিতার বোধ সম্পর্কিত আধুনিক ও প্রাচীন উভয় কার্যক্রমেরই

প্রতীতি থেকে। কবিতা আসক্ত, বিজ্ঞান নিরাসক্ত এবং বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ উভয়ের সম্পূরক—এই তত্ত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কথা। নেরুদা এই তত্ত্বেরই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন 'মচ্ছুপিচ্ছু' লিখতে গিয়ে।

এই কবিতাটির পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সমগ্র কাব্যের পারম্পর্যের চেতনা।

মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারার একান্ত প্রিয় এবং সংগ্রামের সঙ্গী এই কবিতাটির পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র কাব্যের পারম্পর্যের চেতনা। এতে প্রত্যক্ষ ভাষণও প্রবল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এই সময়েই 'সাধারণ সঙ্গীত' মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে চিলির অংশ লিখতে গিয়ে নেরুদা প্রত্যক্ষভাষণের সেই পদ্ধতি নিয়েছেন যা তিনি 'স্পেন আমাদের হৃদয়ে'তে শুরু করেন, যা তিনি ১৯৩৫-৪৫ সালে লেখা যাবতীয় কবিতায় খোলাখুলি বলার ধারায় বলেছেন। 'স্তালিনগ্রাদকে অভিনন্দন' অথবা 'বলিভার প্রশস্তি' কিংবা স্পেনের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'লুইস কম্পানিজ' কিংবা 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে ঘোষক পদ্ধতি রয়েছে, তা নিয়েই তিনি সাধারণ সঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ আসক্তির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন নেরুদা। আসক্তি, অনুরাগ, অন্তরাত্মা বা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বা প্রীতিকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের ধারক-বাহক কাব্য ব্যবসায়ীরা যৌন আসক্তি-তেই আবদ্ধ করে দেখতে চেষ্টা করে আসছে এবং পাবলো নেরুদার বিস্তৃত জীবনের কবিতাতে যে যৌন আসক্তি রয়েছে তাকেও যৌন ব্যবসায়ীরা তাদের বিকারে টানতে চেষ্টা করেছে নানারকম ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করে। কিন্তু নেরুদার অনুরাগের জগৎ এত বিশাল এবং একফোঁটা নয়নবিন্দু কিংবা একফোঁটা রক্ত কিংবা একটা পাখি অথবা অগণিত পাখিরা এমনভাবে তাঁর অনুরাগ বা আসক্তিকে সূর্যের আলোর কণিকার মতো নিজের ওপর টেনেছে যে, নেরুদার কাব্যের কিছু অংশে যৌন আসক্তির কথাবার্তা একটি খণ্ড প্রসঙ্গমাত্র। উপরন্তু সামগ্রিকভাবে যেটা নেরুদার কাব্যে ঘটেছে সেটা এই যে, নর-নারীর বাস্তব সম্পর্ক ভিত্তিক প্রেমের ব্যাপারটাই বিশাল জীবনের অংশ হয়ে পেয়েছে বহুমাত্রিক মূল্যবোধ। জৈবভিত্তিক প্রেম নেরুদার কবিতায় আত্মকণ্ডুয়নের আত্ম অবরোধ তৈরি করেনি। এর মূল কারণ অবশ্য নতুন মানব সমাজ গড়ার জন্যে কোটি কোটি মানব-মানবীর হাতে হাত রেখেছেন নেরুদা। এখানেই ফরাসি আধুনিক রীতির প্রবর্তক বোদলেয়ার প্রসঙ্গ আসতে পারে। নেরুদা একসময়ে বোদলেয়ারের প্রভাবে পড়েছিলেন নর-নারীর সম্পর্ক চিত্রণ করতে গিয়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বোদলেয়ার ১৮৪৮ সালে শ্রমিক বিপ্লবে যোগ দিলেও বিপ্লবের ব্যর্থতায় পরে শিল্পকলার জন্যে শিল্পকলার তত্ত্বে

চলে গিয়েছিলেন বিপ্লবের নব আয়োজনের পথ ছেড়ে। অপরদিকে নেরুদা স্পেনের গণতন্ত্র পরাজিত হবার পরেও আরও বেশী করে বিপ্লবের পথে নেমেছিলেন। তবু আসক্তি তার ব্যাপক অর্থে আসক্তিই বটে। বিজ্ঞানের নিরাসক্ত দৃষ্টির সঙ্গে এর দৃষ্টির প্রভেদ রয়েছে। এই আসক্তির মাত্রা নেরুদার কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই বেশি। বিজ্ঞানীও তাঁকে আসক্ত করেছে। প্রিয় বন্ধু এবং বিশ্বশান্তির সংগ্রামের সাথী বিজ্ঞানী জে ডি বার্নালের মৃত্যুর পরে ১৯৬৫ সালে পাবলো নেরুদা যে কবিতা লিখেছেন, তাতে এই ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে গভীর অন্তরঙ্গতা এবং প্রীতির সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রিয়তা। এই কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

বার্নাল, এই কথাটার
মধ্যে রয়েছে আগুন আর ঝংকার।
আমরা যদি উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে
একথাটা চীৎকার করে বলি
তাহলে পায়রারা দল বেঁধে উড়তে থাকবে
আলোর তরঙ্গমালা দরজা খোলা পাবে।
অধ্যাপক বন্ধু,
তুমি যা দিয়েছ সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ
তোমার সাহসের জন্যে, তোমার জ্ঞানের জন্যে
তোমার নামটির জন্যে।
উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে
আমরা গান করে যাব,
বার্নাল
বার্নাল
পায়রারা দল বেঁধে উড়তে থাকবে।

জীবন ও বিজ্ঞানের সত্যকে এইভাবে সুন্দর করে দেখবার এবং দেখাবার প্রবণতা নেরুদাকাব্যের একটা বড় দিক।

কিন্তু এখানেই নেরুদাকাব্যের একটা বড় রকমের বৈশিষ্ট্যও এই যে, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রবণতার দরুণ কোনো বুর্জোয়া স্তাবকের পাতা ফাঁদে তিনি পা দেননি। বরং, ঘটেছে উল্টোটা। 'কারাকাসের মিগুয়েল দ্য সিলভার কাছে চিঠি ১৯৪৮' নামক কবিতাতে বুর্জোয়া স্তাবকদের প্রসঙ্গ টেনে নেরুদা লিখেছিলেন ঃ

আমি তখন আমার প্রেমের কবিতাগুলো লিখছিলাম
সেগুলো আমার মধ্য থেকে গাছের পাতার মতো বেরিয়ে

বেড় দিচ্ছিল আমাকে।
আমি অবসাদের ঘোরে বুঁদ হয়ে রয়েছি তখন।
বেদের মতো ছন্নছাড়া তখন আমি
বর্ণমালাকে কামড়ে খাচ্ছিলাম,
তখন তারা আমাকে বললো,
'কি মহান ব্যক্তি তুমি, থিওক্রিটাস'।
আমি কিন্তু ওদের থিওক্রিটাস নই।
আমি বরং জীবনকে গ্রহণ করেছি,
তার মুখোমুখি হয়েছি,
আমি তাকে চুম্বন করেছি, জয় করেছি।
তারপর খনির সুড়ঙ্গগুলোতে ঢুকেছি
অন্যান্য মানুষ কিভাবে থাকে, তা দেখার জন্যে।
যখন বেরিয়ে এসেছি,
তখন হাতদুটোতে ময়লা ও বিষণ্ণতা।
আমার হাতদুটোকে জেনারেলদের সামনে তুলে ধরে
আমি বলেছি, "তোমাদের এই অপরাধের অংশীদার
আমি হতে পারি না।"
ওরা খুক খুক করে কাশতে শুরু করেছে,
হতশ্রদ্ধা দেখিয়েছে,
দেখা হলে শিষ্টাচারের সম্ভাষণ জানায়নি,
আর আমাকে থিওক্রিটাস বলে ডাকেনি,
সর্বশেষে আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে
আমাকে ধরবার জন্যে সমগ্র পুলিশবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।
এর কারণটা হচ্ছে এই যে,
আমি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে
কাব্য করিনি।

স্বাধীনতা, সাম্য ও শ্রমজীবী জনগণের যারা শত্রু এবং এই শত্রুদের যারা অনুচর তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা যত বেড়েছে, তত বেশি করে কাব্যিক জগতে যাতে নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহকে সরাসরি আনা যায় সেজন্যে নেরুদা সচেষ্ট হয়েছেন।

বিশেষ করে একটা ব্যাপার তাঁকে কাব্যিক গুণগত বৈপ্লবিক উত্তরণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নিজের জবানিতেই মৃত্যুশয্যাতেও এই উত্তরণের পরিচয় দারুণভাবে পরিস্ফুট।

বন্ধু কমরেড প্রেসিডেন্ট আলেন্দে ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের জল্লাদদের বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার তিন দিন পরে নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীর একটি পরিচ্ছেদ হিসেবে 'স্মৃতি বিস্মৃতি অনুস্মৃতি' নাম দিয়ে যে সংযোজনটি লেখেন, তাকে তাঁর কাব্যকৃতির মূল প্রেরণা করেন, সেকথা গভীর আবেগের সঙ্গে লেখা আছে। এখানে তার কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি ঃ

"খরা কবলিত শুষ্ক পাম্পাস-প্রান্তরে হাঁটাচলা বড় শক্ত। এই মরু অঞ্চল যেখানে দশকের পর দশক এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না এ জমি ছাপ রেখে যায় খনি শ্রমিদের দেহে মনে। আগুনে ঝলসানো ওঁদের মুখ আর জোড়াজোড়া তীব্র কালো চোখ সর্বহারা মানুষের অপার নিঃসঙ্গতা মূর্ত করে তোলে। যে-কেউ পথহীন অনাবাদী জমি ভেঙে আন্দিজের পাহাড় চূড়োগুলোয় ওঠে, যে-কেউ গরিব মানুষের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বুঝতে চায় তাঁর আশাহত ভবিতব্যকে, যে উপলব্ধি করে এই সব দারিদ্র্য পীড়িত ও অবহেলিত মানুষ তাঁদের বহুবাঞ্ছিত আশা পূরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তারই উপর, তার উপর বর্তায় তখন এক বিরাট কর্তব্যের বোঝা। আমি এসেছিলুম ওঁদের কাছে আমার কবিতা বিছানো পথ বেয়ে, আর ওঁরা ভাই বলে ওঁদের দুঃসহ কঠোর জীবনের সঙ্গী বলে চিরকালের মতো গ্রহণ করলেন আমায়...বছরের পর বছর এইসব মরু অঞ্চল পারাপার করেছি আমি। এখানকার বাসিন্দারা আমাকে তাঁদের সেনেটর বানিয়েছিলেন। যাঁরা খনি থেকে সোরা আর তামা তোলেন অথচ জীবনে কখনও কামিজের কলার আর টাই পরেননি, আমাকে তাঁরা বানিয়েছিলেন সেই শ্রমজীবী বাহিনীর প্রতিনিধি।

জনতাই আমাকে শিখিয়েছে, জীবন কী বস্তু। এমন একটা সময় ছিল যখন আমি জনতার কাছে যেতুম কবির সহজাত ভীরুতা নিয়ে, নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষের লাজুকতা নিয়ে। কিন্তু একবার জনতায় ডুব দিলে আমার রূপান্তর ঘটে যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত আমি তো তারই মেদমজ্জা আর সংখ্যাগুরুর একটা কণা, মানবজাতির বৃহৎ বনস্পতির একটি পল্লবমাত্র।

এযুগের কবির প্রধানতম বাধ্যবাধকতা হল, নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েও জনতার মধ্যে সহজভাবে মিশে যেতে পারা।

নির্জনতা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, চিলির তটভূমির উপর আছড়ে পড়া উর্মিমালার সংগ্রাম সে চিনিয়েছে আমাকে। বালুবেলার সঙ্গে সংগ্রামরত ঢেউ-এর পর ঢেউ, নোনাজলে ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়, সমুদ্র জীবনের রকমারি বৈচিত্র্য, পথিক পাখিদের নিখুঁত সারি বাঁধা ঝাঁক, নোনাজলের জৌলুস—এসব দৃশ্য মুগ্ধ করেছে আমায়।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি আমার জীবনের উত্তাল জোয়ারের ঢেউ, একসঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা শত শত চোখে দেখেছি আমি স্নেহের কোমলতা। হয়তো সব কবির পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু যাঁদের এই সৌভাগ্য হয়, তাঁরা চিরকাল একে হৃদয়ে লালন করে যান, তাঁদের বইয়ের পর বইয়ে একে মুদ্রিত করে রাখেন।"

মস্কোতে পাবলো নেরুদার সঙ্গে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকার করে ইলিয়া এরেনবুর্গ কবির শান্তির সংগ্রামের প্রশস্তি-গানের জনাকীর্ণতার দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছিলেন, "পাবলো নেরুদা বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন যে তিনি সমাধান খুঁজে দিতে চান না। তবু তিনি কিন্তু নিজের মতো করে এবং কাউকে অনুকরণ না করে আমাদের যুগের একটা সবচেয়ে জরুরী সমস্যার সমাধান করেছেন। সেটা হল জনগণের শ্রম এবং সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নতুন কাব্য সৃষ্টি। রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে মহৎ কবিতা মিল খায় না—'বিশুদ্ধ কবিতা'র প্রবক্তাদের এই নির্বোধ এবং বিরক্তিকর যুক্তির জবাব দিয়েছে তাঁর চমৎকার কবিতা।"

নেরুদা যে তাঁর কাব্যিক উপলব্ধিকে নিজের ব্যক্তিতার মধ্যে অবরুদ্ধ না রেখে এইভাবে নিজেকে 'বহু মানুষ' হিসাবে প্রকাশ করলেন, এটা বস্তুতপক্ষে সেই কমিউনিস্ট সমাজের উত্তীর্ণ হবার সূচনা, যেখানে—'সকলে প্রত্যেকের জন্যে, প্রত্যেকে সকলের জন্যে।' (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)

এখানে নেরুদাকাব্যের একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছেন, "নেরুদার সাধারণ সঙ্গীত একটি কাব্যে-উপন্যাস। অর্থাৎ এ কাব্য অসংখ্য চরিত্রচিত্র ভিত্তিক।"

ব্যাপারটা আসলে এই যে, শুধু 'সাধারণ সঙ্গীত' নয় অন্যান্য বহু কবিতাতে এসেছে অসংখ্য নর-নারীচরিত্র, যাদের মধ্যে একদিকে যেমন কবি নিজের বহুমানবত্বকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, তেমনি তারা জনগণের অযুত-নিযুত বিচিত্র সত্তা, যাদের প্রত্যেকটির মূল্য সমান। এরা এমনভাবে সক্রিয় যে, মহাকাব্যিক নাটকীয়তার ঊর্মিমালার কোনো শেষ হয় না।

বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, এত নাম করে করে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে কবিতা কি করে লিখলেন তিনি। শুধু লাতিন আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরে মুক্তি সংগ্রামী নর-নারীর নাম করে কবি জানিয়েছেন প্রশস্তি। যেখানে নাম করেননি, সেখানেও প্রত্যেকটি মুখরেখা সুস্পষ্ট।

এইসূত্রে দুটি কবিতা বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত। একটি 'পলাতক', আরেকটি 'পার্কে মৃত্যু'। দুটিই সেই ১৯৪৮ ও তার কাছাকাছি সময়ের চিলির কবিতা, যখন নেরুদাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ

হবার পরে। 'পলাতক' কবিতাটিতে কবির আত্মগোপন করার কাহিনী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সংগ্রামী নর-নারীর চরিত্র আবিষ্কারের কাহিনী।

'পার্কে মৃত্যু' কবিতা চিলির জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী যেখানে লাল-ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শ্রমিক নর-নারী সাধারণ ধর্মঘটে সমর্থন জানাতে গিয়ে সমর-কর্তাদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

এখানে যেমন সাধারণভাবে শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন আছে, তেমনি নাম করে করে কয়েকজনকে অভিনন্দিত করা আছে।

নিজেকে অসংখ্য সাধারণ ও অসাধারণ নর-নারীর সঙ্গে একাত্ম করার এই প্রবণতার আরেকটি চমকপ্রদ দিকও আমরা পাই নেরুদাকাব্যে ও নেরুদাচরিত্রে। সেটি হচ্ছে নিজের দেশের, লাতিন আমেরিকার এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কবি ও শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর গভীর ব্যাপক একাত্মতা। স্পেনের পাশে গণচীন।

প্রকৃতপক্ষে নেরুদার কাব্য বিশ শতকের বিপ্লবী বিশ্ব সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয়দের সমাবেশ-স্বরূপ। যাদের সঙ্গে কবির দেখা হয়েছে তাদের তালিকা প্রকাশ করেছেন কখনো কখনো। কখনোবা একেকজনকে বেছে বেছে অভিনন্দিত করেছেন। যাদের দেখেননি, তাদেরও যেন চোখের উপর রেখেছেন। মায়াকভস্কির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। বলেছিলেন, "আমাদের তরুণ বয়সে আমরা মায়াকভস্কির কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়েছিলাম। জরাজীর্ণ কাব্যের রীতি-নীতি, উষা ও প্রত্যুষের চুলচেরা বিচারের মধ্যে ধ্বনিত এক নতুন কণ্ঠস্বর ; তার আওয়াজটা যেন রাজমিস্ত্রির হাতুড়ির শব্দ। সমষ্টির হৃদয়ের দিকে কবি তাঁর দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি খুঁজে পেয়েছেন শক্তি তাঁর নতুন গানের জন্যে। আমাদের যুগের কাব্যে মায়াকভস্কির শক্তি, কোমলতা ও প্রচণ্ডতাকে আজও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।" পাবলো নেরুদা এইভাবেই কবিদের কবি, শিল্পীদের শিল্পী। স্পেনিশ ভাষার কবিদের তো কথাই নেই, অন্যান্য দূর-দূরান্তের ভাষাভাষীদের একান্ত আত্মীয় করে নিয়েছিলেন তিনি। মূল কথাটা অবশ্য 'শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়া' এবং গড়ার জন্যে সংগ্রাম করা। তাঁর 'হার্নাদেজের প্রতি' কবিতায় যে শপথবাণী, 'হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রতি' কবিতাতেও সেই শপথবাণী। এ ব্যাপারে সামান্য খটকাও রাখতে চাননি তিনি। কবি শিল্পীদের ভালোবাসা এবং আদরও পেয়েছেন তিনি। লুই আরাগঁ লিখেছেন কবিতা, 'পাবলো নেরুদার গান।' একই সঙ্গে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা প্রবল ছিল এবং খটকাবিহীন ছিল বলেই এই সারা বিশ্বে হাতে হাত রাখা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের যে ভিত্তি আছে, তার জন্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রতিবাদীরা যে সংগ্রাম করে আসছেন, সেজন্যেও নেরুদা দুহাত বাড়িয়ে আদর জানিয়েছেন।

পাবলো নেরুদার আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি নিদর্শন তাঁর ১৯৩৫-৪৫ সালের 'পৃথিবী আবাসভূমি' কাব্যের ৭ই নভেম্বর কবিতাটি। এই কবিতায় তিনি গণতন্ত্রী স্পেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭ই নভেম্বরের একটি সামীপ্য ঘটিয়েছিলেন। নিজেকে আশ্বস্ত করেছিলেন তদানীন্তন দুর্যোগের দিনে। আরেকটি নিদর্শন 'জার্মানীর গান।' তখন নাৎসিরা জার্মানীতে ক্ষমতাসীন। নেরুদা লিখেছিলেন,

হে জার্মানী, তোমার যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় থেকে
একটা নতুন নদী উৎসারিত হয়েছে।
দুর্ভাগ্য থেকেই এর জলধারা উঠে আসছে ওপরে।
গোপন কণ্ঠ লাল তীরভূমির ধার দিয়ে বেড়ে উঠছে
ডুবে যাওয়া মানুষ উঠে দাঁড়াচ্ছে, হাঁটছে।

এমনি আরও আরও নিদর্শনে ভরে আছে নেরুদাকাব্য। বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের জন্যে রয়েছে মুঠো মুঠো আশ্বাস আর শপথ।*

---

* 'কাঠুরিয়া জাগো' এবং 'স্বাধীনতা' অনুচ্ছেদ দুটি নিয়েছি অসিত সরকার ও কমলেশ সেন কৃত নেরুদা-অনুবাদ থেকে।

'স্মৃতি বিস্মৃতি অনুস্মৃতি' নিয়েছি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ থেকে। বাদবাকী অনুবাদগুলি আমার অর্থাৎ নিবন্ধকারের।

গিওগি লুকাচ ঃ মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি

১

হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক গিওগি লুকাচ সত্তরের দশকের প্রারম্ভে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ৮৬ বছর বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে লুকাচ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্মিলনের মার্কসীয় তাগিদের যাথার্থ্য প্রমাণ করে গেছেন তাঁর 'উপন্যাসের তত্ত্ব' থেকে শুরু করে 'সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব' ও অন্যান্য গ্রন্থে। এই বইগুলি হচ্ছে বস্তুতপক্ষে মার্কসীয় লেনিনীয় মানবীয় জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে রসায়িত বিশ্বের সর্বকালের মানব মানবীয় জৈবিক আত্মিক রূপের পিপাসা ও তার জন্যে প্রয়াসের দিকনির্দেশনা। যেসব খনি চারশ পাঁচশ বছর চলবে বলে দাবী করা হয়, তাদের মতোই অগাধ লুকাচের রেখে যাওয়া তত্ত্বের ভাণ্ডার। কিন্তু খনির মতোই তৈরী উপাদানই রয়েছে এতে। হীরা না বলে বলবো কয়লা। কারণ, আরব্ধ সাম্যবাদী বিপ্লবকে সম্পন্ন করার বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের জন্যে চাই ইন্ধন।

লুকাচের জীবনটাই ছিল বিপ্লবের ইন্ধন। কথা ও কাজকে ভাগ করেন নি। মার্কসীয় লেনিনীয় সৌন্দর্যতত্ত্বকে হাজার হাজার বছরের জ্ঞান ও রূপের উপকরণে সজ্জিত করার জন্যে দুরূহ বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু গণবিপ্লব তাঁর কাছ থেকে সহজ কাজও আদায় করে নিয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত উপন্যাসের উপর তাঁর তিনটি বই উপন্যাসের মতোই হৃদয়গ্রাহী।

মাতৃভূমি হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের স্নাতক গিওগি লুকাচ যৌবনে জার্মানীর ধ্রুপদী দার্শনিক কান্ট ও হেগেলের কাজকে সরেজমিনে বুঝবার জন্যে বার্লিনে ও হাইডেলবার্গে দর্শনশাস্ত্রের নামী অধ্যাপকদের সাহচর্য্যে বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। গুরুভার (ধ্রুপদী দার্শনিকতার টানে) জার্মান ভাষায় দখল এনেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানবত্তার ব্যাপারটা তাঁকে বাস্তব জীবনের এবং বিশেষ করে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বাইরে নিতে পারে নি। বরং তিনি দর্শন ও জ্ঞানবত্তাকে টেনে নিয়েছিলেন বাস্তব পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের কার্যক্রমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে গণপ্রজাতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েতের ধরনের শ্রমজীবী রাজ স্থাপনের সঙ্গে লুকাচ নিজেকে জড়িয়েছিলেন। এই নিয়ে প্রায় শতাব্দীব্যাপী বিপ্লবের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার অশান্ত যাত্রিক লুকাচ।

হাঙ্গেরীর বিপ্লব তাঁকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল শুরুতেই। ১৯১৯ সালের ১৩৩ দিন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শ্রমজীবী রাষ্ট্রে সংস্কৃতির দফতরের পরিচালকপদে ব্রত হয়েছিলেন লুকাচ। একটা বিরাট বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে তিনি এই দায়িত্বে উপর থেকে আসেন নি। ইতিপূর্বেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেমে পড়েছিলেন। ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের দরুণ যখন এরপর সোভিয়েত হাঙ্গেরীর পতন ঘটলো, তখনও বিপ্লবের নায়ক বেলাকুনের সঙ্গে তিনি ভিয়েনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপ্লবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে বেলাকুনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে লুকাচ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দক্ষিণপূর্ব ইওরোপীয় কার্যক্রম পরিচালিত করতেন। 'কমিউনিজমুস্' নাম নিয়ে তাঁরা জার্মান ভাষায় মুখপত্র বের করেছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি লেখেন এই কার্যক্রমেরই তাগিদে তাঁর বহু বিতর্কিত গ্রন্থ 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা'। ১৯৩০-৩১ সালে লুকাচ মস্কোতে মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। ১৯৩১-৩৩ সালে বার্লিনে যান জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যের কার্যক্রমে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি মস্কোর বিজ্ঞান একাডেমিতে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। বিশের দশকের পর থেকে লুকাচ বেশ কয়েকবার হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে স্বদেশে ফিরেই তিনি সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীর প্রতিষ্ঠার শরিক হন। তাঁর ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী ১৯১৯ সালের গণবিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে তাঁকে 'অর্ডার অব রেড ব্যানার' দিয়ে সম্মানিত করেন, কারণ তিনি ছিলেন এই বিপ্লবের একজন সংগঠক।

কর্মে ও মননে এইভাবে অদম্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লুকাচের কাছে বিপ্লব তার বাস্তব কার্যকরী সংগ্রামী রূপ নিয়েই চিরজাগরূক থেকেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বেও বাস্তবজীবন তাঁর কাছে মৌল উপকরণ থেকেছে বরাবরই।

স্বদেশেই হোক অথবা নির্বাসনে হোক সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করার জন্যে বিপ্লব তাঁকে যে অগাধ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা ও সংযোগ জুগিয়েছে, লুকাচ তাদের অপচয় বা অপব্যবহার করেন নি। এদিক দিয়ে লুকাচ দীর্ঘজীবী পিকাসোর মতো খাটিয়ে মানুষ। শ্রমজীবীরা যে শোষণমুক্ত বিশ্ব গড়বার

জন্যে ব্যাপৃত, একজন শ্রমজীবীর মতোই সৌন্দর্যের দিকটাকে লুকাচ পরিস্ফুট করে গেছেন তাতে।

তাঁর দুরূহ কাজও এইজন্যে বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমজীবীদের যৌথ সম্পদ। এবং এইজন্যেই স্বাভাবিকভাবে সহজ। দেশদেশান্তরের মানুষ অবশ্যই নিজ নিজ মাতৃভাষায় লুকাচের বইগুলিকে অনুবাদ করে নিয়ে এ সম্পদকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবেন।

হাঙ্গেরীর লুকাচ আমাদের রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে তুলনীয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে একেবারে নীচুতলার খেটেখাওয়া মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন বৌদ্ধ দর্শনের আচার্য রাহুল। এর ফলশ্রুতি, দার্শনিক হয়েছেন খেটেখাওয়া মানুষের বিপ্লবের রূপদর্শী। তাঁর বইগুলিতে দর্শন ও রূপের পিপাসা রসায়িত হয়েছে মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বে, যা তাঁর উপন্যাসের মতোই রমণীয়।

লুকাচের কাজের চরিত্র ও মেজাজের একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে বের্টোল্ট ব্রেখট ও কবিতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে।

পঞ্চাশের দশকে 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে লুকাচ লিখেছেন, "কবিতাকে যদি সফল হতে হয়, তবে সে কখনও অনিরুদ্ধ মনোময়তাকে খুটে খুটে খেয়ে খেয়ে তা করতে পারে না। এর উদ্ভবটাই হচ্ছে জীবন থেকে। বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার ব্যাপারে এর বিশেষ ধরনকে সেই একই শিল্পরূপগত বিধিবিধানগুলি নিয়ন্ত্রিত করে, যেগুলি উপন্যাস ও নাটকের নিয়ন্ত্রক। যেখানেই এই কাঠামোর অভাব ঘটে, সেখানে কবিদের স্বপ্ন জীবনের খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া অনুভবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জার্মান অতিব্যক্তিবাদে এটা দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষণীয়। এর বিপরীতটা ঘটেছে তরুণ ব্রেখটের ঘৃণায় উদ্দীপিত মহিমান্বিত 'মৃত সৈনিকের কাব্য' কবিতায়। এই কবিতাটি পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার শুদ্ধ সম্পর্ক থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছে।"

রেখে ঢেকে মুখরক্ষা করে বক্তব্য বলা লুকাচের ধাতে ছিল না। নিজেকেও তিনি রেহাই দেন নি। এমনকি ব্রেখটকেও নয়। বাস্তব জীবন থেকে সরে গেলে সত্য এবং সুন্দর দুইই উঠে যেতে বাধ্য, এই চিন্তাকে নিজের উপরেই প্রয়োগ করেছেন তিনি।

১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থের যে ভূমিকা লুকাচ ১৯৬২ সালে লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, ১৯১৫ সালে তিনি কান্ট থেকে সবেমাত্র হেগেলে পৌঁছেছেন। তাঁর নিজের লেখা বইকেই তাই মার্কসপন্থী হিসেবে তিনি বলেছেন straitjacket (আড়ষ্ট জামা)।

জার্মেন ও ফরাসী এবং রুশ ধ্রুপদী ঔপন্যাসিক গ্যেটে, বালজাক, ফ্লবেয়ার এবং টলস্টয়ের উনিশ শতাব্দীর কাজের বিশ্লেষণে তাঁর চিন্তা ও লেখার একটা

বড় অংশ লিপ্ত হলেও লুকাচ ৮৫ বছর বয়সে বিশ শতকের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে মার্কসীয় সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের পুরোভাগে থাকতে পেরেছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা এই যে, বিপ্লবী হাঙ্গেরীর মাটিতে তাঁর পা ছিল। তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে এই সত্যকে এবং পাওয়া যাবে তাঁর চিরসজীবতার অন্যান্য রহস্যকে।

বর্তমান নিবন্ধে তিনটি স্তবকে লুকাচের মূল অবদানকে উপস্থাপিত করছি চুম্বকাকারে।

২

শতাব্দীর শুরুতে বস্তুতপক্ষে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সাম্রাজ্যিকতার সূত্রে জার্মান ভাষার প্রচলনের দরুণ এবং হাঙ্গেরী অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের মূলকেন্দ্র বিদ্যাভিবাণী ভিয়েনার দখলে থাকার ফলে একদিকে জার্মান ভাষা ,বাধ্যতামূলকভাবেই চর্চা করতে হতো হাঙ্গেরীয়দের। তেমনি প্রজাতান্ত্রিক হাঙ্গেরী গঠনের জন্যে পেটোফি ও কোসুথের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হাঙ্গেরীর কাব্যের এবং উনিশ শতক শেষ হওয়ার মুখে এন্দ্রেঅদির নেতৃত্বে হাঙ্গেরীয় মনন পুষ্পিত হয়েছিল মাতৃভাষায় নানা শিল্পরূপের মাধ্যমে। হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের এই বৈচিত্র্য ও প্রসারের পূর্বে লুকাচ নিবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন ১৭ বছর বয়সেই। তাঁর প্রথম বই তিনি লিখেছিলেন হাঙ্গেরীয় ভাষায় নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে। এরপরে তিনি যত বড় বড় বই লেখার কাজ করেছেন— তা বস্তুতপক্ষে একই সঙ্গে দুটো ভাষায় করেছেন। একজন হাঙ্গেরীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী, কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবেই জার্মান ভাষায় তিনি লিখেছেন : প্রথমত, ধ্রুপদী জার্মান দর্শন এবং কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের মূল বই নিয়ে কাজ করার সময়। দ্বিতীয়ত, জার্মানীতে ফ্যাসিবাদী অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে জার্মান সাথীদের বক্তব্যের সঙ্গে সংযোজনার উদ্দেশ্যে। তৃতীয়ত, পূর্ব-দক্ষিণ ইওরোপে প্রচলিত জার্মান ভাষায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথীদের মার্কসীয় লেনিনীয় বক্তব্যের সূত্রে একত্রিত রাখতে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীর যারা চরম শত্রু, তারা সাধারণত লুকাচকে জার্মান ভাষার লেখক হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করে এসেছে তাঁকে বিপ্লবী হাঙ্গেরী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা তুরীয় অবস্থান দিয়ে তাঁর বিপ্লবী হাঙ্গেরী সংযোগ ও কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে। লুকাচকে একজন নিছক ধ্রুপদী জ্ঞানী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীর বাইরে স্থাপন করে তাঁর জীবনব্যাপী কাজের মধ্যে থেকে তথাকথিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে নিংড়ে বার করে নিয়ে বুর্জোয়া বিমূর্ততার শরিক করতে চেয়েছে পুঁজিবাদের স্তাবকেরা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রী হাঙ্গেরীর শত্রুরা খুশিমতো ব্যাখ্যা ও সম্পাদনায় মুড়ে লুকাচের কয়েকটি বইও প্রকাশ করেছে একই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী থেকে লুকাচকে ছিঁড়ে আলাদা করা অসম্ভব।

লুকাচ হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টিবর ডেরির (Tibor Dery) ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পের উপর একটি নিবন্ধ লিখে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি কাগজে পাঠিয়ে ছিলেন। এই নিবন্ধটিতে টিবর ডেরিকে লুকাচ একজন মহৎ সত্যার্থী লেখক হিসেবে উপস্থিত করেছেন, যিনি হাঙ্গেরীর প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব এবং গণপঞ্চায়েতী রাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরে ফ্যাসিবাদী আমলে প্রতিরোধের পতাকা বহন করেছিলেন। এই একান্তভাবে হাঙ্গেরীর মুক্তিসংগ্রামের লেখককে লুকাচ গর্বের সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং মানুষের শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। লুকাচের এই নিবন্ধটিতে হাঙ্গেরীর ফ্যাসিবাদী আমলের দুঃসহ দিনগুলি এবং সেই সময়ে হাঙ্গেরীর মাটিতে পা রেখে একজন সমসাথী লেখকের উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখার সাধনা সামনে এসেছে লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলমর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই। এই মূলমর্ম হচ্ছে বুর্জোয়া অবক্ষয় ও একাকী মানুষের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মানুষের সঙ্গে ছন্দিত ব্যক্তি মানব-মানবীর মানবীয় সারসত্তাগত উদ্বোধন ও উজ্জীবন এবং বৈপ্লবিক সক্রিয়তা। বিমূর্ত স্বপ্নের অবকাশ না রেখে বাস্তবভিত্তিক স্বপ্নচারিতা।

১৯৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে টিবর ডেরির মৃত্যু হয়েছে। টিবর ডেরি ছিলেন লুকাচের প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু। মেজাজের দিক থেকে দুজনেই বেশি রকম স্বাধীনচেতা। জন্মদিনের অভিনন্দনে তাই কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লুকাচ টিবর ডেরি সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন আগেও। পঞ্চাশের দশকে 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ শিল্পীদের নাম করতে গিয়ে লুকাচ তাঁদের মধ্যে হাঙ্গেরীর টিবর ডেবির নাম করেছিলেন।

হাঙ্গেরীর মাটিতে লুকাচ যে শক্ত করে পা রেখেছিলেন এবং হাঙ্গেরীর বিপ্লব নিয়ে তিনি আজীবন ভেবেছেন, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েতের ধাঁচে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর।

১৯৬৯ সাল লুকাচকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ "কমরেড লুকাচ, আপনি হাঙ্গেরীয় গণপঞ্চায়েতী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সময় একজন জনগণের কমিশনার ছিলেন। সেই সুবাদে আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, এই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক নীতির স্থায়ী মূল্য আপনার বিবেচনায় কি কি ?"

লুকাচ জবাবে বলেছিলেন, "আমি এ তর্ক করব না যে, গণপঞ্চায়েতী প্রজাতন্ত্র সংস্কৃতির ব্যাপারে সত্যিকার সঙ্গতিপূর্ণ মার্কসীয় নির্দেশনার জন্যে সঠিক তত্ত্ব ও সঠিক প্রয়োগের অধিকারী ছিল। আমি ইতিপূর্বে উপক্রমণিকাতে বলেছি যে, আমাদের তাত্ত্বিক স্তর সত্যিই খুব নীচু ছিল। তবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে ছিল একটা গণতান্ত্রিক প্রবণতা। এই সময়কার হাঙ্গেরীর সংস্কৃতিতে প্রগতিবাদী ধারাগুলির উপর এই প্রবণতা আস্থা স্থাপন করেছিল। এই প্রবণতা মর্মে মর্মে সমাজতন্ত্রী ছিল। আমার দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে সেই মূল্য যাকে আমাদের সম্মান করা এবং অব্যাহত রাখা উচিত।"

লুকাচের এই জবাবের মধ্যে '৬৯ সালে হাঙ্গেরীর বিপ্লবের অব্যাহত ধারাকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চিন্তার সূত্রে গেঁথে। মাতৃভূমি হাঙ্গেরী হচ্ছে লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র এখানেও।

১৯৬৭ সালে 'সহ-অবস্থান' সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীদেরই কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লুকাচ হাঙ্গেরীর কর্তব্যের আঁচ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহ-অবস্থান একটা শ্রেণীসংগ্রাম, তবে এর রূপ হচ্ছে ভিন্ন। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষ যাতে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করে সে-জন্যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির শ্রমিক ও কৃষকদের উৎসর্গিত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে অর্থপূণ জীবন ফলিয়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র এভাবেই কানাগলিতে আবদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবীদের মুক্তির পথ দেখাতে পারি। আমাদের কাছে তারা এইটেই চাইছে। আমি মনে করি, এই ব্যাপারটা শিল্পকলা ও দর্শনের যাবতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটা সামনে আসবে। পরশুদিন না হলেও, আগামী পাঁচ বছর কিংবা দশ বছর পরে আসবে।

আমাদের সেই মুহূর্তের জন্যে তৈরী হতে হবে যখন একেবারে বদলে যাওয়া পৃথিবীতে একেবারে পরিবর্তিত অবস্থাতে আমরা কার্যকরীভাবে মার্কসবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারব। মার্কসবাদ হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব যা সামাজিক স্ববিরোধিতা থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় জানে।"

উপরোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে যে, সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী লুকাচকে তার সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সংস্কৃতি এবং মননের সংরক্ষক বলে চিহ্নত করেছে, দিয়েছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। তাঁর সমস্ত মতামত অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্রী হাঙ্গেরীর মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাধীনচেতা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক লুকাচের বক্তব্যে বিতর্কমূলক বহু কৌণিকতা থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব এই বক্তব্যকে শুধু যে নিজ দেশে প্রচার করছেন তা নয় বাইরেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত হল এই যে, ১৯৭৭ সালে হাঙ্গেরীর গণতান্ত্রিক মহাজাগরণের অন্যতম পথিকৃত কবি এন্দ্রে অদির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীর সরকার, পার্টি এবং লেখক-লেখিকা সংঘ লুকাচের ১৯৬৭ সালের লেখা প্রচার করেছেন। এতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

১. "এলুয়ার ও মায়াকভস্কির মতো অদি বিশ্বকবি হতে পারেন না। কারণ তিনি একান্ত হাঙ্গেরীয় প্রসঙ্গ ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাছাড়াও হাঙ্গেরী একটি ক্ষুদ্র জাতি। তার কি সারা বিশ্বকে জোগাবার মতো সম্ভার থাকতে পারে? উপরন্তু কবিতা জিনিসটারই অনুবাদ হয় না। সুতরাং ভাষান্তরে কী পাওয়া যাবে অদির কবিতা.ত?"

২. "যে বিরাট সংকট ইওরোপকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেতর টেনে নামিয়ে ছিল, তা বহুবিধ পাতালচারী স্রোতের খাত বেয়ে উচ্চকন্ঠ হয়েছিল কমবেশি সচেতনতা নিয়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বের সমগ্র সাহিত্যে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, আদি ব্যাপারটাতে সাড়া দিয়েছিলেন সকলের আগে এবং এই সাড়া ছিল সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাকে এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে কন্ঠস্বর দিয়েছিলেন অদি সবার উপরে। এ কারণেই অদি বর্তমান যুগের মহৎ গীতিকবি, মানবীয় এবং কাব্যিক উভয় দিক দিয়েই। আমার অভিমত এভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি জাত্যাভিমানী বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে ভীত নই।"

৩. "এটিলা জোসেফ তাঁর একটি কবিতা লিখেছেন অদির উদ্দেশে, জয়গান করেছেন অদির বিপ্লবী সত্তার।"

এখানে আন্তর্জাতিকতাবাদী লুকাচের মেজাজ, শৈলী এবং সৌন্দর্যের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে হাঙ্গেরীর বিপ্লবের সঙ্গে সূক্ষ্মতম তন্তুতে গ্রথিত হয়ে।

৩

লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের দ্বিতীয় কাজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের পর থেকে এর অবক্ষয় ও পতন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুত্থানের পরের বছরগুলিতে উপন্যাসের গতিপরিণতির নিরীক্ষা।

প্রধানত তিনটি গ্রন্থ থেকে এই নিরীক্ষার পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা বেরিয়ে আসে। এই গ্রন্থ তিনটি হচ্ছে ঃ 'উপন্যাসের তত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এবং 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য।' প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। দ্বিতীয়টি ১৯৩৭ সালে এবং তৃতীয়টি ১৯৫৭ সালে।

'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য পাওয়া যাবে ঃ

১. উপন্যাস-বিচারে বিশ্বজিজ্ঞাসা ও মানবজীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আঠারো ও উনিশ শতকের ধ্রুপদী দার্শনিক সূত্রের প্রয়োগ।

২. একালের মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাসের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা।

৩. গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক এবং দান্তে ও শেকসপীয়রের কাজের পরে উপন্যাস কিভাবে ও কেন অগ্রসর হতে পেরেছে একটা স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে।

৪. উপন্যাস ঐতিহাসিক ভাঙ্গা-গড়া-ভাঙ্গার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

৫. উপন্যাস দেবতার রোষ ও করুণার ঘের থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা মানবমানবীর সার্বভৌমত্ব এবং তার বিপন্নতা ও আনন্দবোধ (দুইই)।

৬. উপন্যাসের প্রথম শিল্পী সার্ভেন্টিস এবং শেষ শিল্পী টলস্টয়। মাঝখানে বালজাক ও গ্যেটে।

৭. উনিশ শতকের ফ্লবেয়ারের L'education sentimental উপন্যাসের তত্ত্বে ও কৃতিত্বে পরশপাথর। বিশেষ করে 'সময়' নামক উপাদানের গুরুত্ব।

৮. আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ও মৃত্যুর অভিমুখে মানব-সমাজ। সুতরাং নৈরাশ্যের যবনিকা।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্হে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রয়েছে ঃ

১. উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়নের পতনের সময় ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব।

১৮১৫ সালে ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভারলি' উপন্যাসের প্রকাশ।

ঐতিহাসিক সাহিত্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের পার্থক্য।

ছদ্ম-ঐতিহাসিক কল্পকথা ও রোমান্টিক বা কল্পনাবিলাসী উপন্যাসকে সরিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের নায়ক রাজারাজড়া নয়, অন্যান্যেরা। এই নতুন উপন্যাসের জন্ম ফরাসী বিপ্লবে।

২. উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অবক্ষয়ের সূচনা। বিশ শতকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

৩. ফ্যাসিবাদবিরোধী পিপল্‌স্ ফ্রন্টের বিপ্লবী ঐতিহাসিক উপন্যাসও সমাজতান্ত্রিক উপন্যাসের সমান গুরুত্বের অধিকারী।

দৃষ্টান্ত ঃ জার্মেন ঔপন্যাসিক হাইনরিখ মান (১৮৭১-১৯৫০), লিয়ন ফয়েকত্‌ভাঙ্গের (১৮৮৪-১৯৫৮)।

৪. রোমাঁ রলাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কোলা দ্য ব্রিউগঁ; বেলজিয়ামের ডি কস্টারের উপন্যাস 'অয়েলেনস্পিগেল'; ইতালির এলেসান্দ্রো মানঝনির (১৭৮৪-১৮৭৩) একটি মাত্র উপন্যাস 'বাগদত্তা'। এবং লিও টলস্টয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্যেটে।

৫. ফরাসী বিপ্লব যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল, তেমনি বিশ শতকের উপন্যাসের উদ্দীপনার উৎস হচ্ছে একটা নতুন গণতন্ত্রের উষা।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাশে রয়েছে 'বিপ্লবী গণতন্ত্র'। স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্যে এই বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রকাশ।

৬. চীন, ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি সংগ্রাম মানব-সমাজের মুক্তির ঐতিহাসিক মহাস্রোতে এসে মিশছে প্রাচ্যের মায়াবাদী কুহককে কাটিয়ে। সাহিত্যে এর প্রতিফলন কাম্য এবং সেটা ঘটছে প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের মধ্য দিয়ে।

৭. উপন্যাসের শিল্পরূপের কাঠামো সম্পর্কে বক্তব্য 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থের অনুরূপ। অর্থাৎ মহাকাব্য ও নাটক এবং উপন্যাসের পার্থক্য এবং ঐক্য একটা দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ার বিকাশ।

৮. টমাস মান ও গোর্কি।

আমাদের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য।'

এই গ্রন্থে তিনটি নিবন্ধ রয়েছে ঃ

১. আধুনিকতাবাদের মতাদর্শ জেমস জয়েস ও টমাস মান।
২. ফ্রান্‌জ্‌ কাফকা অথবা টমাস মান।
৩. বিচারক বাস্তবতাবাদ ও সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ।

এই গ্রন্থে লুকাচের মূল তাগিদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ ও বিচারক বাস্তবতাবাদের সহযোগিতা এবং আধুনিকতাবাদের অবক্ষয়ীতাকে পরিহার করা।

উপরোক্ত মূল তাগিদের সঙ্গে সঙ্গেই লুকাচ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাকে কল্পনা-বিলাস থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোন ধরনের বৃহৎ ব্যক্তির মোহ থেকে মুক্ত করার জন্যে ডাক দিয়েছেন।

লুকাচ প্রুস্ত, আন্দ্রে জিদ এবং জয়েসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাফকাকেও। অবশ্য এদের প্রত্যেকের শৈলীকে জানিয়েছেন শ্রদ্ধা। লুকাচের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এইসব শিল্পীর গুণগুলিকে উড়িয়ে না দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে বলেন যে, প্রুস্ত কিংবা আন্দ্রে জিদ এবং জয়েস কিংবা কাফকার অবক্ষয়ী ভক্তেরা হাজার চেষ্টা করেও এইসব শিল্পীর গুণ-গানে লুকাচকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

লুকাচ 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য'তে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবাদী অবক্ষয়ী সূত্রগুলিকে তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এই গ্রন্থেই টমাস মানকে উপস্থাপিত করা হয়েছে বিচারক বাস্তবতাবাদের প্রতিভূ হিসেবে। টমাস মানকে লুকাচ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদের সহযোগী করেছেন বিশ শতকে। যে বাস্তবতাবাদের গুণগত উত্তরণের দুটি স্তরকে ইতিপূর্বে 'উপন্যাসের তত্ত্ব' এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে দেখতে পাওয়া গেছে, তাদের সম্মিলক ছিলেন জার্মেন কবি ও ঔপন্যাসিক গ্যেটে। 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদ' গ্রন্থে টমাস মান হচ্ছেন সম্মিলক।

লুকাচ অবশ্য খুব সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদই স্থায়ী। বিচারক বাস্তবতাবাদ অস্থায়ী। অস্থায়ী হলেও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ঐতিহাসিক স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন। বুর্জোয়াদের যে অংশ পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের দরুণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প অগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, তাদের হাত নিজেদের হাতে তুলে নেবে শ্রমিক-শ্রেণী। বিচারক বাস্তবতাবাদ বা ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ও বিদ্রোহী বুর্জোয়াদের অবদান।

লুকাচের উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের রচনাকাল ও রচনার পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এদের ঐক্যকে চেষ্টা করে খুঁজতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু পাঁচশ বছরের উপন্যাসের মূল উপাদানগুলির কোথায় উত্তরণ ঘটেছে সেটা দেখাবার জন্যে লুকাচ সহজ পদ্ধতি নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থে টলস্টয়ের নিরীক্ষা দিয়ে শেষ করেছেন। যেসব উপকরণ ও গুণের জন্যে উপন্যাস মহাকাব্য ও ধ্রুপদী নাটক থেকে পৃথক, সেগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার টলস্টয়। লুকাচ এই টলস্টয়কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের মূলাধারে স্থাপন করেছেন রোমাঁ রলাঁকে এবং গোর্কিকে তাঁর পাশাপাশি রেখে। এনেছেন টমাস মানকেও। 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে টমাস মানকে রলাঁ ও গোর্কির সঙ্গে এনেছেন মনুষ্যত্বের শতদলের শত শত বছর ধরে দুটি একটি করে পাপড়ি খোলার প্রক্রিয়ার ঘোষক হিসেবে।

মনুষ্যত্বের সারসত্তাকে মানবসমাজের দীর্ঘ যাত্রাপথে শিল্পরূপের আধারে স্থাপন করে যুগের পর যুগোত্তীর্ণ করে এসেছেন যে মহান কথাশিল্পীরা, লুকাচ তাঁদের মূল কাজটিকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, যেমনি তাঁদের শৈলী ও সাধনাকে সামনে এনেছেন।

লুকাচ এই দীর্ঘকালের বিশাল মানবযাত্রার পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নত থেকে উন্নততর হওয়া অব্যাহত ধারাকে সামগ্রিকভাবে দেখাতে গিয়ে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী পূর্বসূরীদের সহযোগী রাখতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট

সমাজ গড়ার স্তরেও। এই জন্যে তাঁকে ভুল বুঝবার একটা অবকাশ হয়তো রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মহলে।

লুকাচ যে এই সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনিবার্য প্রাধান্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বারংবার এবং তিনি যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তাঁর প্রথম লেখা বই থেকেই, এই সত্যকে সামনে রাখলে উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝি দূর করা যাবে।

মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা মৌল বক্তব্য উপন্যাস সম্পর্কিত লুকাচের গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই মৌল বক্তব্য হচ্ছে, খণ্ড খণ্ড করে সৌন্দর্য বিচার নয়, সামগ্রিক গতিধারা ও মূল গতিমুখই বিচার্য হওয়া উচিত।

এই সামগ্রিকতার দরুণ মাঝে মাঝে অপাত্রে মালা দেওয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা ও বিড়ম্বনার সমাধান করে দেয় এই পাত্ররাই। তারা নিজেরাই ঠিকরে বেরিয়ে যায়। তারা প্রমাণ করে দেয় তারা মেকি। সলঝেনিৎসিনের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। লুকাচ সলঝেনিৎসিনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের একজন নতুন কারিগর হিসেবে। এটা ছিল গতানুগতিকতা ভাঙ্গার জন্যে লুকাচের তাগিদের অভিব্যক্তি। সলঝেনিৎসিন নিজেই সমাজতন্ত্রের বিশাল প্রবাহের বাইরে নিজেকে নিয়ে প্রস্থান করায় এবং নিজের প্রকৃত চেহারাটা প্রকাশ করায় লুকাচের দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

লুকাচের কাছ থেকে আমরা এই নিশানা পেয়েছি যে, সামগ্রিক ধারাকে নিয়ে অগ্রসর হলে শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যত লোক বাইরে যাবে তার চেয়ে ভিতরে আসবে অনেক বেশী।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে শ্রেণীসংগ্রামের বিন্যাস ও গতিমুখ নির্ধারণে লুকাচ বরাবরই কঠোরপন্থী। এক সময়ে তিনি উগ্র বামপন্থী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এমনকি লেনিনও তাঁকে এই জন্যে তিরস্কার করেছিলেন। এই ঝাঁজটা তাঁর বহু লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সহযাত্রীদের কাউকে পাশ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার তিনি বিরোধী। বিভিন্ন ও বিচিত্র মেজাজের সহযাত্রী চান তিনি। শিল্পরূপ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে এই স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কাছে অপরিহার্য।

স্টালিন সম্পর্কে যেসব বক্তব্য তাঁর 'তরুণ হেগেল' থেকে শুরু করে 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য' গ্রন্থে দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে এসেছে, সেগুলি একত্র করলে সেখানে লুকাচের সহযাত্রীদের প্রতি মনোভাবটি পরিষ্কার বেরিয়ে আসে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, লুকাচ এক সময়ে স্টালিনপন্থী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্টালিনকে ঘিরে ব্যক্তিস্তুতি যেহেতু বিশেষ করে সোভিয়েত

সাহিত্যে একটা গতানুগতিকতা ও আত্মতুষ্টি এনেছিল, সেজন্যে শেষ পর্যন্ত স্টালিনের বিরোধিতা করেন তিনি। 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য' গ্রন্থে এই বিরোধিতা প্রকট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইগ্রন্থেই লুকাচ বলেছেন, স্টালিনকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি এই বিরোধিতা করছেন না। স্টালিনের যে মর্যাদা প্রাপ্য, তাকে নির্দিষ্ট করার জন্যেই এই বিরোধিতা।

বিপ্লবটাই মূল বিবেচ্য। মার্কস ও লেনিন যেভাবে বিপ্লবের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটাকে তিনি কম্পাসের কাঁটার মতো সামনে রেখেছেন।

৪

হেগেল, গ্যেটে, বালজাক এবং দান্তেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদেও ধরে রাখতে চেয়েছেন বলে লুকাচের বাইরের পরিচয়টা অনেকটা এরকম যে, তিনি প্রধানত হেগেল ও গ্যেটের সৌন্দর্যতত্ত্বেরই ধারক।

লুকাচ তাঁর এই অনুরাগকে কখনও লুকোন নি। বরং ফলাও করে বলেছেন। হেগেল ফরাসী বিপ্লবকে ছেড়ে যখন জার্মান রাজতন্ত্রের প্রবক্তা হলেন, তখন হেগেল ম্লান হয়ে গেলেন তাঁর কছে। কিন্তু হেগেলের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বাত্মকতা লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মস্ত বড় উপাদান হয়েছে। ইতিহাস হেগেলকে ফেলে দেবে কি করে?

প্রকৃতপক্ষে কার্ল মার্কস তো হেগেলকে ফেলে দেন নি। বিশেষ করে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

লুকাচ মার্কসবাদী বলেই হেগেলবাদী। বিশেষ করে মার্কসের 'ইকনমিক এণ্ড ফিলসফিক ম্যানাসক্রিপ্টস' গ্রন্থ লুকাচের কাছে গণবিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্বের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো। মার্কসের ২৬ বছর বয়সের এই লেখায় হেগেলের বেশ কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহৃত। লুকাচের ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, মার্কসপন্থী হিসেবে তিনি হেগেলের পরিভাষা ব্যবহারের ছাড়পত্র অবাধভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

লুকাচ যে নীতিনিষ্ঠ মার্কসপন্থী, তার একটা প্রমাণ কার্ল মার্কসের উপরোক্ত 'ম্যানাসক্রিপ্টস' থেকে মানবনীতির সূত্র তুলে নিয়ে লুকাচ তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব' গ্রন্থের মর্মভূমি রচনা করেছেন।

১৯৭৩ সালে গোল্যাণ্ডের অধ্যাপিকা মারিয়া জানিয়ান লুকাচের ওপর যে প্রশস্তি লেখেন তাতে তিনি ভাবলৌকিকতাবাদের প্রতি লুকাচের বাস্তবতাবাদী বিরাগকে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপিকা জানিয়ান বলেছেন, "যে শিল্পকলা নিজের জগৎ নিজেই তৈরি করে, লুকাচের কাছে তার পরিচয় হচ্ছে এই যে তা

‘এন্‌থ্রপমরফিক’ বা নরত্বের আরোপমূলক। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ‘সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব’ গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে নরত্বের আরোপ তত্ত্বের বক্তব্যকে প্রসারিত করে লুকাচ একটা বড় রকমের কাজ করেছেন। বহু বছর আগে মার্কস এইসব সমস্যারদিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেও লুকাচের মতো এত বিস্তারিতভাবে কেউ এর নিরীক্ষা করেন নি। লুকাচ এইসব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।” মনুষ্যত্বের সারসত্তাকে অগণিত মানবমানবীর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে লুকাচ নরনারী বা মানবমানবী নির্বিশেষে মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশের মার্কসীয় নির্দেশনাকে নির্দেশক করেছেন।

লুকাচ যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্যক্তিমানবমানবীর বিকাশে সমবেত স্ফূর্তি ও সম্মতির জন্যে তাগিদ দিয়েছেন, সেটা তিনি করেছেন মার্কসবাদী হিসেবে।

লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের একজন পুরোগামীর ভূমিকা পালন করে এসেছেন বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশের দশকে ‘সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য’ লিখতে গিয়ে তিনি এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তা নয়।

বস্তুতপক্ষে তিরিশের দশকে গোর্কির সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং তা মস্কো থেকে প্রকাশিত ‘ইন্টার ন্যাশনাল লিটারেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটেনের নাট্যপ্রযোজক জোসেফ ম্যাকলিওড তাঁর ‘নতুন সোভিয়েত থিয়েটার’ গ্রন্থে ১৯৪৩ সালে লুকাচের এই সূত্রটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন গোর্কির বক্তব্যের পাশাপাশি।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লুকাচ বলেছিলেন, “বাস্তবতার অবিকল নকলনবিশী এবং মনোময়তা দুইই বস্তুগত ঐতিহাসিক বিকাশের বিরোধিতা করে।”

লুকাচ পঞ্চাশের দশকে একই কথা বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হচ্ছে নয়া ইতিহাস সৃষ্টির এবং মুক্ত মানবমানবীর স্বচ্ছন্দ সামাজিক বিন্যাসের যাদুদণ্ড।

শলোকভ ঃ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শতাব্দীর কমিউনিস্ট রূপকার

বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েত ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোকভের প্রায় গোটা শতাব্দীব্যাপী জীবন ও তাঁর অমর সাধনা ও সৃষ্টির মূল্যায়নের লক্ষ্যে আমরা এখানে বিশেষ করে তাঁর দুটি উপন্যাস, শিল্প-রূপচিন্তা ও ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিবেদন করছি।

১

প্রথমেই যদি আমরা ব্যক্তিটির এবং তাঁর পরিবেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো তিনি ব্যক্তি হিসাবেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য এই ইতিহাস গণ-ইতিহাস এবং এর নারী ও পুরুষেরা সাধারণ লোক হিসেবেই ঐতিহাসিক কীর্তির অধিকারী। অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন ঘটলো, তখন শলোকভের বয়স মাত্র বারো। রুশভাষী কসাকভূমির সন্তান। ডন নদীর দুই তীর বরাবর বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা জুড়ে কসাক কৃষিজীবীদের বসতি। এই গ্রামীণ জীবনের শিকড় সমেত কৈশোরেই শলোকভ বেছে নিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষকে। বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত এলাকায় থাকার দরুণ এবং স্বভাবসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার হিসেবে কসাক পুরুষেরা জারের আমলের সেনাবাহিনীর সৈনিক নিয়োজিত হবার দরুণ গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রয়াস থেকে দূরে অবস্থান করতো। যদিও পুগাচেভের মতো কসাকের নেতৃত্বে কসাক ও অন্যান্য রুশ চাষীরা বারবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়েছে. তবু কসাক সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গতে পারেনি। অক্‌টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই প্রথম এই অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন ফেরত কসাক সৈনিক-বেশী কৃষকদের একটা অংশ বিপ্লবে ও গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে যোগ দেয়। শলোকভ এদের একজন সৈনিক হিসেবে লড়েছিলেন এবং গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্র জয়ী হবার পরে কসাকভূমিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। এইসব কিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ২০ বছর বয়সে শলোকভ কয়েকটি ছোটগল্প লিখে যশস্বী হয়ে ওঠেন। এর পরেই তাঁর ২৩

বছর বয়সে লেখা 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সালের ঘটনাবলীতে জড়িত প্রধানত কসাকদের দিয়ে যে কাহিনী তিনি লেখেন, তাঁর প্রাণবন্ত চিত্রাবলী শলোকভের কল্পনাশক্তির সূক্ষ্মতা ও বিপুলতার পরিচয়ই মূখ্যত বহন করে। কারণ, এই সময়ে তিনি নিতান্তই বালক এবং কসাকভূমিকে চোখে দেখলেও ইউরোপের রণাঙ্গন দেখেন নি। কিন্তু এই কল্পনারও সহায়ক ছিল তাঁর পরবর্তীকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতারই কল্পনা-মিশ্রিত প্রক্ষেপণ ঘটিয়েছিলেন তিনি প্রথম খণ্ডে। 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের পরবর্তী তিন খণ্ডে অবশ্য এই-ভাবে প্রক্ষেপণ ঘটাতে হয়নি। তবে কল্পনা ছাড়া উপন্যাস হয় না। সুতরাং কল্পনাকে আরও শক্তি-প্রত্যয়ের উপর দাঁড় করিয়েছেন তিনি পরবর্তী তিনটি খণ্ডে। ১৯১৭-২২-এর ঘটনা লেখবার সময়ে তিনি কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি এই বয়সেই বিপ্লবের টানা-পোড়েনে এবং গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কসাকভূমির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে শরিক হয়েছেন। কসাকভূমিকে ছাড়েননি, লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর বৈপ্লবিক অবস্থানকে প্রচণ্ড মূল্য দিলেও তিনি ডন নদীর কোল-ঘেঁষা তাঁর গ্রাম ভিশেন্স্কায়াকে ছেড়ে কোথাও যাননি। দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের পুরোপুরিটাই এই ভিশেনস্কায়াকে বারংবার ছুঁয়ে রয়েছে। একটা সমস্যা ছিল কোন ঘটনাকে সরিয়ে রেখে কোন ঘটনা নিয়ে লিখবেন।

১৯৩০ সালে যখন সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতেই যৌথ কৃষি খামারের প্রবর্তন ঘটলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়, তখন শলোকভ তাঁর নিজ গ্রামে ও গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামারের একজন সংগঠক। তখনও 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড লেখা হয়নি। শলোকভ লেখা শুরু করলেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল'। যৌথ কৃষি খামার গড়ার কাহিনী। এখানে কসাক-ভূমিতে শ্রেণী সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায়টির কথা লেখা হলো। নিজস্ব জমি, গাভী ও বলদের গোয়াল, ঘোড়ার আশ্রয় এবং ফসলের ভাঁড়ার ও হাঁস-মুর্গী-ছাগল পালনের জন্য কৃষিজীবী নরনারীর যে-ক্ষুধাকে মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভূমি বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে—ব্যক্তিগত কৃষিকে যৌথ কৃষি প্রচেষ্টায় উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা করলো, তার টানা-পোড়েনের পরিপূর্ণ দ্বন্দ্বাত্মক মানবীয় রূপটি শলোকভের উপন্যাসে ফুটে উঠলো। এই উপন্যাসে লেনিনগ্রাদ থেকে আগত শ্রমিক-স্বেচ্ছাসেবক ও সংগঠক দেভিদভকে

দিয়ে শলোকভ পোড়ো জমিতে চার বলদচালিত লাঙ্গলের চাষ করিয়ে ছাড়লেন। জমিতে লাঙ্গল দেয়া, বীজবোনা, ক্ষেত নিড়ানো এবং ফসলকাটার ব্যাপারগুলো ছিল শলোকভের ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার আয়ত্তাধীন। ১৯৩২ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

এর পরেই তিনি নানা কাজের মধ্যে 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড রচনায় মন দিলেন। ১৯৩৪ সালে গোর্কির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে সোভিয়েত লেখক-লেখিকারা সর্বসম্মতভাবে তাঁদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর একটা বিশেষ দিক কলকারখানা, খনি ও খেতখামারে কর্মীদের নিয়ে গঠিত যে বিপুল পাঠক-পাঠিকা সমাজ শিল্পকলা ও সাহিত্যের ব্যাপারে বেশী বেশী করে আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন, তাদের সঙ্গে লেখক-লেখিকাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন। শলোকভ এ ব্যাপারে আগে থেকেই সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। সোভিয়েত লেখক-লেখিকা সংঘের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। বিভিন্ন কলকারখানা ও কৃষি খামারের স্থানীয় পাঠচক্রে তিনি তাঁর লেখা পড়ে মতামত নিতেন। প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখকলেখিকাদের বইয়ের উপর আলোচনা করার জন্যও তাঁর ডাক পড়তো দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যেমন একজন সত্যসন্ধ লেখক হিসেবে, তেমনি কমিউনিস্ট হিসেবেও, এই ডাকে সাড়া দেওয়াটা তাঁর কাছে ছিল অপরিহার্য কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে, তিনি আমরণ কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য ছিলেন। তাঁর মধ্যে কমিউনিস্ট ও লেখক একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র অষ্টাদশ কংগ্রেসে সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করতে গিয়ে তিনি যে-বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে এই একীকরণ গভীর স্বচ্ছন্দ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। এই স্বাচ্ছন্দ্য যে জোরালো ছিল, তা বুঝতে পারা যায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড আদ্যোপান্ত পড়লে। জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাঁর কাছে ডন নদীর জলধারার মতো, যাতে তিনি নৌকা বাইতে ভালবাসতেন এবং অবাধে সাঁতরাতেন। এই স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই ঘটেছে। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে স্টালিনের নির্দেশ মানা নিয়ে যে দ্বন্দ্বাত্মক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, সেটা একজন কমিউনিস্ট হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয় ও স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দরুণই সম্ভব হয়েছে।

শলোকভ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড যখন সম্পূর্ণ করেছেন, তখন হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাণ্ডু-

লিপি অসমাপ্ত রেখে শলোকভ মাতৃভূমিকে রক্ষায় যুদ্ধের সৈনিক-লেখক হিসেবে রণাঙ্গনে চলে যান। এই রণাঙ্গনেই তিনি শুরু করলেন তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'এঁরা মাতৃভূমির মুক্তিযোদ্ধা।' এই সঙ্গেই তিনি লিখলেন, নাৎসী বাহিনীর হাতে বন্দী সোভিয়েত সৈনিক ও গণবন্দীদের উপর নৃশংস নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা ও সেখানে অবস্থানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রোজনামচা। সেই রোজনামচা প্রতিদিন সোভিয়েত জনগণের মনে দুর্বার দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা এবং নাৎসীদের বিরুদ্ধে নিদারুণ ও তীব্র ঘৃণার বাড়বানল জ্বালাবার কাজে লাগলো। যুদ্ধের অবসানের পরে তিনি শেষ করলেন তাঁর তৃতীয় উপন্যাস এবং আরও পরে দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। যুদ্ধের সময় গ্রামের বাড়িতে নাৎসীদের বোমা পড়ায় দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই বই তাঁকে নতুন করে লিখতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ডন নদীর তীরের নিজ গ্রামে এবং এলাকা জুড়ে যুদ্ধের ধ্বংসকে অপসারিত করে পুনর্নির্মাণের যে কাজ শুরু হয়ে যায়, তাতে তিনি হাতে-কলমে শরিক হয়েছেন। তাঁর গ্রামীণ এলাকা থেকেই তিনি নির্বাচিত হলেন সর্বোচ্চ সোভিয়েত প্রতিনিধিসভার সদস্য।

শলোকভ চরিত্রের বাইরের এবং অন্তরঙ্গ দিকের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁর নিজের গ্রামে স্বদেশের ও বিদেশের প্রখ্যাত ও অনামী অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন একান্ত গ্রামীণ সারল্য ও আন্তরিকতার মধ্যে সম্পন্ন করায়। ব্যক্তি ও পরিবেশের ব্যাপারে এখানে আর বিস্তারিত না গিয়ে সোভিয়েত উপন্যাসেরই অন্যতম পুরোধা কনস্তান্তিন ফেদিন শলোকভের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছেন, সেটি হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ

"একথা যদি সত্য হয় যে, শিল্পীর নিজের জীবনের ধারাই জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা-আহরণের প্রধান প্রবাহ এবং আমিও একথাটাকে সত্য বলে জানি, তাহলে বলতে হবে, শলোকভের জীবনের ধারা রুশ সমাজ বিপ্লবের গভীরতম ও দুর্দান্ততম স্রোতধারা গুলিরই একটি। কসাকভূমিতে ছাড়া আর কোথায় এত বেশি ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে? কসাকদের প্রাচীন জীবনযাপনের ধারা বিশাল প্রস্তরীভূত তীরভূমির মতো যেকোন তরঙ্গরাশির আঘাতকে ঠেকিয়ে আসছিল। তবু শেষ পর্যন্ত নবজীবনের ধারা তার ওপর আছড়ে পড়ে তাকে পরাভূত করলো।"

শলোকভ কসাকভূমির সন্তান হিসেবেই এই রূপান্তরের মহাকাব্যিক আলেখ্যকে স্বদেশে ও সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নব রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

২

শলোকভের ব্যক্তিত্ব ও পরিবারগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে তাঁর দুটি উপন্যাস 'ধীরে বয়ে চলে ডন' এবং 'পোড়োজমি উথাল-পাথাল' সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেয়া হয়েছে। এই আভাস অবশ্য নিতান্তই আভাস। কারণ, এই দুটি উপন্যাসেই শলোকভ নিজের তো নয়ই, কোনরূপ বিশেষ ছাঁচ থেকে মুক্ত মোটামুটি প্রায় এক ডজন করে নরনারীর প্রেম ও ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত জীবনের ধারা বর্ণনা করেছেন। দুটি উপন্যাসেরই উপসংহার বিয়োগাত্মক। দুটি উপন্যাসেরই শেষে 'সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো'র কোন অবকাশই রাখা হয়নি। ১৯৪০ সালে শলোকভ 'ধীরে বয়ে চলে ডন' শেষ করেছেন, তখন ১৯২২ সালের সমস্ত তিক্ততার স্মৃতি মুছে যাওয়ার কথা। কিন্তু তখনও লিখতে বসে, ডন নদীর কোণে তাতারস্কি গ্রামে যা ঘটেছিল, সেটাই শলোকভ লিখলেন। পঞ্চাশের দশকে বসে শলোকভ 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করলেন। প্রতিপক্ষ পরাজিত হলো ঠিক 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠার মতো। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরাজিত হবার আগে ডন অববাহিকায় গ্রেচিয়ান লগ গ্রামের যৌথ খামার গঠনের দুই নায়ককে হত্যা করে রেখে গেলো। এই রকমই ঘটেছিল বলে শলোকভকে এই ঘটনাই লিখতে হয়েছে।

প্রধানত কসাক নরনারীদের নিয়েই দুটি উপন্যাস। রূপান্তরের দুটি পর্যায়। প্রথম উপন্যাসের কেন্দ্র তাতারস্কি গ্রাম। ঘটনাধারা এর নরনারীকে যেখানে টেনে নিয়ে যাক না কেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইওরোপের সীমান্ত হোক, বিপ্লবের নগরী পেত্রোগ্রাদ হোক, অথবা দূরদূরান্তের অথবা গৃহযুদ্ধের হাতবদলের শহর, বন্দর, গ্রাম হোক, তাতারস্কি গ্রামের কৃষিজীবী নরনারীর একান্ত ঘরোয়া জীবনে ফিরে এসেছে কাহিনীর সূত্র। এই তাতারস্কি গ্রামে পাশাপাশি দুটি বাড়ির দুটি পরিবারের, বিশেষ করে দুটি চরিত্র গ্রেগর মেলিকভ ও আকসিনিয়া স্তেপানভা বিবাহবন্ধনের বাইরে প্রেমকে অনুসরণ করতে গিয়ে, দুটি পরিবারের সকলের মধ্যে যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে, তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ঘটলো, গ্রেগরীর সঙ্গে গৃহযুদ্ধের বাইরে কোথাও পালাতে গিয়ে ঘোড়ার উপরেই বসে-থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীর গুলিতে আকসিনিয়ার মৃত্যু। এরই পাশাপাশি গ্রেগরীর স্ত্রী নাতালিয়া একান্তভাবে স্বামীর ফিরে আসার আশায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গর্ভস্থ গ্রেগরীর সন্তানকে ধাই দিয়ে নষ্ট করিয়ে করুণ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লো। এই ত্রয়ীর আকর্ষণ বিকর্ষণে কোন রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সমস্যা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাও যে আবর্তের সৃষ্টি করেনি তা নয়। গ্রেগরীর বোন দুনিয়া বলশেভিক পার্টিতে এবং লালফৌজে যোগদানকারী মিখাইল কোশেভয়কে ভালবাসতো। গ্রেগরী যখন সাংঘাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী হয়ে পড়ে অক্টোবর

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে শরিক হয়েও কসাকভূমির দোটানার মধ্যে পড়ে যেদিকে বেশি সংখ্যক কসাক গিয়েছিল সেদিকেই ঝুঁকলো, তখন স্বভাবতই মিখাইল হয়ে দাঁড়াল তার শত্রু। যে গ্রেগরী আকসিনিয়ার প্রেমে পড়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ভুলেছিল, সে-ই দুনিয়ার ওপর ফরমান জারী করে বসলো সে যেন মিখাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। দুনিয়া তার কথা মানে নি। মেলিকভ পরিবারের মা ও বাবার মৃত্যুর পরে এবং বড় ভাই ও ভ্রাতৃবধূরও মৃত্যুর পরে দুনিয়াই মেলিকভ পরিবারের ঘর-দুয়ার আগলেছে। সকলের স্নেহের পাত্রী এই ছোট বোনটি যৌবনে পা দিয়ে গ্রেগরীর কথা মানে নি। গ্রেগরীর প্রচণ্ড শাসানির মুখে সে বলেছে, হৃদয় হচ্ছে সবার উপরে। সে অবশ্য রাজনীতির কথা বলে নি। মিখাইল বলেছে। দুনিয়া নাতালিয়ার রেখে-যাওয়া যমজ ছেলে আর মেয়েকে আগলেছে। এবং এর মধ্যেই গীর্জায় গিয়ে মিখাইলকে বিয়ে করেছে। একেবারে শেষে যখন ১৯২২'এর মে দিবসের পূর্বাহ্ণে গ্রেগরী তাতারস্কি গ্রামে ফিরে এসেছে আকসিনিয়াকে হারাবার পরে এক বছর বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, তখনও দেখা যায় লালফৌজের পরিপূর্ণ জয়ের পরেও মিখাইল দুনিয়ার কাছে ফিরে আসতে পারেনি নানা কাজে আটকে থাকায়। দেখা গেল নাতালিয়ার যমজ সন্তানদের মধ্যে মেয়ে পনিয়া ডিপথিরিয়ায় মারা গিয়েছে ছেলেটি রয়েছে দুনিয়ার কাছে। ছেলেটি বুঝলো উজাড় হয়ে যাওয়া লোকটাই তার বাবা গ্রেগরী। এই পর্যন্ত।

সুবৃহৎ উপন্যাস 'ধীরে বয়ে চলে ডন'-এর হয়তো নেহাত একপেশে একটা ছক হয়ে গেলো উপরোক্ত মর্মকথাটি। তবু একটা ধারণা দেবার জন্যেই একটা ছক থাকা দরকার। বস্তুতপক্ষে এক ডজন নরনারী ছাড়াও আরও প্রায় শ'খানেক চরিত্র এসেছে উপন্যাসের পরিধিতে। কেউ বিপ্লবের পক্ষে, কেউ বিপ্লবের বিরুদ্ধে। উপরন্তু শলোকভের রীতি হলো এই যে, যে চরিত্রই আসুক না কেন, তার উপর আলো ফেলবেনই। এই জন্যে বিশাল ও ব্যাপক ক্ষেত্রে দশ বছরের ঘটনার সূত্রে বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যেককে নিয়ে একটা অন্তত গল্প আছে। কোন চরিত্রকে কাগজ-কাটা মূর্তি হিসেবে শলোকভ পেশ করতে নারাজ। এখানে পিছন দিকে তাকাবার অবকাশ খুব কমই রয়েছে—সমুদ্রের দিকে ধাবমান ডন নদীর জলস্রোতের মতো সম্মুখপ্রবাহী ঘটনাবলীর দরুণ। তবু রেল শ্রমিক স্টকম্যান মিস্তিরির কাজে তাতারস্কি গ্রামে বাসা নিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগুনের কণা। সামান্য সময়ই থাকতে পেয়েছিল সে এই গ্রামে। তবু বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছিল সে বিপ্লবের, মিখাইল যাকে শেষ পর্যন্ত লালন করলো। স্টকম্যান সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের পরে ফিরে এসেছিল। সে

প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিহত হলো। এইরকম আরেকটি চরিত্র বুনচুক। গ্রামের বাইরের। তাকেও মরতে হলো। তার প্রণয়িনী আনা রণক্ষেত্রে মরলো। মৃত্যু মানে শেষ নয়। একটা মানুষ কোথায় গেল তার হদিশ। তবু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাদের নিয়ে কাহিনী, তাদের ওপর বরাবর আলো ফেলতে হয়েছে। গ্রেগরী মেলিকভ এদিক দিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের নব রূপান্তরের ধারাকে চিহ্নিত করার জন্য এই চরিত্র নির্বাচন। নব রূপান্তরের ব্যাপারটা কঠিন, সময় সাপেক্ষ, আয়াসসাধ্য। এটা বোঝাবার জন্যই যেন শলোকভ গ্রেগরীকে নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই নায়ক খানিকটা তৃতীয় পক্ষ ধরনের—কোথাও যে মিশ খাচ্ছে না। গ্রেগরী শেষ পর্যন্ত নিজের গ্রামে ফিরে এলো, যেখানে অবশেষে সমাজতন্ত্রের শক্তি জয়ী হয়েছে। কিন্তু তখনও তাকে অনির্দিষ্ট রাখলেন শলোকভ, এই রকমটা ঘটেছিল বলেই। তিনি অনেক দেখেছিলেন। মানুষকে বদলাবার জন্যে আরও প্রয়াসের, ব্যাপক মৌল সাধনার দরকার রয়েছে, এটাই বুঝিয়ে দিলেন। নিজেও বুঝেছিলেন এটা।

এই সত্যটাকেই শলোকভ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে আরেকভাবে নিয়ে এলেন। সেখানে ঘটনা ও কর্মকাণ্ড আলাদা। সম্পূর্ণ নির্মাণমূলক। কামানের গর্জন থেমে গেছে। তবে এখানেও দেখা গেলো, যৌথ কৃষি খামার গড়ে তুলে যখন গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো, তখন শুধু যে গা ঢাকা দেয়া জারতন্ত্রী ও বুর্জোয়ারাই বাধা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে আঘাত হানার জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছে তাই নয়, সাধারণ কৃষিজীবী নরনারীদের মনেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। লেনিনগ্রাদ থেকে ২৫০০০ কারখানা-শ্রমিক যেমন গ্রামে গ্রামে এসে বসেছে গ্রাম্য সোভিয়েত পঞ্চায়েত ও পার্টিকে সাহায্য করতে, তেমনি অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধের আমলের জারতন্ত্রী সেনানীরা।

লড়াইটা অবশ্য গৃহযুদ্ধের আমলের মতো বহুদূর ব্যাপী নয়। তবু শত্রু অবহেলার পাত্র নয়। কারণ, সাধারণ কৃষিজীবী.দর মধ্যে তখনও যৌথ খামারে মিলে যাওয়া নিয়ে দ্বিধা। যেটা অবশ্য সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩০ সালে ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে, সাধারণ কৃষিজীবীদের মন জয় করতে পেরেছিল কমিউনিস্টরা। এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল অনেক ধৈর্য, অনেক বিতর্ক, অনেক আলোচনা, প্রত্যক্ষ কাজ, উৎকৃষ্ট ফল, নতুনতম জীবনের আবহাওয়া দ্বারা। যারা সংগঠক তাদের মধ্যেই বিভিন্ন মেজাজের মানুষ ছিল, বিভিন্ন শিকড়ের মানুষ। এসমস্ত কথাগুলো বিবেচনা করলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়, সেটা হলো 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসে যবনিকা পড়েছে, কিন্তু লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

শলোকভের এই 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাস্থল অন্য, পাত্রপাত্রী নায়িকাও অন্য। এখানেও একটি ছোট গ্রামকে ঘিরেই প্রধানত কসাক বাসিন্দাদের কাহিনী লিখেছেন শলোকভ। সেই একই পদ্ধতি। ছোট পরিসরের মধ্যে সাধারণ নরনারীর পূর্ণাঙ্গ চরিত্র চিত্রন।

'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' (ইংরেজী উপন্যাসের নাম 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্') উপন্যাসের গ্রামের নাম গ্রাচিয়ানিলগ। ডনের অববাহিকার কিছুটা ভিতরের দিকে তৃণভূমি-বেষ্টিত। 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসেও গ্রামটি আছে। গৃহযুদ্ধের সময়ে একটি ঘটনার কথাও আছে। একটি পরিবারের সামান্য আভাস আছে। কিন্তু নতুন উপন্যাসে যখন শলোকভ এই ছায়াঢাকা গ্রামটিকে নিয়ে এসেছেন, তখন এর রূপ আলাদা। বেশ কয়েকটি পরিবারের অনেকগুলি নরনারী। এদের ত্রিমাত্রিক চিত্রাবলী। সামান্য ও অসামান্য এরা। সবাই কৃষিজীবী, গ্রামীণ। তবু এদের কাহিনী বলার জন্যেই দু'বছরের মধ্যে শলোকভ প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডটি লিখলেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত এই বহু প্রতীক্ষিত উপন্যাসটি শেষ হলো শুধুমাত্র গ্রামের পাশে একটি বড় পতিত জমিতে লাঙ্গল দিয়ে যৌথ খামার গড়ার প্রস্তুতি পর্ব দিয়ে।

এখানেই শলোকভের উপন্যাসের একটা দিক সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। শলোকভ গ্রামের কথা বলার সময় স্বভাবতই কৃষিজীবী কসাক পরিবারের নারীদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন তাদের উদগ্র ও সমগ্র রূপে। গ্রামীণ জীবনে ক্ষেতে-খামারে ও বহু কর্মে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই নারীরা। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এদের। স্বামীরা এই সেদিন পর্যন্ত পেশাদারী সৈনিক হিসেবে ঘোড়া নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রবাসে যাওয়ায়, নারীরা গার্হস্থ্য-জীবন সবসময় সবক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারে নি। এই কারণেই দেখা যায়, 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসে একাধিক স্বৈরিণী, যারা রূপচর্চা ও পরিধেয় নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য গৃহস্থালীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যেই এই আচার-আচরণ। মক্ষিরাণীর জায়গা নেই এখানে। গ্রেগরীর প্রণয়িনী পরস্ত্রী আকসিনিয়া এইরকম নারী, যে নিজের রূপ সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে সচেতন। 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসেও নারীর এই ছবি। সমাজতন্ত্রের তো সবেমাত্র শুরু। সুতরাং, এই উপন্যাসেও লুশকার মতো মেয়ে বিপ্লবী মুক্তি-যোদ্ধা মাকর নগলুনভের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে, লেনিনগ্রাদ থেকে আগত দেভিদভকে রূপে ভোলায় এবং ভোলাতে সক্ষম হয়। সৃষ্টি হয় দুই সাথীর মধ্যে একটা ভেদরেখা। দুটো মেজাজ দুই খাতে বয়ে চলে। যে নগলুনভ বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সংগ্রামে

সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গ্রামে বসে ইংরেজী পড়ে, সে প্রথম খণ্ডেই অদম্য সংগ্রামী হলেও ট্রাজিক বা দুঃখী। দ্বিতীয় খণ্ডে সে এবং দেভিদভ দুজনেই প্রতিবিপ্লবীদের গুলিতে মারা যায়।

অবশ্য দুটি উপন্যাসেই মায়েরা দুঃখিনী হলেও যেন গ্রানাইট পাথরে খোদিত প্রতিকৃতি। অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সংসার-ধারিণী। ধরিত্রীর মতো সহনশীলা। ১৯৩০ সালেও এদের অনেকে জানে না, শুধু জগতে নয়, গ্রামের মধ্যেও কি ঘটছে। তবে এরা প্রত্যেকেই চরিত্রের দিক দিয়ে পৃথক। এদের নিয়েও শলোকভ লিখেছেন ছোট ছোট কাহিনী। ছোট হলেও এরা মাঝে মাঝে গ্রীক ট্রাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই উভয়বিধ নারীর মাঝখানে শলোকভ নতুন সমাজের নারীদেরও দুয়েকটা ছবি এঁকেছেন।

শলোকভের দুটি উপন্যাসেরই একটা দিক দিয়ে বড় রকমের মিল রয়েছে। এই দিকটি হচ্ছে শ লাকভের নিসর্গ প্রেম। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযুক্তি। মানুষ ও প্রকৃতির অবিভাজ্যতা যেন মানুষের অবচেতনায় অধিষ্ঠিত। ডন নদীর একটা বৈশিষ্ট্যই যে শুধু এর কোলের বাসিন্দাদের প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যে জড়িয়ে রেখেছে তাই নয়। তৃণভূমিতেও ষড় ঋতুর আবর্তন, বরফে আবৃত প্রান্তর এবং বরফ থেকে মুক্ত বসন্ত মায়ার অঞ্জন পরিয়ে রেখেছে তৃণভূমির বাসিন্দাদের চোখে। অবশ্য শলোকভ তাঁর দুটি উপন্যাসেই প্রকৃতিকে এইভাবে সামনে রাখেন নি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর একটি বড় অভিযোগ এই যে, কামানের গোলা মানুষ ও বৃক্ষরাজিকে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করে। তৃতীয় উপন্যাসে তিনি এই মর্মন্তুদ চিত্রটিকে বারবার সামনে এনেছেন।

'ধীরে বয়ে চলে ডন' এবং 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' এর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, প্রথম উপন্যাসে প্রাচীন কসাক গানের ছড়াছড়ি দিয়ে এর রক্ত ও অশ্রুকে একটা উদাসীনতার আবরণ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাসে গান নেই, কিন্তু কৌতুকের ছড়াছড়ি। এতে এক বৃদ্ধ উপন্যাসের কোন কোন অংশের তেল-নুন লাকড়ির আলাপকে নিত্যরসে ভিজিয়ে রেখেছেন।

৩

শলোকভের ব্যক্তিজীবনের ধারা ও পরিবেশ এবং তাঁর দুটি উপন্যাসের উপরোক্ত পরিচিতি তাঁর শিল্পরূপ-চিন্তার পরিচায়ক। তবু আলাদা করে কিছু বলা দরকার। একজন সচেতন কমিউনিস্ট শিল্পী হিসেবে তাঁর চিন্তাকে তিনি পার্টি কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে জানিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষেও তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির কথা

বলেছেন। এমনি একটি উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত সাহিত্যের দুটি ধারাতেই তিনি লিখেছেন। এই দুটি ধারা হচ্ছে সময় নিয়ে লেখা এবং তাৎক্ষণিক লেখা। তবে এদের মধ্যে প্রথম ধারাটিতে তিনি তাঁর বড় বড় কাজগুলি করেছেন। এই প্রসঙ্গেই অন্যান্য উপলক্ষেও তাঁর বক্তব্য এই যে, 'নিঠুর গরজী যে সবুর বিহনে ফুল ফোটাতে ও বাস ছোটাতে চায়' সেটা লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকা কারুরই কাম্য নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি লেখক-লেখিকাদের ঔদাসীন্যের নিন্দা করেছেন। আত্মম্ভরিতা ও আলস্য এক্ষেত্রে তাঁর মতে গর্হিত।

শলোকভের শিল্পরূপ চিন্তার কয়েক ধারা নিম্নরূপ ঃ

১. "কারখানার শ্রমিকেরা কিংবা ক্ষেত-খামারের চাষীরা যেমন নিম্নমানের জিনিসপত্র কিংবা ফসল তৈরি করলে তার চাহিদা থাকে না, তেমনি লেখক-লেখিকারা নিম্নমানের দায়সারা বই লিখলে তার চাহিদা থাকতে পারে না। অর্থাৎ যেকোনো অবস্থাতেই লেখার মানকে অবশ্যই উন্নত রাখতে হবে।"

২. "অসহিষ্ণুতা কিংবা চটজলদি লেখার বিপদ হচ্ছে এই যে কোন ঘটনা এতে খণ্ডিতভাবে বর্ণিত হয়। এটা বসন্তের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। লেখা হলো হয়তো শুধুমাত্র কুঁড়ি কিংবা ফুল দেখে, কিন্তু লেখা যখন প্রকাশ পেল, তখন বসন্তপাঠক-পাঠিকাকে ফলও উপহার দিয়ে বসেছে।"

৩. "উপন্যাস রচনার সঙ্গে সৌধ নির্মাণের তুলনা করা যায়। তবে সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে যেখানে নির্মাতার কাজ চুলচেরাভাবে নির্ধারিত করে দেয়া যায়, সেখানে লেখক ও লেখিকার উপর দায়িত্ব পড়ে নিজের উপর ভরসা করে অগ্রসর হওয়ার। তাকেই সৌধ নির্মাণের মালমশলা জোগাড় করে নিতে হয়। সে-ই প্রধান স্থপতি, সে-ই মজুর-মিস্তিরি, সে-ই প্রকৌশলী। আর লেখার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত এমন কাণ্ড ঘটে যে, প্রধান স্থপতিকে পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হয়, রাজমিস্তিরি যা কিছু খাড়া করেছে তাকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়তে হয়। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায়, এমন কাজে কোন শেষের সীমারেখা টানা যায় কি?"

৪. "বিলেতের কোন কোন পত্রিকায় আমার 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসে নিষ্ঠুরতার ছবির আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। এই অভিযোগ মেনে নিয়ে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, যে লেখক সত্যের উপর পর্দা চাপা দেবার জন্য ঘটনাবলী মনোরম করে সাজায় এবং যার লক্ষ্য থাকে পাঠকপাঠিকার মনে যেন আঘাত না লাগে, আমি তাকে লেখক মনে করি না। দ্বিতীয়ত আমি

বলতে চাই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যদি গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য হস্তক্ষেপ না করতো, তাহলে এত রক্ত ও অশ্রু পাত হতো না।"

৫. "প্রত্যেকটি জাতির, সে ছোট হোক আর বড় হোক, নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকে। মানুষের আত্মিক সম্পদ এই আত্মিক মূল্যবোধগুলির উপরে বিন্যস্ত হয়।"

৬, "আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য ও চিরায়ত সাহিত্য যেমন বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত হবে, তেমনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক ও চিরায়ত সাহিত্যকে আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। সাহিত্যের কাজ হবে জনগণকে এমন জীবন-যাপনে সাহায্য করা, যাতে মানুষের জয়জয়কার হয়।"

৭. "প্রত্যেকটি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার মাতৃভাষা।"

৮. "জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর কোথাও সাহিত্যের মতো দ্বন্দ্বমূলক গতিবাদ এত প্রচণ্ডভাবে কাজ করে না।"

৯. "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অভিনবত্ব এই যে, এই বাস্তবতায় এমন একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় যে দৃষ্টিভঙ্গি জনগণকে মানবজাতির প্রগতির জন্য প্রয়াস চালাতে আমন্ত্রণ জানায়, জনগণকে কোটি কোটি মানুষের কাম্য ও লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে, এই প্রয়াসের পথকে আলোকিত করে।"

১০. "আমার একটি বক্তব্য এই যে, চাষীর মতো লেখক-লেখিকারও কোন বছর ভাল যায়, কোন বছর মন্দ যায়। কোন বছর ফসল ভাল ফলে, কোন বছর খারাপ। কোন বছর খরা আসে, কখনও বা আসে ঝড়তুফান। কখনও পোকার দৌরাত্ম্য ঘটে।"

১১. "জনগণের জন্য লিখতে পারাটাই হচ্ছে একটা বড় রকমের সম্মান।"

১২. "সাহিত্য নিত্য নতুন। এখানে যৌবনের চির জয়জয়কার।"

শলোকভের উপরোক্ত চিন্তাধারা যেমন সোভিয়েত সাহিত্যের, তেমনি বিশ্বের সর্বত্র যেখানে মানুষ শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র গড়ছে এবং এইজন্য লড়ছে, সেখানে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে, জোগাবে। রালফ ফক্স্ তাঁর 'উপন্যাস ও জনগণ' গ্রন্থে তিরিশের দশকে লিখেছিলেন, যে স্বাধীনতার আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের ধারায় উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবি শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই স্বাধীনতার আদর্শ বৃহত্তর পটভূমিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় শলোকভের মতো প্রাণবন্ত কথাশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে। আজ পঞ্চাশ বছর পরে প্রয়াত শলোকভকে সম্বোধন করে আমরা বলতে চাই, শলোকভ গোগোল-পুশকিন-দস্তয়েভস্কি-তলস্তয়-চেকভ-তুর্গেনিভ্-গোর্কির চিরায়ত ও আধুনিক সৃজনী ধারায় নব নবীনের বার্তাকে স্থাপন করতে পেরেছেন। জয় চিরনবীনের জয়।

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

দু'টি দর্শন আজ বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করছে। এরা কমবেশি সাধারণ পাঠকপাঠিকাকেও টানছে। একটি মার্কসবাদ আরেকটি অস্তিত্ববাদ। একটি দর্শন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক মানবমুক্তি সংগ্রামের দায়িত্ববোধের সঙ্গে মুক্তিপ্রয়াসী মানুষের একাত্ত হওয়ার দরুণ ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাওয়ার দর্শন—মার্কসবাদ। আরেকটি দর্শন বিদ্রোহী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির একক দায়িত্ববোধের এবং সকল প্রচেষ্টার পথরোধকারী অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কালো দরজা পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালনের দর্শন—অস্তিত্ববাদ। এই দ্বিতীয়ের আবার দুটি উপধারা। একটি সর্বধ্বংসী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মীয় সংঘজীবনে মাথা গুঁজে থাকা। দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের গণসমাবেশে শরিক হয়ে থাকা। ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ অস্তিত্ববাদী শিল্পী দার্শনিক জ্যঁা পল সার্ত্রে অস্তিত্ববাদের দ্বিতীয় ধারার বাহক হয়ে মার্কসবাদে উপনীত হলেও এবং স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি-আত্মাকে মার্কসবাদের সামগ্রিক সত্যের উপাদান হিসাবে সপ্রমাণ করার দাবী করলেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর মত বদলেছেন কিনা তা এখনও জানা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব-সূরীদের খুব বেশিদিন সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী নন তিনি। কোন মহৎ শিল্পীরও মৃত্যুর পরে সার্ত্রে তাকে বড়জোর এক পুরুষ পর পর্যন্ত সজীব সাথী বলে মানতে রাজী আছেন। যাঁরা জ্যঁা পল সার্ত্রের 'সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রভাবিত তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহকেও খুব বেশিদিন বরদাশ্‌ত করবেন বলে মনে হয় না। অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই 'বাসি ফুলের মালা' হয়ে গিয়েছেন সম্ভবত; মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে জীর্ণ করে ফেলেছে এই দৃষ্টিতে।

কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে সজীব ও সচল বলেই মনে করবো। মার্কসবাদে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা আছে। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে চায়, মানবসমাজের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠি-গত সৃজনশীলতা অতীতের আবরণ ভেদ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলি রসায়িত ও জারিত হয়ে মৃত্যুকে সবসময় ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন বিপ্লবী প্রতিভার মৃত্যু নেই। মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথের নিশানা। মুক্তিসংগ্রামীর গলায় যে জয়ের মালা দোলে, তা কোনদিন

বাসি হতে পারে না। কারণ, মুক্তিসংগ্রামী সে মালা দিয়ে যায় তার উত্তরপুরুষের গলায়। অব্যাহত জীবনস্রোতের মোকাবেলায় এখানেই মৃত্যুকেই মনে করা যেতে পারে অর্থহীন। অমরতার এই দর্শনকে সামনে রেখে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্ব বিচার করতে বসি, তাহলে তাঁকে নিয়ে নিরবধি কাল পর্যন্ত যেতে না পারলেও অনেকদূর যেতে পারব। তবে এক্ষেত্রেও দুটি দিক সামনে আসতে পারে।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাক এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা হিসাবে। এই প্রতিভা কিভাবে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে বাংলা ভাষাভাষীর সংগ্রামী জীবনের তথাকথিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ শরিকদের সঙ্গী হিসাবে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তরঙ্গধৌত বাংলাদেশের চলমান জীবনের কাজে ও কথায় সঞ্চারিত হয়ে রয়েছেন, সে কথা সব সময় আমাদের মনে না থাকতেও পারে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের হুকুম মতো যেমন এই সঞ্চারকে নাকচ করা সম্ভব নয়, অস্তিত্ববাদীর অধৈর্যেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাতিল বলে ঘোষিত হতে পারে না। যতদিন 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিগুলির নদীমাতৃক পরিবেশের পদ্মা আর গোরাই নদীর আশেপাশের প্রাকৃতিক জীবন অব্যাহত থাকবে, যতদিন কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ সজীব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের মানবজীবন প্রবাহ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ মনকে এবং সেই সঙ্গে সে মনের অধিকারী রক্তমাংসের মানবটিকেও নতুন ফুলের মালার মতো করে আঘ্রাণ নিতে চাইব, কারণ ভবিষ্যতে আমাদের জীবন-যাত্রার সাথী রক্তমাংসের মানুষের জীবনসত্তাকে আজকের থেকেও আরও বেশি গভীর করে জানতে চাইব। রবীন্দ্রনাথের সজীব অনুভূতিগুলি আমাদের সংগ্রামী জীবনসত্তার বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানে একীভূত হয়ে রয়েছে। আমরা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলেছি, রবীন্দ্রনাথের সজীব শিল্পীসত্তা বারবার সেকথা মনে করিয়ে দেবে! আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে প্রান্তর পার হতে গিয়ে তাঁকে পাশে পাবো। রবীন্দ্রনাথ বাসিফুলের মালা হবেন না একটি বিশেষ কারণে। সেটি এই যে, ব্যক্তিজীবনে, সে ব্যবহারিক হোক কিংবা শিল্পীসত্তার সৃজনলীলায় হোক, চিরজীবী হবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কোন 'আতুরতা' বা 'হ্যাংলামি' ছিল না। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসতেন অবশ্য। উপনিষদের মন্ত্রে শৈশবে লালিত হয়েও তিনি ধুলার ধরণীকে কিংবা এর মুটে মজুরকে মায়া কিংবা ছায়া মনে করতে শেখেননি। কিন্তু তবু সুন্দর ভুবনে মরতে না চাওয়ার মধ্যে কোন ক্লিন্নতা ছিল না। বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আসক্তিকে তিনি সকৌতুকে হাল্কা করে দিয়েছিলেন তাঁর '১৪০০ সাল' কবিতায়। জীবনের মধ্যাহ্নে 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে আসক্তি প্রকাশ

পেয়েছিল, তাকে তিনি জীবনসায়াহ্নে 'পৃথিবী' কবিতায় নির্মমভাবে পরিহার করেছিলেন। এই পৃথিবীকে অযথা তাঁর নামযশে ভারাক্রান্ত করার অহমিকাকে তিনি মনে স্থান দেননি। এই কারণেই আমরা ভবিষ্যতেও তাঁকে স্থান দিতে পারবো নিরুদ্বিগ্নচিত্তে। আমাদের মন তাঁর স্মরণীয় উপস্থিতিতে উদ্বেলিত হবে, কণ্টকিত হবে না। স্বচ্ছন্দ এই মৃত্যুহীনতা।

রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক দূর যাবার ব্যাপারে দ্বিতীয় দিকটিকে এবার যাচাই করা যাক।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তির একটি বিশেষ অধ্যায়কে সামনে আনবো। এবং আমরা দেখব, এই কাব্যকীর্তি এমন সব নায়ক-নায়িকাকে বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করে গিয়েছে যারা মৃত্যুকে নাকচ করে জীবনের গান গাইতে থাকবে দূর ভবিষ্যতেও। দেখতে পাব, মৃত্যুর কালোছায়ার তলায় সংগ্রামী মানুষের জীবন অপঘাতের আবরণে আবৃত হয়েও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বিপ্লবীর মৃত্যুতে নিষিক্ত হয়ে বিস্তৃততর জীবনে উত্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক রঞ্জন এবং 'মুক্তধারা' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক অভিজিত অপঘাতে নিহত হলেও চিরজীবী প্রকৃতির মতো মানব মুক্তিসংগ্রামে চিরজীবী। এই দুই বীরের জন্য নাটকে কোন মায়াকান্না নেই। রঞ্জন আর অভিজিত আমাদের সাহিত্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বেঁচে থাকতে এসেছে। এই দুই গণবীর-চরিত রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

(১৯৬৮)

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা ঃ খাদে নিখাদে

১

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং চিন্তায় কাব্যে চারুশিল্পে সঙ্গীতে ও সাধারণভাবে সাহিত্যকর্মে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় অন্তর্বিরোধের প্রকাশ্য ও স্বগত অভিব্যক্তি এবং ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি। পর্যায় থেকে পর্যায়ে এবং একই পর্যায়ের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থান নেবার টানাপোড়েনে তিনি সব সময়েই আক্ষেপে আক্ষেপে আকর্ষিত। অস্থিরতা, অসন্তোষ, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও যন্ত্রণায় তাঁর জীবন ও সৃষ্টির প্রশান্তি ও তন্ময়তার বড় রকমের দিকটাও জর্জরিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় সৃষ্টিতে মাধুর্যেরও বাড়াবাড়ি রয়েছে বলে যখন যেটুকু রসদ কাম্য সেটুকুকে তুলে নেবারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের তিক্ততাকে ও হলাহলকে এবং জ্বালাময়ী শিখা ও রক্তাক্ত যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে স্নিগ্ধ ও মধুর রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া কঠিন নয়। তাঁর শুধুমাত্র প্রসন্ন রূপটিকে দেখাবার প্রামাণ্য ব্যাখ্যা রয়েছে ভুরি ভুরি। এদের উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। কিন্তু আমরা একে বলবো রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতসত্তার একদিক। আরেকদিক হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারা। প্রধান না হলেও সমকক্ষ।

একটা বিশেষ কারণে এই অন্তর্বিরোধের পরিক্রমা আমাদের কাছে একান্তভাবে কাম্য। বিশ্বব্যাপী যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বাত্মক বৈপ্লবিক গতিধারা নিয়ে একটা শতাব্দীকালের সকল দেশ ও মহাদেশের বহু জাতির বহু বর্ণের বহু ধর্মের সমাজ, জনগণ ও বহু ব্যক্তি আরেকটা শতাব্দী শুরু করতে যাচ্ছে, তাতে শতাব্দীকালের বিশেষ করে সেই শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে চলা দরকার হবে, যাঁরা বৈপ্লবিক দ্বন্দ্বাত্মকতাকে জীবনে বাস্তববাদী সাধনায় সৃষ্টিতে জ্বালানির মতো কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই রকমই একজন অপরিহার্য শিল্পী। আগামীতেও থাকছেন।

এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আমরা বর্তমান নিবন্ধে অন্তর্বিরোধের ধারাতে বিপরীত অবস্থান নেবার দুটো দৃষ্টান্তকে রবীন্দ্রপরিক্রমায় সামনে রাখছি। একটির অবস্থান খাদে, আরেকটির নিখাদে। একটির প্রক্ষেপণ কোমল, আরেকটির কঠোর।

২

প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়নের একটি ইংরেজী ভাষ্য 'গার্ডেনার' (মালঞ্চের মালাকর) গ্রন্থের প্রকাশনা। ইংরেজীতে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হবার এবং এই কাব্যকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতির পরে-পরেই রবীন্দ্রনাথের একটি বিকল্প ভাবমূর্তিকে কার্যত উপস্থাপিত করে 'গার্ডেনার' বইটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর ভূমিকা লিখেছেন।

বইটির প্রাথমিক কারণ ছিল বোধহয় 'গীতাঞ্জলি' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের তখনকার পঞ্চাশের বেশি বয়সের ৩০ বছরের লেখা কবিতার পরিচয় প্রদান। কিন্তু বাস্তবে যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতে বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সংসারযাত্রার প্রতিফলনের ছবিগুলি গীতাঞ্জলিতে অপ্রধান হয়ে কিংবা কিছু কিছু প্রতীকী ভাবনাতেই শুধু নিবদ্ধ ছিল, সেগুলি সোজাসুজি গার্ডেনারের মারফত সামনে এসেছিল। গীতাঞ্জলিতেও ঈশ্বরসত্তার পাশে পাশে মানবসত্তা গা ঘেঁষে রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরসত্তাই প্রবল ও প্রধান। গার্ডেনারে বিপরীতটাই ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে এখানে পরমেশ্বর অনুপস্থিত। সবার উপরে মানুষ সত্য, জগৎ সত্য।

বইটিকে দুষ্প্রাপ্য হয়তো বলা যাবে না। তবে সাধারণত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্য বিচারে পণ্ডিতদের মহলেও বইটি প্রায় উপেক্ষিত বলেই এর ঐতিহাসিকতা আমাদের চোখের সামনে নেই। এজন্য এর বিষয়সূচীসহ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাখিল করছি এখানে।

বইটির প্রথম সংস্করণের একটি কপি এক অধ্যাপক বন্ধুর মারফত কলকাতার একটি কলেজের গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সাতদিনের মধ্যেই ফেরত দিয়েছিলাম। সুতরাং কিছুটা স্মৃতি থেকেই কাব্যগ্রন্থটির পরিচয় দিচ্ছি।

বইটিতে ৫০টি কবিতা সংকলিত হয়। কবিতাগুলির নাম সংখ্যায়। যেসব বই থেকে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে, সেগুলি কড়ি ও কোমল, মানসী, উৎসর্গ, কল্পনা, চিত্রা, চৈতালি ও ক্ষণিকা। সংকলনের বহু পরিচিত কবিতাগুলি হচ্ছে 'খাঁচার পাখি ও বনের পাখি', 'কস্তুরী মৃগসম', 'মরণ হে মোর মরণ', 'যেমন আছ তেমনি এসো', 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা', 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর', 'দিদি'।

বইটির একটি দিক আমাদের বিস্মিত করতে পারে। সেটি এই যে, কবির প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে পরিণত জীবনের মুখ পর্যন্ত কাজের পরিচয় দেয়া হলেও বইটিতে কবির প্রথম যৌবনের একটি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে।

স্বভাবতই এতগুলি বই থেকে নির্বাচিত ৫০টি কবিতার মধ্যে সাতটি বইয়ের পর্যায়ক্রমিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় এদের ঐক্যসূত্রকে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের আনন্দ এবং 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের যন্ত্রণার মধ্যেকার

যে তীব্র তারতম্য রবীন্দ্রকাব্যকে নতুনতর উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার কোন রেশ বইটিতে পাওয়া যায় না। তবে গীতাঞ্জলির পাশে 'গার্ডেনার'কে স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বন্দ্বাত্মক ধারাকে বুঝবার কাজটিকে সহজ করে রেখে গিয়েছেন।

এই প্রায় উপেক্ষিত বইটি তার প্রকাশ-কালে গীতাঞ্জলির পাশে পাশেই যে সাড়া জাগিয়েছিল, তার উল্লেখ সমসাময়িককালের বইপত্রে খোঁজ করলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এর জোরালো আবেদনের দুটো সূত্র মাত্র আমাদের সামনে রয়েছে।

পাবলো নেরুদার ১৯২৪ সালে প্রকাশিত যে বইটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়কাল পরে নোবেল পুরস্কার পায় সেটি 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান।' এর কুড়ি নম্বর কবিতার মাথায় লেখা রয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩০নং কবিতা অবলম্বনে।' পাবলো নেরুদার বয়স তখন কুড়ি। তাঁর অনুভূতির কথাই আমরা জানতে পেরেছি। বিশ্লেষণের অবকাশই অবশ্য তখন ছিল না। আরেকটি সূত্র হচ্ছে, বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট সতেরো বছর বয়সে 'গার্ডেনার' পড়ে পুস্তক পরিচয় লিখেছিলেন জার্মানীর একটি পত্রিকায়। এই সমালোচনাটিতে ব্রেখ্‌ট আমাদের উপমহাদেশের একটা গভীর রহস্যের উপর থেকে পর্দা সরে যাবার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তববাদী বিপ্লবী মার্কসবাদী ব্রেখ্‌টের প্রস্তুতির কোন কথাবার্তা এতে পাইনি।

তবে 'গার্ডেনার' যে এই দুই কবিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি এই দুটো খবর থেকে। 'গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের বিপ্লবাত্মক আঁচটাকে শুধু আন্দাজ করতে পারি।

৩

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধের কড়ি বা নিখাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি স্বভাবতই গার্ডেনারের চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর সাংঘাতিক ধরনের দ্বন্দ্বাত্মকতা চাপা পড়ে গিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির নৈসর্গিকতার আবেষ্টনীতে। এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪৬নং পত্র।

শিলাইদহ থেকে ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে লেখা এই চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী পড়ার এবং সেইসঙ্গে রামমোহন ও বেদান্ত প্রণেতাদের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জানিয়েছেন। চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত রচয়িতাদের ও তাঁদের ব্যাখ্যাকারদের ঈশ্বর ও সৃষ্টিতত্ত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পড়ার আগেও বেদান্তের

সৃষ্টি সম্পর্কিত মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল তাঁর মনে। রামমোহনের বই পড়ে তাঁর সংশয় কাটেনি। তিনি সৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এই অবস্থান থেকে কোনক্রমেই নড়বেন না বলে জানিয়েছেন।

যে বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারাকে চিরন্তন হিসাবে বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বিমুগ্ধ থেকেছেন এবং অপরকে বিমুগ্ধ করতে চেয়েছেন, সেই চিন্তাধারাকে ৩৩ বছর বয়সে তিনি সৃষ্টিকে বড় করার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই খবরটাকে আমাদের নব নব প্রজন্মের দৃষ্টির সামনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টির ধারাকে ব্যক্তিগত ও মর্মগতভাবে বুঝে নেবার জন্য। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪৬নং পত্র তার ব্যতিক্রম নয়। এই পত্র রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈপ্লবিক অগ্রগতিধারার পদ্ধতির স্মারক।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'চিত্রা' কাব্যের কিংবা 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে জানিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'উপনিষদ' তাঁর চিন্তার একটি দিকমাত্র ; অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাহির সত্য এবং পরিবর্তনও বড় সত্য। কাব্যগ্রন্থের গোড়াতেই এইভাবে তত্ত্ব দাখিল করতে তিনি পিছপা হননি, ঠিক যেমন ছিন্নপত্রাবলীর মতো 'রম্যরচনা' লিখবার সময় তিনি দ্বিধা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈপরীত্যকে নিয়ে এগিয়ে চলার ধারাটিকে চাপা দেবার প্রয়াস অবশ্য চলে আসছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের তরফ থেকে। অথচ রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরিভাবে এবং নবনবভাবে আজ এবং আগামীকালে পাবার পথে বৈপরীত্যের বৈপ্লবিক উপাদানটি অপরিহার্য রয়েছে, থাকবে। এই মুক্তধারাকে মুক্ত রাখা নব প্রজন্মের দায়িত্ব। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি ধারার তত্ত্ব এই দায়িত্ব পালনে নান্দনিকভাবে এবং জীবনপথে সহায়ক হবে।

শরৎচন্দ্র—ঝড়ের খেয়া

১

বিশ শতকের বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে স্থাপন করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে। সারা বিশ শতক ধরেই দেশেদেশে যে ঝড়ের পর ঝড় চলেছে গোটা মানব সমাজ জুড়ে, তার সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পেরেছে তাঁর লেখা?

শরৎচন্দ্র বিশ শতকের প্রথম তিনদশকের লোক। তিনি ভাববাদী ও মাধুর্যের পন্থী হিসেবে পরিচিত বাস্তববাদীদের কাছে। তিনি বরাবর বাংলা উপন্যাসের ধ্রুপদী ধারার লেখক হওয়ায় কালাপাহাড়ী আধুনিকদের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল ধারা নিয়ে চলেছিলেন বলে সাধারণের ধারণা। সুতরাং সারা শতাব্দী জুড়ে লোকজীবনের প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার অস্থিরতা তাঁকে পেছনে ফেলে এসেছে বলে মনে করাটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো এই যে শরৎচন্দ্রকে ঝড়ের খেয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই ঝড়ের খেয়া শুধু বিশ শতকের প্রথম তিনদশকের মধ্যেই নয়, সারা শতাব্দীর।

২

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণ মানব-মানবীর জীবনের মাধুর্যের বহুলৌকিকতা ও বহু-মাত্রিকতার মধ্যে যে অস্থির অগ্রসরতা ও ভাঙ্গার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটি তাই বিশেষভাবে পরীক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা অর্চনার চিন্তার সূত্র ধরে আমরা সরাসরি মহাকাব্যিকতার প্রশ্নে প্রবেশ করতে পারি। অচলা তার স্বামীগৃহ ত্যাগ করে স্বামীর বন্ধু সুরেশের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল।

এই উপন্যাসটির একেবারে শেষের দিকে প্লেগে আক্রান্ত ও মৃত্যুশয্যাশায়ী সুরেশের বিছানার পাশে বসে অচলা ভাবছে ঃ

"তাহার চারিদিকে জনহীনপুরী মৃত্যুর মত নির্বাক হইয়া আছে। বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার কি প্রয়োজন ছিল ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘিরিয়া এত বড় একটা কদর্য সংগ্রাম চলিয়াছে সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল। দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত-হীনতা, সমস্ত স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে। তারপর সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগযুগ পড়িয়া রহিবে? ওখানে কি চিতার দাহচিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে? কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি এতবড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

বহুদিন পূর্বে অনেক যত্ন করিয়া যে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল আজ তাহারই শেষ সর্বনাশ যেন তাহার মনে ছায়াবাজির মত প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতেছে কত শত সহস্র চিতা জ্বলিতেছে, নির্বিতেছে, তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য একেবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।"

শরৎচন্দ্র এখানে যেভাবে মহাভারতের প্রসঙ্গটি এনেছেন, সেটি স্বতঃস্ফুর্ত নিশ্চয়। কিন্তু বিশের দশকের পূর্বাহ্নের সমসাময়িক জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটিতে মহাকাব্যিক মাত্রায় জীবনদর্শনকে তিনি এনেছেন সচেতন-ভাবেই, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে সাঝুলি গ্রামের প্লেগের মৃত্যুপুরী কয়েকটি মানব-মানবীর পরিণতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কম অর্থপূর্ণ নয়। এই অর্থপূর্ণতার ব্যাপারটা অবশ্যই প্রধানত একালের মানুষের সমস্যার বিন্যাসের মধ্য থেকে উৎসারিত। মহাভারতের সচেতনতা এবং গৃহদাহ উপন্যাসের সচেতনতাকে একই বাটখারায় ওজন করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে অচলার চিন্তা যে মহাভারতীয় পরিমাপের, সেটা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা ধারণা, তিনি প্রধানত গল্প বলিয়ে এবং তাঁর গল্পের নর-নারীদের নিতান্ত মামুলি আকর্ষণ-বিকর্ষণের অম্লমধুর অথবা করুণ অশ্রু সজল কাহিনীগুলোই সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করে। অর্থাৎ ধারণা এই যে, শরৎচন্দ্র জীবন ও জগতের গভীরে প্রবেশ করতে চাননি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই ধারণাটাই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অগভীর এবং ওপর ছোঁয়া। গৃহদাহ উপন্যাসের অচলার উপরোক্ত চিন্তা হচ্ছে প্রমাণ।

উপরন্তু এই গৃহদাহ উপন্যাসটি বিক্ষিপ্ত সৃষ্টি নয়। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'চরিত্রহীন' গৃহদাহের একদশক আগেই তৈরি করেছিল মহাকাব্যিক

পরিপ্রেক্ষিত। বিশ এবং তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সমসাময়িক গণজীবনের বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ থেকে উৎসারিত স্বাধীনতা ও জাতীয় এবং ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের বিশাল তড়িৎগামী ধারাগুলোকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এক সাথে শুরু করা দুইপর্বের পাঁচটি করে উপন্যাসে। বিশের দশকের পূর্বাহ্নে ও কয়েক বছরে তিনি মহাকাব্যিক পরিসর নিয়ে লিখেছিলেন গৃহদাহ উপন্যাসের পাশাপাশি 'শ্রীকান্ত' (২য় ও ৩য় পর্ব), 'পথের দাবী' আর 'দেনা পাওনা'। তিরিশের দশকের পূর্বাহ্নেও কয়েক বছরে তিনি লিখেছিলেন। 'বিপ্রদাস' 'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব), 'শেষের পরিচয়' এবং 'আগামী কাল'। শেষোক্ত দুটি উপন্যাস ছিল অসমাপ্ত। যে সমগ্র সত্য উন্মোচিত হচ্ছিল তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর বিভিন্ন ধরনের সীমালঙ্ঘী আত্মিক উত্থানের মধ্য দিয়ে, তাদের সবাইকে তিনি একটি কাহিনীর আধারে রাখতে পারেননি। তাদের নিয়ে আলাদা আলাদা কাহিনী রচনা করতে হয়েছে তাঁকে। রাজনীতি হোক, সমাজনীতি হোক, মনোলোক হোক সমস্ত বিষয়েই একই সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যাগুলির কিনারা করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যে বহুসংখ্যক নায়ক নায়িকার যৌথ এবং একক বক্তব্যকে একই মূল্যে প্রকাশ করা। পরিস্থিতির বহুত্বের দরুণ সাধারণ তাগিদের মধ্যেও যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধিতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটেছে, তাতে উপন্যাসের শিল্পরূপে পারিপাট্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে. পরিণতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, 'শেষের পরিচয়' এবং 'আগামীকাল' কমবেশি অসমাপ্তই রয়ে গেল এইজন্যে। এইজন্যে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা এবং গভীরভাবে সমস্তকিছুকে দেখবার প্রয়াসও দায়ী। তিনি কোন রকমের গোজামিল বা চমক দিতে চাননি। জটিল বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির মৌলিক কোন প্রশ্ন বা সমাধানকে এড়িয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নায়ক নায়িকাদের সাধারণ অবচেতন অনুভূতিগুলিকেও ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসের 'সারদা' চরিত্রটি 'সবিতার' মতোই মুখর, যদিও কাহিনীতে 'সবিতার' অবস্থান সূর্যের এবং 'সারদার' অবস্থান চাঁদের। বাংলা উপন্যাসের যে ধ্রুপদী বাস্তববাদী ধারণাকে আধুনিক বাস্তববাদে শরৎচন্দ্র পৌঁছে দিয়েছেন, তারও তাগিদ কাজ করেছে পরিপূর্ণ সত্যকথনে। পরিপূর্ণতার তাগিদ মেটাতে গিয়েই শরৎচন্দ্র একসঙ্গে অনেকগুলি উপন্যাসে হাত দিয়ে একেকটিতে একেকটা বিষয়কে চূড়ান্তে নিতে চেয়েছেন। কোথাও সময় করতে পেরেছেন পারিপাট্য আনতে, কোথাও সময় করতে পারেননি।

'আগামীকাল' উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ১৯৩৫-৩৬ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'আগামীকাল' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত

হচ্ছিল। কাহিনীটা হলো এই যে, অসহযোগ আন্দোলন সবেমাত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কল্যাণ-সংঘ-কর্মীদের নতুন ধরনের কাজ, চিন্তা ও সম্পর্ক এবং একই সঙ্গে প্রেম নিয়ে শরৎচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন প্রস্তাবনাটিকে। এখানে নায়িকা মনিমালা। তার রূপ নেই, যদিও বিদ্যা আর সাহস রয়েছে। বৃত্তটা এখনও মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের। তবে মনে হয়েছে দেশের নিচ-তলার মানুষের আসার পথ করে দিয়েছেন লেখক। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কিংবা 'চার অধ্যায়'-এর মতো ধারালো সংলাপ এসেছে একই সময়ের প্রচণ্ড তাগিদেই নিশ্চয়। 'আগামীকাল' জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তার পূর্বসূরী 'পথের দাবী' এবং সমসাময়িক 'বিপ্রদাস'কে ছাড়িয়ে যাবার একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের নামও লক্ষণীয়। স্বদেশীয়ানার ব্যাপার নিয়ে লেখা 'জাগরণ' উপন্যাসকে 'আগামীকাল' এর কাছে অত্যন্ত মামুলি মনে হয়। 'আগামীকাল' হয়তো তিরিশের দশকের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা'র মহাকাব্যিকতার ধারায় আরেকটা দিককে সামনে আনতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি বলে আক্ষেপ করার কোন অর্থ হয় না। 'আগামীকাল' তার খণ্ড মুকুরেই একালকে ধরেছে তার সম্ভাবনা সমেত। এখানে আমরা সম্ভাবনাকেই বড় করে দেখবো। এতে একই সঙ্গে আমরা এই উপন্যাসটিকে 'শেষ প্রশ্ন' কিংবা 'দেনা-পাওনার' সঙ্গে একত্রিত করে একালটাকে বুঝতে চেষ্টা করবো।

৩

শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু লেখা রয়েছে যেগুলি গীতিকাব্যিক নিঃসন্দেহে। ভাববাদের অবকাশ রয়েছে, এমন লেখা তিনি লিখেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বিরাজ বৌ', 'বিলাসী' এবং 'মন্দির' এর নাম করা যেতে পারে। এরা প্রত্যেকেই দুটি হৃদয়ের গদ্যসঙ্গীত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতোই এরা নিদারুণভাবে বিয়োগান্তক। বাংলার বৈষ্ণবকাব্য শরৎচন্দ্রের মনে গভীরভাবে কাজ করেছে জনমানসে এই কাব্যের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী প্রবাহের যুক্তিতে। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে 'কমললতাকে' তিনি এঁকেছেন মমতায় অভিষিক্ত করে। তিনি বলেছেন, "আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান ইত্যাদি।" শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির ঐশ্বর্যের একটা অংশ এই গীতি কাব্যিকতা। কিন্তু শরৎচন্দ্র একালের ব্যাপক গণ-অভ্যুদয়ের ধারাগুলিকে তাঁর লেখায় প্রতিফলিত করতে গিয়ে মহাকাব্যিক রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনাতে কিন্তু তাঁর গীতি-কাব্যিক উপন্যাস বা গল্পের ধারা প্রতিবন্ধকতা করেনি। এর কারণ 'বিরাজ

বৌ', 'আলো ও ছায়া' এবং 'মন্দির' এর মতো একান্তভাবে দুটি হৃদয়ের কাহিনী গুলিও ধ্রুপদী বাস্তবতার ছাঁচে ঢালা।

এই বাস্তবতার ছাঁচ তৈরি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে পরিশ্রমসাধ্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে এ ক্ষেত্রে মাধুর্য ও বিদ্রোহের সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করেছে।

'আলো ও ছায়া' গল্পটির আখ্যানটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বড়লোকের ছেলে, পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এম এ পাশ করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিল। সে বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়ে সেখানে বৈষ্ণবী কন্যা কিশোরী সুরমাকে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে 'কিনে' নিয়ে এসেছিল অর্থাৎ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল। কলকাতার বাসায় দুজনের নিভৃত সংসার। সুরমা বিধবা। অন্তর্বাধার দরুণ তারা স্বামী-স্ত্রী হতে পারল না। সুতরাং যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখতে বের হন।

এই মেয়ে দেখার ব্যাপারটা কল্লোল গোষ্ঠীর যে কোন ডাকসাইটে বাস্তববাদী লেখকের সঙ্গে যেন পাল্লা দেয়ার মত করে লেখা।

মেয়েটি মিত্তির মশাই এর রাধুনির মেয়ে। "যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরনে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপপড়া সুতাগুলি মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারী চুড়ি এবং একজোড়া পাক দেওয়া তামার মত রং এর সোনার বালা। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্যন্ত চিক চিক করিতেছে, ব্রহ্মতালুর উপর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে।"

এখানে মাধুর্য ও রূঢ়তার মিশ্রণের মধ্যে যে কথাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা গিয়াছে, সেটা সাধারণ সামান্যা নারীর রজনীগন্ধা রূপ। শরৎচন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য একটা সামাজিক বিস্ফোরণের ভিতরকার বারুদটাকে চিহ্নিত করা।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে জাতপাত ভেদ করে একেবারে সামান্য মেয়েদের দিয়েই যেভাবে উচ্চাঙ্গের দর্শনের বক্তব্য পর্যন্ত বলিয়েছেন. তাতে শরৎচন্দ্র বিশ শতকের বাংলার সবচেয়ে বড় বিদ্রোহীদের একজন হয়ে উঠেছেন।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসে নিচতলার কোন পুরুষকে পুরোপুরিভাবে মূল বক্তব্যের প্রবক্তা হিসেবে সামনে না আনলেও অসংখ্য নারীকে কাহিনীর প্রধান প্রবক্তা করেছেন। পুরোপুরি উপস্থিত না করার কথাটা আসছে এই জন্যে যে, বহু বিক্ষিপ্ত বক্তব্য এসেছে বিদ্রোহী পুরুষ চরিত্র মারফত। যেমন, দেনা-পাওনা

উপন্যাসে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজাদের বিদ্রোহে নায়িকা 'ষোড়শী'র সহায় পীর সাহেবের চরিত্রটি। এই পীর সাহেব ষোড়শীর প্রধান উপদেষ্টা। প্রথমতঃ নারী প্রবক্তা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, নারীরা সাধারণভাবে শ্রেণী নির্বিশেষে নির্যাতিত হয়ে এসেছে। সেই হিসেবে শরৎচন্দ্র শ্রেণী নির্বিশেষে নারীর মুখ থেকে জগৎকে বদলাবার মৌল তাগিদ জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্র এই নারীদের মধ্যেই আবার একেবারে নিচুতলার অথবা অতি সামান্যা নারীদের বড় করে এনেছেন। তাদের দিয়ে অথবা তাদের পক্ষ হয়ে নিজে নবজীবনের জন্যে বক্তব্য রেখেছেন। কখনও অত্যন্ত কর্কশভাবে এসেছে এই বক্তব্য। কখনও এসেছে কৌতুক বা বিদ্রূপ বা আয়রনির আশ্রয়ে। চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী ও সাবিত্রীকে দিয়ে শরৎচন্দ্র যে সব কথা বলিয়েছিলেন, তাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন কিংবা তারও আগেকার পাঠক-পাঠিকাদের সমাজের আঁতে ঘা মেরেছিলেন তিনি। এগুলোকে অনেকের মনে হয়েছিল—"মেয়েলোকের মুখে পণ্ডিতী কথা" দিয়ে এক ধরনের আদিখ্যেতা। কিন্তু তবু 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে নিটোল উপন্যাস —আঙ্গিকের দিক দিয়ে, চিন্তার দিক দিয়ে। সেই সময়টা নিস্তরঙ্গ ছিল বলেই শরৎচন্দ্র সমস্ত দিক দিয়ে গুছিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পরে 'পথের দাবী' উপন্যাসটিও গোছানো, যদিও গণঅভ্যুত্থানের মুখে এটি লেখা। কিন্তু আরও পরে বিশের দশকের শেষের দিকে এবং তিরিশের দশকে এত অসংখ্য ঘটনা তাঁর চারদিকে ভিড় করে এসেছিল যে, তিনি গুছিয়ে উঠতে পারেন নি। 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' 'বিপ্রদাস', 'আগামীকাল' (আরব্ধ) উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের নারী প্রবক্তারা তাদের বক্তব্যগুলিকে নিয়ে যেন একটা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' দিয়েছে কমলকে, 'শেষের পরিচয়' সারদাকে এবং 'আগামীকাল' মনিমালাকে, শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব) দিয়েছে 'কমললতা' কে। এরা ঝড়ের খেয়ার যাত্রী। শরৎচন্দ্রের লেখায় এদের সংখ্যাধিক্য তথাকথিত রক্ষণশীলতাপ্রবণদের তুলনায় অনেক বেশি ভারী।

শ্রীকান্তের রাজলক্ষীকে শরৎচন্দ্র একান্ত বাস্তব একটি চরিত্র হিসেবেই উপস্থিত করেছেন জীবনের সমগ্র সত্যের অংশ হিসেবে। কিন্তু শ্রীকান্ত 'অন্নদা দিদি' থেকে শুরু করে 'অভয়া' হয়ে কমললতাকে দেখেছে, যারা রক্ষণশীলতার গণ্ডীর ধরাছোঁয়ার বাইরে বৈপ্লবিক মূল্যবোধের একেকটি ছন্নছাড়া প্রতীক।

শরৎচন্দ্র এদের মধ্যেও নিয়ে এসেছেন মাধুর্যকে, যে মাধুর্যের প্রতীক একদিকে স্বৈরিণী রাজলক্ষী এবং অন্যান্য ঘরণীরা। বস্তুতপক্ষে মাধুর্যকে বিশ শতকের ভাঙ্গা/গড়ার সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবপন্থীরা তথা মার্কসবাদীরা

বাদ দেয়ার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকরা যতই উল্টো কথা বলুক না কেন, অথবা মার্কসবাদীদের নিজেদের মনেও নানা সময়ে যতই বিভ্রান্ত চিন্তা গজিয়ে থাকুক না কেন, মার্কস যে "সবার উপরে মানুষ সত্য"কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই তাত্ত্বিক দিকদর্শন ইদানীং স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক লুকাচ প্রমুখের লেখা একটি দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্রের লেখার মাধুর্যের উপাদানগুলি বৈপ্লবিক নব বিশ্ব প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক উপাদানই থাকছে। এই সঙ্গে যোগ হয়েছে এবং প্রবল হয়েছে কর্কশ উপাদান। এদের প্রবলতা অপরিহার্য। কারণ "গড়ার জন্যে ভাঙ্গা" হলেও ভাঙ্গার প্রেক্ষিতটা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। শরৎচন্দ্রের শেষের দিকের উপন্যাসমালার প্রধান নারী চরিত্রগুলি এই ভাঙ্গনের প্রবক্তা। রজনীগন্ধার মত এই নারী চরিত্রগুলি যেমন একই গুচ্ছের ফুল, তেমনি স্বাতন্ত্র্যেও এরা ঋজু।

৪

শরৎচন্দ্র তার বিলাসী গল্পটিকে যেখানে এনে শেষ করেছিলেন, সেটি প্রথম পর্বের লেখা বলেই বিশেষভাবে অর্থবহ। ভবিষ্যতে কি আসছে তার আভাস। শরৎচন্দ্র লিখেছেন ঃ "বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু, গৃহস্থ ও সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়তো আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়তো নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড় লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখেচোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল

হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু'এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।"

শরৎচন্দ্র বিলাসীর লেখক হওয়ার দরুণ বক্তব্যকে শিল্পসম্মত রাখার তাগিদে বিদ্রুপের আশ্রয় নিয়েছেন। যেখানে সরাসরি উপন্যাসের চরিত্র কথা বলেছে, সেখানে অচলায়তনের উপর এসেছে সরাসরি হাতুড়ির আঘাত। 'বামুনের মেয়ে'তে ঠাকুরমা ও নাতনী সন্ধ্যার আলাপ একটি দৃষ্টান্ত ঃ

"সন্ধ্যা—কিন্তু যে জিনিসটার এত সম্মান, এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াটা ভাল?

ঠাকুরমা—কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে।"

ঠিক একই কথা 'পথের দাবী'র মহাবিপ্লবী সব্যসাচী বলেছে ভারতীর কথার জবাব দিতে গিয়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, কথাটা বুড়ি ঠাকুরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসাকে একটা বড় ঘটনা বলে বোঝাতে দ্বিধা করেন নি শরৎচন্দ্র।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী সাহিত্যের সত্যের ওপর রায় দিতে পেরেছিল একই ধরনের জোরে। চরিত্রহীন রচয়িতা কিরণবালাকে মোহময়ী হিসেবে অঘটন-ঘটন পটিয়সী করার সঙ্গে সুস্থির যুক্তিতে স্বয়ংসিদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দৃষ্টান্ত ঃ

"কিরণময়ী—বিশ্বচরাচরের যে দিকে খুশী চেয়ে দেখো, ওই এক কথা ঠাকুরপো, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যেই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে এর প্রতি অণুপরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল, আরও উন্নত হবে এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে অদৃশ্যে, অন্তরে বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্তন এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোনমতেই থামাতে পারে না।

দিবাকর—তাহলে ত চারিদিকেই মারামারি কাটাকাটি বেধে যেত!

কিরণময়ী—মাঝে মাঝে যায় বৈ কি। কিন্তু মানুষের লোভ দমন করবার শক্তি, স্বার্থ ত্যাগের শক্তি, সমাজের শাসনশক্তি, এতগুলো বিরুদ্ধ শক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে একসঙ্গে আগুন ধরে যেতে পায় না। অথচ, এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই

মানত না। রূপের আকর্ষণে তার সেই দুর্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম—একেই শৌখিন কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরি হয়।

দিবাকর—কোথায় পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না আর কোথায় স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ। যে লোক পশুর প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, সে শুদ্ধ নির্মল পবিত্র প্রণয়ের কতটুকু মর্যাদা বোঝে? এ বস্তু সে পাবে কোথায়? তুমি কিসের সঙ্গে কার তুলনা দিচ্চ বৌদি।

কিরণময়ী—তুলনা দিইনি ভাই, দুটো যে একই জিনিস, তাই শুধু বলচি। ঠাকুরপো, ইঞ্জিনের যে জিনিসটা তাকে সুমুখে ঠেলে সেই জিনিসটাই তাকে পিছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। যে ভালবাসতে পারে, সেই কেবল সুন্দর অসুন্দর সব ভালবাসাতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, অপরে পারে না। গোবিন্দলাল এমনি ভালবেসেছে।"

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর পক্ষেই উপনিষদকে উপন্যাস বলা সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যের বাস্তবতার ওপর আরেকটি কিরণময়ী-দিবাকর সংলাপ উল্লেখযোগ্য ঃ

"কিরণময়ী—যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা করো না। যা চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।.... এ সংসারে যে দুচারজন হতভাগ্যের এই নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায়, এগুরুভার তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও, তাতে কাজও হয়ত হয়, অকাজও কমে। অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারি করে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি। গিল্টি দিয়ে তোমার মত আনাড়ীকেই ভোলাতে পারবে, কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোনার রং চিনেচে, এ দুঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হয়ে গেছে, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে?

দিবাকর—কল্পনা কি কিছুই নয়?

কিরণময়ী—কিছুই নয় একথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা গড়তেও যদি বা পারে, প্রাণ দিতে পারে না; বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না। সেই পথ দেখবার আলোর সন্ধান তুমি যতদিন না পাচ্চ ততদিন তোমার বৃশ্চিক শুধু তোমাকেই দংশন করবে, আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারবে না।"

নৈয়ায়িক স্বামী হারানের কাছ থেকে কিরণময়ী কৈশোরে ও যৌবনের সূচনায় বৈজ্ঞানিক দর্শনের কথা জেনেছিল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাকে উপগ্রহ করে রাখেননি, তাকে বরং সবিতা করেছেন। কিরণময়ী দিবাকরকে যা শুনিয়েছে, তাতে সে বার বার বলেছে, "আমি একথা ভাবি, আমি ও কথা

ভাবি।" কিরণময়ী বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগলিনী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র শেষদৃশ্যে মৃত্যুমুখী উপেন্দ্রকে দিয়ে বলিয়েছেন, কিরণময়ী এমন বুদ্ধিমতী নারী যে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারে না; সে আবার জাগবে। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে জাগিয়ে তুলেছেন তার তিরিশের দশকের উপন্যাসগুলিতে। যেমন 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমলের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসের শেষ কথা নায়িকা কমলের। দেশের কাজে উৎসর্গিত রাজেন একটা অগ্নিকাণ্ড থেকে এক দেব বিগ্রহকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আগুনে পুড়ে গিয়ে মরেছে। সবাই হায় হায় করছিল কিন্তু কেউ এগুচ্ছিল না। রাজেনই হলো উদ্ধারকর্তা কিন্তু তাকে মরতে হলো। এই খবর শুনে কমল বলেছে, "অজ্ঞানের বলি এইভাবেই হয়।" অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কমল এর আগে আরও অনেক কথা বলেছে। এটা তারই চূড়ান্ত।

বিশ শতকের বিশের দশকের প্রচণ্ড গণঅভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে যুগযুগান্ত ধরে চাপা পড়ে থাকা কোটি কোটি নরনারী সাময়িকভাবে হলেও যে আত্ম-প্রকাশের একটা মাধ্যম পেয়েছিল তাতে নতুন মানবিক সম্পর্ক অথবা সামাজিক, জাগতিক, সাংসারিক বিন্যাসের যে অভ্যাস ও আস্বাদ পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল কোটি কোটি মন। তিরিশের দশকে চলেছিল এর অনুরণন। বন্যার পর পলিমাটি। চল্লিশের দশকে আসে এ ব্যাপারে আরেকটা প্রচণ্ড প্রকাশের পর্ব যার মধ্যে আগেকার পর্বের ইতিবাচক উপাদানগুলি জায়গা করে নিয়েছিল। বিশের দশকে এরা চেতনার একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস ঘটাতে পারেনি, অথচ একেবারে নিচতলার মানুষও সমকালীন প্রশ্নগুলি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল। সুতরাং সেদিন চেতনার তুলনায় অবচেতনা এক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগী হয়েছিল। অতি সামান্য ও সামান্যারাও সমসাময়িক প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে যে কথা বলেছে তাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ পাওয়া গিয়েছে অবচেতনা ও বাস্তবতার মধ্যে। অবচেতনার স্তর ঠেলে বোধগুলি প্রকাশের ভাষা খুঁজেছে বলে মুখরতার প্রক্রিয়াটা হয়েছে বিস্ফোরণের ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই এরা এইজন্যে আলগা এবং অসংলগ্ন-ভাবে সত্যার্থী সত্যাগ্রহী।

বাংলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই অবচেতনার বিস্ফোরণকে ভাষা দেবার ব্যাপারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' দ্রষ্টব্য। শরৎচন্দ্র মনোশিল্পী ছিলেন বরাবরই। শরৎচন্দ্র মানুষের মনের ফল্গুধারার মত শিল্পী হিসেবে যত পরিচিত, বহিঃসংসার বা বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের শিল্পী হিসেবে ততটা হন নি। বস্তুতপক্ষে মানুষের মনের অন্তর্গূঢ়

রহস্যের কিনারা করতে চেয়েছেন তিনি শুরু থেকেই। তাঁর 'আলো ও ছায়া' গল্পটি এই দিক দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত। তাঁর আগেকার দুঃখ দিয়ে শেষ করা উপন্যাস ও ছোট গল্প মনোদুঃখের কাহিনী। 'চরিত্রহীন' এর আরেকটি দৃষ্টান্ত। মানবাত্মার ঝড়ঝঞ্ঝার যে ধারা শুরু হয়েছিল 'চরিত্র-হীন' উপন্যাসে, তার একটা অব্যাহত ধারা 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে রয়েছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসও এক ধরনের মনোময় উপাখ্যান। কিন্তু বিশ ও তিরিশের দশকের শরৎচন্দ্রের লেখায় যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা সেটা একটা পরিবর্তিত ঘটনাও বটে। পরিবর্তনটা সমকালীন যুগের এবং যুগান্তর থেকে প্রসারিত আগামী দিনের যে প্রশ্নগুলিতে কোটি কোটি সাধারণ নরনারী জড়িত হয়ে ব্যক্তিকভাবেও প্রত্যেকে তাতে সাড়া দিচ্ছে, সেই মানসিক ঘটনার চিত্রণ পদ্ধতি।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ধারণাকেই অবশ্য এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। দুটো দৃষ্টান্ত ঃ

১. 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে রাখালরাজ ও সারদার সংলাপ, 'রাখাল জবাব দিতে পারিল না. অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে এমন প্রগল্‌ভা করিয়াছিল কিরূপে? সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন নিঃসংকোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এদিন রাত্রিকাল নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোত পথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না।"

২. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে হরেন্দ্র-কমল সংলাপ ঃ

"হরেন্দ্র—হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনেবাজির মত এ যত চাচ্চি খুলতে তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূল কিনারা পাচ্চিনে। এ সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয় তো কিছু কিছু বুঝতেও পারব। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিয়া বলল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দু' জনেরই।"

উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তকে ফ্রয়েডীয় সূত্রে ফেলা যেতে পারে। বিশের এবং তিরিশের দশকে বাংলা লেখক লেখিকাদের চারদিকে যে ফ্রয়েডীর আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব শরৎচন্দ্রের ওপর পড়ে থাকতে পারে। তবে শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রধানত কাজ করেছে বিশের দশকে সাধারণ নর-নারীদের মহাজাগরণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের অবচেতন মনে যুগান্তরের প্রশ্নের পর প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। এই সরাসরি যোগাযোগ অবশ্য মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হয়েছে, গণঅভ্যুদয়ের পরের অবসাদে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পাল্টা চালে চাপা পড়েছে সাহিত্যের বিপ্লবী শিল্পরূপ সৃষ্টির তাগিদ। তবে এটা গণ অভ্যুদয়েরই কালান্তরের সূচনা। সুতরাং বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থান আবার ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। এর শিল্পরূপের মুক্তধারা আগের চেয়ে আরও প্রসারিত হয়েই চলেছে। পুরানো এবং নতুন বিপ্লবী রূপকারদের যোগসূত্র পেয়েছে নতুনতর চেতনার তাগিদ। শরৎচন্দ্র এই চলমান যোগসূত্রের মধ্যে থাকছেন।

শরৎজিজ্ঞাসার সূত্র

১

শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য লেখার সম্যক ও গভীর বিচারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় খোঁজখবর, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত টানার কাজে সহায়ক হতে পারে।

১. শরৎচন্দ্রের নিতান্ত ছড়ানো ধরনের উপন্যাসের বর্ণনাবিন্যাসে কিংবা পাত্রপাত্রীর অজস্র সংলাপে যে কখনো অতি-বিস্তারিত ও শিথিল এবং কখনো। সংক্ষিপ্ত আঁটবাঁধুনির কথার ব্যবহার আছে, সেগুলোর কোন একটাও প্রক্ষিপ্ত বা আল্গা বা অতিরিক্ত নয়, যদিও নেতিনেতি বিচারে শাঁসটুকু নিয়ে বাদবাকী সবই ছিবড়ে বলে বিবেচিত হতে পারে। বিষয় ও চরিত্রচিত্রণে এই সবকথাই সমভাবে চড়াদামী ও দরকারী। কারণ শরৎচন্দ্র নরনারী ও তাদের বাঙ্ময় সংসার সমাজ বা পৃথিবী ও দেশের সামগ্রিক বাস্তববাদী উপন্যাস লিখেছেন এবং এইসব উপন্যাসে যা কিছু এসেছে তা না এলেই চলতো না। অর্থাৎ এদের কাটছাট করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হতো না। তাঁর ছোটগল্পও এই সামগ্রিক বাস্তববাদী পদ্ধতিতে লেখা। উপন্যাসের বিস্তারিত উপকরণ থেকেই পাওয়া যায় তাঁর বাস্তববাদের পরিধি যে কত বড় সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা।

২. তাঁর নিবন্ধের ধরনের লেখার তো কথাই নেই, উপন্যাসেরও সাধারণ প্রবল ও সর্বময় স্বাবলম্বিতার অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন, তরল ও ঋজু, ললিত ও রূঢ়ের শৈলী সমাবেশ। তাঁর লেখার একদিক দিয়ে মাধুর্যের যদিও অবধি নেই, তবু কথা ললিতবাণী নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনের অর্থের মধ্যে অর্থ বার করার জাঁতা বসিয়েছেন তিনি তাঁর উচ্ছল ভাবময় উপাখ্যানের পরতে পরতে। সহজ অভিজ্ঞানকে পরিহার না করেও যুক্তির জাল বুনতে কসুর করেননি। তাঁর লেখার ধারার মধ্যে তাই রয়েছে উপস্থাপিত ঘটনা ও সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত পরিষ্কার সিদ্ধান্তের অভাব এবং এই কারণেই দুই তিন চারটি মতের অন্তর্বিরোধ। তবে সত্যের লৌকিক কাব্যিক স্বতঃস্ফূর্ত সন্ধান এবং সত্যের মধ্যে তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের জটিল আরোহনের আপাতবিরোধী বাক-বিন্যাসময় এমন একটি কৌশল জুড়তে পেরেছেন যে, সাংখ্য দর্শন নিয়ে উচ্চাঙ্গের শুকনো ব্যাখ্যাকে তরল প্রেমালাপ থেকে আলাদা করা যায় না।

৩. তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের একটার পাশে আরেকটার মধ্যে কিংবা কোন একটি লেখাতেই অভ্যন্তরে বস্তু ও ভাবের উপাদান ও উপকরণের বহুবিধ

বৈপরীত্য, বিরোধ ও উৎক্ষেপে তাঁর ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ আকীর্ণ। মাঝে মাঝে মনে হয় এইজন্যেই সুন্দর কুৎসিত প্রিয় এবং অপ্রিয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্টোপাল্টা করেছেন। প্রশ্ন জাগে, সংশয় জাগে, একটি সত্যের অভিমুখে যেতে কি তিনি অপারগ? গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, ঘটনাটা তা নয়। সমস্ত উৎক্ষেপের নিরাকরণ সাধন করে মানুষ তার মনুষ্যত্বের জয়যাত্রাপথে চলবে এই পর্যায় তাঁর অধিকাংশ লেখাতে সক্রিয়। এ এক ধরনের ভবিষাৎবাদ। পাঁক নিয়ে লেখাতেও পাঁক দাঁড়াতে পারেনি এই ভবিষ্যৎবাদের মন্থনে। একটা নবজীবন অথবা নবসমাজ ও নবপৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় তাঁর দুঃখ মৃত্যু ও অপঘাত দিয়ে শেষ করা লেখাগুলোও ঘেরা। এই আশাবাদী চিন্তা কখনো এত বেশি খোলাখুলি প্রচারক যে মনে হয় এসে পড়া গেছে এক গরম বিতর্কসভায়। আবার কখনো এই চিন্তাকে জাগানোর ব্যাপারে এত বেশি কুন্ঠা যে মনে হয়, এ যেন আদিম বিশ্বাসীদের মধ্যে এসে পড়লাম। বিপরীতের মাঝখানে রয়েছে ধ্রুপদী উপন্যাসিকোচিত দুই একটি বিদ্রূপপ্রবণ মনোভাব, যা কখনো নিষ্ঠুর আবার কখনো সহানুভূতিতে আর্দ্র। বিশ্বাস বিদ্রূপের দংশনের দরুণ পাঠকগণ সদাসচেতন থেকেছে।

৪. শরৎচন্দ্র এমন একটা যুগান্তরের এমন এক পর্যায়ের কথক যা তাঁর চারদিকে বাঙালী সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একবারের জন্যে হলেও পরিবর্তনের চড়া আলোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। তখন পরিবর্তনের ভাঁজ খুলতে যদি বা সময় লাগছে, সর্বস্তরের চাপাপড়া সমস্ত ধরনের চরিত্রের মানুষের মুখ খুলতে বাধেনি। শরৎচন্দ্র বেশি বয়সে বড় বড় লেখা শুরু করার আগে কিংবা অল্পবয়সে লেখা বইগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়ার আগে যে যাযাবর জীবন যাপন করেছিলেন, তাতে তিনি বাঙালী সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একেবারে সমাজের নিচতলাগুলোতে বসে তাঁর চিন্তার বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। এই কারণেই যখন তারা একসঙ্গে কথা বলে উঠেছিল, তখন শরৎচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি এদের সমস্ত কথার জন্যে জায়গা করে দিতে প্রস্তুত থাকতে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ও ছোট গল্পে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের একই সঙ্গে ছড়াছড়ি। বস্তুতপক্ষে একটা গণযুগান্তর তাঁর লেখায় মুখর হয়েছে। এই যুগান্তর বিপ্লবী বিংশ শতাব্দীর সেই পর্বের উন্মোচন, যেখানে পরাধীনেরা হতে চলেছে স্বাধীন এবং শ্রমজীবীরা হতে চলেছে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্ণধার। তবে একান্তভাবে যে বাঙালী সমাজের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং যে বাঙালী সমাজের বাইরের লোককে নিয়ে তিনি কদাচিৎ মাথা ঘামিয়েছেন, সেখানে তাঁর সমসাময়িককালে যা নিয়ে স্বাধীনতা আর নতুন সমাজ গড়া হচ্ছিল সেই উপকরণগুলি ছিল কাঁচা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র যে যুগান্তর নিয়ে কাজ করেছেন, সেটা

বাস্তব উপকরণে সীমিত, যদিও স্বপ্নে বা কল্পনায় অথবা আকাঙ্ক্ষায় সীমাভেদী। বাস্তববাদী ধ্রুপদী উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র হয়তো এই কারণেই মাঝে মাঝে রাশ টেনেছেন আকাঙ্ক্ষার এবং রাশ টানতে গিয়ে যাদের এগিয়ে যেতে দিয়েছেন তাদের কিছুটা পিছনেও টানতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত 'বিপ্রদাস'। তাছাড়া, একেবারে নিচুতলার নরনারী বিপ্লবী টানাপোড়েনের মন্থনে মন্থিত হয়ে মুখের কোন বাঁধন না মেনে বিশেষ করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি তাদের বৈরীতাকে প্রখর জ্বালা দিয়ে প্রকাশ করলেও সংজ্ঞা এসেছে সেইসব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নরনারীর মুখ থেকে যারা তাদের শ্রেণীগত নাড়ি-বন্ধনকে কাটতে পারেনি। তবে তারা উপরতলা এবং নিচতলার মাঝখানে বেশ নিচুতে, মাঝতলা এবং উপরতলার সঙ্গে এদের যোগ কম। নিচতলার সঙ্গে যোগ বেশি। এইজন্যে এই মাঝতলার কথায় নিচতলার কথা ভিড় করে ঢুকেছে।

৫. শরৎচন্দ্র বাঙালী সমাজের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকলেও এবং তাঁর লেখা বাঙালীর মর্মকথা হলেও তিনি কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকে এর মধ্যে আটকে রাখেননি। যেহেতু, বিপ্লবী বিশ শতকের স্বাধীনতা আর সাম্যবাদের লক্ষ্য নিয়ে গণঅভ্যুত্থান একটা পৃথিবীজোড়া ঘটনা, সেজন্যে বাঙালী সমাজের পরিবর্তন যুক্ত হয়ে গিয়েছে বিশ্ববিপ্লবী আন্তর্জাতিকতায়। শরৎচন্দ্র এই আন্তর্জাতিকতারও কথক হয়েছেন তাঁর একাধিক লেখায়।

২

প্রথম প্রতিপাদ্যটিকে দৃষ্টান্ত দ্বারা খতিয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের লেখার সমগ্রমুখিতার ধারাটাকে বুঝতে পারা যায়। এবিষয়ে 'দেনাপাওনা' আর 'দেবদাস' থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দাখিল করে দেখা যাক এরা কতটা বলতে পারে।

'দেনাপাওনা'তে ষোড়শী ভৈরবী এবং জমিদার জীবানন্দের সংঘাত ও প্রণয়ের কাহিনী নিয়ে যে চমকপ্রদ ঘটনাবহুল বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে তার একটা অপেক্ষাকৃত ও নিচু পর্দার ফাঁকে দেখা যায়, যারা সাধারণত ডাকাতি করে খায় এমন দুজন গ্রামীণ মানুষ ষোড়শীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে তার সংঘাতপর্বে। ষোড়শীর চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকারে এই দুটি মানুষ এমন এক সমুন্নত আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে উপন্যাসের বিশালতা পেয়েছে সার্থকতা। ষোড়শীর মনশ্চক্ষে এদের ছবি, "হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা দস্যু যতক্ষণ দেখা গেল শুদ্ধ বিস্ময়ে এই হীনবীর্য অপমানিত, অধঃপতিত—বাংলাদেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের দিকে সে চাহিয়া রহিল।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসটিতে এদের হঠাৎ আনেন নি এবং উপরোক্ত বক্তব্যও আলগাভাবে আসেনি। 'দেনাপাওনা'র কাহিনীটিকে কিছুটা বাড়িয়েছেন

তিনি এদের কথা বসাবার জন্যে। এই দুটি মানুষ যে আদিম ঐতিহাসিক পশ্চাদপদতার কারণে ষোড়শী ভৈরবীকে মাতৃরূপে দেখে যাবে, সেকথাও চাপা দেননি তিনি। এরা একটা প্রাচীন প্রথার সেবায়েত। কিন্তু ষোড়শী এদের মধ্যেই দেখতে পেয়েছে অবক্ষয়ী বাঙালী সমাজের অক্ষয় সত্তাকে।

হয়তো এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে যে, ষোড়শীর চোখ শরৎচন্দ্রের চোখ। এই কথাটাকে মেনে নিয়ে আরও কিছুটা বাড়িয়ে বললে আমরা আমাদের প্রথম প্রতিপাদ্যের সত্যে পৌঁছাতে পারি। বাস্তববাদী উপন্যাসে প্রেমের কাহিনী লিখতে গিয়ে সমগ্রের কথক যে দৃষ্টিতে দেখেন এ হচ্ছে সেই দৃষ্টি। ষোড়শী ও জীবানন্দের একান্ত দুজনের অন্তরঙ্গতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই অবশ্য এই দৃষ্টির বিস্তারণ ঘটেছে। একটা আরেকটাকে নাকচ করেনি।

প্রায় একই ধরনের ঘটনা 'দেবদাস' উপন্যাসেও ঘটেছে। চন্দ্রমুখী দেবদাসের প্রেমে পড়ে বেশ্যাবৃত্তির বাইরে একটা নতুন জীবনের ইঙ্গিত পেয়ে কলকাতা ছেড়ে অশ্বত্থঝুরি গ্রামে বাসা বেঁধেছিল অন্ত্যজদের মধ্যে। এখানে থাকতেই সে জানতে পারলো, দেবদাস একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছে। দেবদাসকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প করে সে আবার কলকাতা রওনা হলো তাকে সেখানে ধরার জন্যে। এই রওনা হবার সময় 'দেবদাস' উপন্যাসের কয়েকটা লাইন ঃ

"গাড়িতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময় পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা। দেবদাসের জন্য না হইলে কলিকাতার রাণীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।"

এখানে প্রশ্ন। এই লাইনটিকে সরিয়ে রেখে কি চন্দ্রমুখীর চরিত্র-বিচার সম্পূর্ণ হয়? শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের পটভূমির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়? এবং সর্বোপরি জিজ্ঞাসা, এই লাইনটিকে সরিয়ে রাখলে কি শরৎচন্দ্রের পরিচয় অসমাপ্ত থাকে না? এই প্রসঙ্গেই 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বইটিতে এমন ধরনের নায়ক নায়িকা বেছে নিয়েছেন যারা কন্ঠিবদল করে বিয়ে করেছে। বাংলাকাব্যে এবং উপন্যাসে এই ধরনের নায়ক নায়িকা প্রধানত বিরহ মিলনের মধুর রসই জুগিয়ে থাকে। শরৎচন্দ্র তাই প্রথানুযায়ী শুরুও করেছিলেন বহু পরিচিতি বোষ্টম বোষ্টমীর হৃদয়বৃত্তির কাব্যিক উপাদান নিয়ে। কিন্তু তিনি এখানে এমন একজন বোষ্টমীর

কাহিনী লিখলেন, যে নিজের চারধারে একটা নতুন পরিবেশ গড়ে তুলে তার মধ্যে থেকে নিজেকেও নতুন করে গড়ে ফেলেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ লেখায় যে প্রেম ও বাৎসল্যের মধুর ছবি এঁকেছেন এবং এবিষয়ে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছেন, তিনি 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন বৈষ্ণব-ভাবের বিপরীত ভাব। এনেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক কার্যক্রম। এনেছেন শ্রেণীসংগ্রামের একটা কড়া ঝাঁজ।

এই যে ভাবের ঘোরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বস্তুময়তা এবং এই যে প্রেমের কাহিনীতে সমাজ সংসার দেশ ও পৃথিবী এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে টানাহেঁচড়া করা, এই ঘটনাটা অবশ্য ধ্রুপদী বাস্তববাদী উপন্যাসের বিশিষ্টতা। শরৎচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সুবিধা হয়েছিল এতে সামগ্রিক জীবনসত্যকে উপন্যাসের পরিধির মধ্যে ধরার পদ্ধতি আয়ত্ত করার। ঋণী তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয়, পূর্বসূরীদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তিনি তার চেয়ে আরও বেশি কিছু সংগ্রহ করে আরও বেশি রাসায়নিকতা দিয়ে কাহিনী সাজাতে পেরেছেন। এখানে নতুন কাল তাঁকে নতুন উপকরণ ও সম্ভাবনা দিয়েছে।

এপ্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের উল্লেখ না করাই সঙ্গত। কারণ, এর প্রথম পর্বের প্রথম অংশে এমন সব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রীকান্ত চরিত্রের ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রেমের উপাখ্যান চার পর্বের শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেও প্রথম পর্বের প্রথম অংশের তৈরি ছাঁচের শ্রীকান্ত বারংবার মূল উপন্যাসের বাইরে পা রেখেছে এবং এটা এই কারণেই মূল উপন্যাসকে জখম করে না।

এই জন্যেই যে ধরনের উপন্যাসে প্রেমের উপাখ্যান মূলভিত্তি এবং একটা আবেগের ঘোর যেখানে সমস্ত কাহিনীটাকে ঘিরে থাকতে চায়, তাদেরই রাখা উচিত আমাদের প্রথম বিষয়ের বৃত্তে। এদিক থেকে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। তিনটি চরিত্রের একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের সম্পর্ক ও বিকাশ এই উপন্যাসে যে ঝড়ের সৃষ্টি করেছে, তাতে একদিকে ঘর পুড়েছে ঠিকই, কিন্তু বৃহত্তর পটভূমি যে দেশ তার ওপর থেকে একটা যবনিকা উঠে যায়না কি এর ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে?

প্রশ্ন হতে পারে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কিংবা এমনকি 'পথের দাবী'তেও মহামারীর শঙ্কা ও আশঙ্কার যে ছবি আছে তা 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শুধু সুরেশের মৃত্যুর কারণ হিসেবেই আসতে পারতো, এর ব্যাপক ধ্রুপদী বিস্তারণের প্রয়োজন ছিল কি?

এর উত্তর ঃ এখানেই শরৎচন্দ্রের লেখার বিশেষত্ব। তিনি শুধু কয়েকটি মানব মানবীর কাহিনী লেখেননি। তিনি মানব কাহিনী লিখেছেন, নায়ক-নায়িকার মানবর্ত্তকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, বস্তুময় ও জনবহুল সংসার পৃথিবী ও দেশের যাবতীয় উপকরণ এই বৃত্তের মধ্যে ভিড় করে ঢুকতে চেয়েছে। শরৎচন্দ্র কখনো অতিমাত্রায় পরিমিতি সচেতন হয়েছেন, কখনো বা পরিমিতির তোয়াক্কা করেননি। বাহুল্য উঠছে সত্যের তাগিদে।

৩

আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যটি শিল্পরূপসংক্রান্ত।

শরৎচন্দ্র যখন তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যজগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং যখন পাঠক-পাঠিকারা তিনি যা লিখেছেন তা-ই নির্বিচারে নিয়েছেন, তখন এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, শরৎচন্দ্র পাঠক-পাঠিকার মন রেখে কান্নাগদগদ অথবা মিষ্টি মিষ্টি কথা লিখেছেন। অর্থাৎ যে ভাবে লিখলে গরিষ্ঠসংখ্যক পাঠক-পাঠিকা নির্বিচারে তাঁর বইকে নেবে, সেভাবেই চিন্তা করে একটা গড়পড়তা বর্ষার জলস্রোতের মতো সহজ বাকবিন্যাস করেছেন। সমসাময়িক কালেরই শেষের দিকে যারা শরৎচন্দ্রের ধারা থেকে ভিন্ন ধরনের লেখা লিখেছিলেন তাঁরা জনপ্রিয়তার চাবীকাঠিটা তখন পর্যন্ত হাতে পাননি। একটা লঘু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল এই জনপ্রিয়তার প্রশ্নকে ঘিরে। ভিন্ন ধারার লেখকদের একাংশের তরফ থেকে একটা অভিযোগ উঠেছিল, শরৎচন্দ্র একটা কান্নাগদগদ মিষ্টিমিষ্টি মনরাখা শৈলীর শিল্পী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শৈলীর ঘটনাটা কিন্তু এমন ছিলনা। তাঁর বাক্‌সজ্জা গড়পড়তা কোন ব্যাপার নয়, মনরাখার লেখাও নয়, ললিতবাণীও নয়। তিনি সাহিত্যের সংজ্ঞা বিচারে ছিলেন বিদ্যুৎজ্বালাতে আঘাত দিয়ে চিকিৎসা করার পন্থী। দৃষ্টান্ত 'শেষ প্রশ্ন' এবং 'চরিত্রহীন'।

'শেষ প্রশ্ন' প্রায় শেষের দিকে লেখা, আর 'চরিত্রহীন' প্রায় প্রথম দিকের, যদিও মুসাবিদাটি একবার আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর স্মৃতি ঝালিয়ে মাঝামাঝি সময়ে লেখা এবং ছাপতে দেয়া। দুটি বইএর পেছনেই রয়েছে লেখার শৈলীর সচেতন ব্যবহার।

শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন' লিখেছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে সত্যিকার আধুনিক সাহিত্য কি হতে পারে তার পরিচয় দেবার জন্যেও।

অন্যান্য কারণ ছাড়াও তিনি 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি লিখেছিলেন সত্য সাহিত্য হিসেবে।

বস্তুতপক্ষে দুটি উপন্যাসেই রয়েছে শিল্পরূপ নিয়ে বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যেরই প্রয়োগ রয়েছে দুটি উপন্যাসেই।

শেষ প্রশ্নে 'একদিন যখন নারী ছিলাম' নামের একটি আধুনিক বাস্তববাদী ফরাসী গল্প নিয়ে যে জৈবমানবিক প্রশ্নের খোলা আলোচনা রয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের নির্মিতি ও মালমসলার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র গল্পটিকে একটি মানদণ্ড হিসেবে সামনে রেখেছেন। এই গল্পটিকে তিনি নাকচ করে দেননি। এবং এই প্রসঙ্গেই হয়তো আশা প্রকাশ করেছেন, শেষ প্রশ্নে আলোচিত নরনারীর জৈবমানবিক জীবনদর্শনকে তাঁর পাঠকপাঠিকারা খোলাখুলি তর্ক করেই বুঝে নেবেন। তর্ক-জমাবার জন্যে তিনি উপন্যাসটিতে সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে তর্কের জাঁতা বসিয়েছেন।

তাঁর সত্যের অনুভব ও জ্ঞানকে কোমল কঠোর নির্বিশেষে সমস্ত পাঠক-পাঠিকার মনে সংক্রামিত করার বাকসজ্জার চৌম্বক পদ্ধতিও যে কী নিদারুণ দাহক হতে পারে, তার প্রমাণ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প। এতে তিনি করুণা বা লালিত্যের বাষ্পটুকুকেও থাকতে দেননি।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত যে রুক্ষতা সমস্ত কোমলতাকে চেটে খেয়ে ফেললো, এটা শিল্পীর কোন বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতির ফল নয়।

এই লেখাগুলো এসেছে সেই একই শৈলী থেকে, যাকে শরৎচন্দ্র স্বরগ্রামের ছাঁচে গান ঢালার মতো সেধে নিয়ে নিরন্তর সাধনার মধ্য দিয়ে তৈরী করেছিলেন। সুখদুঃখ হাসিকান্না সন্তুষ্টি ক্ষোভ ভালবাসা ঘৃণা তৃপ্তি যন্ত্রণা করুণা ও ক্রোধ পুণ্য ও পাপ মিলনবিরহ এবং ভালমন্দ নিয়ে সংসার আর মানুষের চরিত্র ও সম্পর্কের মর্মকথা।

এই সাধনাটাই তাঁর কৌশল, যা কড়ি আর কোমলকে ছিঁড়েখুড়ে যেতে দেয়নি দুদিক দুভাগ হয়ে তাঁর ছড়ানো ধরনের লেখায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে, তিনি তাঁর আত্মকথাকে বিচিত্র সুরে স্বরে বর্ণে খাদে ও উদাত্তে নানা লীলায় প্রকাশ করতে সক্ষমতা সম্বন্ধে যত না সচেতন রয়েছেন, তার চেয়েও বেশি উদ্যোগী থেকেছেন সমসাময়িক বাঙালী সমাজের বহু নরনারীর মুখর হবার সাধনাকে সংহত করে দেখাতে।

শরৎচন্দ্রের এই সাধনা আত্মগত সাধনা ছিল। তাঁর উপরোক্ত সাধনা আত্মবিবরের অভ্যন্তরমুখী ছিল না। চারপর্বের শ্রীকান্ত এবিষয়ের উদাহরণ।

৪

আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য : শরৎচন্দ্রের লেখার বিষয়বস্তু ও ভাবের সজ্জায় যে নানা ধরনের বৈপরীত্য জাঁকিয়ে এবং গাঁজিয়ে উঠেছে, সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে একটি সত্যাভিমুখে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে চলেছেন এবং তাঁর

লেখার মধ্যে এই দ্বন্দ্বের নিরাকরণ ঘটেছে একটি নতুন সমাজ ও জগৎ গড়ার ভবিষ্যৎবাদী প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াটা বিষয়বস্তু ও ভাবের বৈপরীত্যে যে কিভাবে শরৎচন্দ্রকে আকীর্ণ করেছে তার একটা দৃষ্টান্ত তাঁর সুন্দরের ধারণা ও বর্ণনা।

প্রেম ও প্রভাবের ক্ষেত্রে চলিত ধারণা অনুসারে কোন ব্যক্তি যে চৌম্বক শক্তির অধিকারী, তা হচ্ছে তার রূপ বা সৌন্দর্য। এই ধারণা থেকে শরৎচন্দ্র মুক্ত নন। রূপবতী এবং রূপবানেরাই যে অঘটন ঘটায় এবং 'রূপ লাগি ঝুরে মন'ই হচ্ছে সেই সাধারণ কাব্যিক চাবিকাঠি যা নিয়ে কলাশিল্পীদের কাজ করতে হয়, এই প্রত্যয়টিকে নিয়ে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেছেন বলে মনে হয়। 'পথের দাবীতে' সুমিতা, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে সাবিত্রী আর কিরণময়ী, 'শেষের পরিচয়' এ সবিতা আর সারদা, শেষ প্রশ্নে কমলের প্রাথমিক আকর্ষণ হচ্ছে তাদের অনন্যসাধারণ রূপ। এদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক অসামান্যতার প্রধান উপাদান এদের রূপ। এদের রূপের আগুনে পুরুষ পতঙ্গেরা হয় পুড়েছে, নয়তো তার চারদিকে পাক খেয়েছে। শরৎচন্দ্র পুরুষের অনন্যসাধারণ রূপে আকৃষ্ট করিয়েছেন নারীকেও। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে সাবিত্রীর প্রণয়ী সতীশ এবং শেষ প্রশ্নে কমলের স্বামী শিবনাথ এমনি অনল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় এর বিপরীতটাও জীবনের অপর মেরু হিসেবে সামনে এসেছে। রূপই একমাত্র অস্তিত্ব বা সত্য নয়, কারণ কুরূপ কুশ্রীদের নিয়ে পৃথিবী আর সংসার ঘুরছে। এক্ষেত্রে অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষরাই প্রচলিত সুন্দরের সংজ্ঞার বাইরের মানুষ। তবু এরা আকর্ষণ করে, প্রভাব বিস্তার করে। এরা প্রধানতঃ কর্ম, বুদ্ধি বা বিদ্বৎরূপী। যেমন, শেষ প্রশ্নে অজিত, পথের দাবীতে সব্যসাচী, দত্তায় নরেন্দ্রনাথ, শেষ প্রশ্নে রাজেন। এদের অধিকাংশের চেহারা একহারা বা দোহারা ধরনে। এই মেরুতে নায়িকা নারীদের ব্যবহারে মধু ও মাধুর্য। এরা কুশ্রীও হয়ে থাকতে পারে, এদের চেহারার কোন বৈশিষ্ট্যও না থাকতে পারে তবু এরা ঘটনা ঘটাচ্ছে, এরা নায়িকা। শরৎচন্দ্র এদের রূপের বর্ণনা দেবার প্রয়োজন রয়েছে বলে যেন মনেই করেন নি। এদের ব্যবহারে এদের পরিবেশে যে সুষমা, শরৎচন্দ্র তার ছবি এঁকেছেন যত্ন দিয়ে।

সৌন্দর্য বা রূপের মূল্যবোধ ও সংজ্ঞা শরৎচন্দ্রের লেখার উপরোক্ত অবস্থার দরুণ কিছুটা গোলমেলে হতে বাধ্য। একটা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব সাদা চোখেই ধরা পড়ে। সামঞ্জস্যের আবরণ ফুঁড়ে বিরোধের কাঁটা বেরিয়ে আসে। সুতরাং সংসার, মানুষকে মেলাবেন কি করে এখানে শরৎচন্দ্র?

কিন্তু শরৎচন্দ্র মিলিয়েছেন মানুষকে দুটো মেরুতে তাদের অবস্থানকে সত্য বাস্তব বলে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করেও। একাজ তিনি করেছেন দুটো উপায়ে।

প্রথমতঃ চেষ্টা করেছেন রূপবান ও রূপবতীদের শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন করে তুলতে যাতে রূপ আর টিকতে পারে নি। শেষ প্রশ্নে কমল, চরিত্রহীনের কিরণময়ী, শেষের পরিচয়ে সবিতা সেই জ্বালা হারিয়েছে যা তাদের স্থাপন করেছিল জীবনমঞ্চের কেন্দ্রে।

এব্যাপারেও তাঁর বিপরীত সংজ্ঞা যে ধ্বসে পড়েছে তা নয়। কারণ, সাবিত্রী তার রূপ হারায় নি কোন অবস্থাতেই।

দ্বিতীয়ত, বিকার ও বিকৃতি থেকে মুক্ত যে ছবিটি দেশ ও সমাজ এবং মানুষ গড়ে ওঠার বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, সেই মনুষ্যত্বের দুরূহ কষ্টকর দুঃখময় সাধনার ছবিগুলোকে বারংবার কাহিনীর মধ্যমঞ্চে স্থাপন করে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন রূপ অরূপ ও বিরূপের বিরোধিতার মধ্যে মানুষের একটি বাঁচার মতো করে বাঁচার সত্যের প্রক্রিয়াকে সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণার উপর জয়ী বলে নির্দিষ্ট করতে। এটাই তাঁর বর্তমানময় ভবিষ্যৎবাদ। এই জয়কে শরৎচন্দ্র কখনো অনিবার্য সম্ভাব্য হিসেবে বিস্তারিত ব্যবস্থা দ্বারা বোধগম্য করতে চেয়েছেন, কখনো শুধু ইঙ্গিতই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। 'পথের দাবী' উপন্যাস দার্শনিক ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত। আর 'অরক্ষণীয়া' দৃষ্টান্ত কাব্যিক ইঙ্গিতের।

বস্তু ও ভাবের এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখার অনেকটা দিকে যেখানে বৈপরীত্য একেবারে বিপরীত মেরুর, সেটা ঘর ও বাহিরের প্রেক্ষিত। শরৎচন্দ্রের দুই ধরনের উপন্যাসের মাঝখানে দুটো ধরনকে একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলাতে গিয়ে দেখা যায়, জীবনদর্শন আর মূল্যবোধ এখানে ঘর ও বাহিরের উভয়কেই বড় করে বসে আছে। অর্থাৎ একটা বিরোধের সৃষ্টি করে রেখেছে দুটোর মধ্যে। শেষ প্রশ্নের জীবনদর্শনে ঘরোয়া জীবনযাপন অকিঞ্চিৎকর বলে চিহ্নিত হলেও দেখা যায় সমস্ত ব্যাপারটাই পাক খাচ্ছে বৈঠকখানা, রন্ধন কক্ষ বা শয়ন কক্ষে। অপরদিকে শেষের পরিচয় উপন্যাসে রয়েছে ভেঙ্গে যাওয়া ঘরগুলোর তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ার মধ্যে ঘরের জন্যে ক্রন্দন। ঘর বড় না বাহির বড় এই দুই উপাদানের তুলনামূলক মূল্য-বিচার করা শরৎচন্দ্রের দুরূহ সমস্যা ছিল বলে মনে হয়। শ্রীকান্ত উপন্যাসে এর একটা আত্মিক সমাধান তিনি দেননি। একটি একান্নবর্তী পরিবারের গৃহস্থালির মধ্যে যারা বাসা বেঁধেছে, তাদের জন্যে তিনি যেমন চিন্তিত, তেমনি তিনি এই ধরনের বন্ধনের বাইরে অকূল পৃথিবীতে পদযাত্রীদের সম্পর্কের মধ্যে যে একটা সার্থকতা, তার কথাও ভেবেছেন। দুটো ভাবনাই ঘন হয়ে উঠেছে আষাঢ়ের মেঘের মতো তাঁর মূল্যবোধে।

এখানেও প্রশ্ন এবং সংশয় জাগা স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি ঘর বাহির দুটোকেই বড় করে বসে আছেন, সেহেতু এখানে তিনি মানুষকে একই জীবনদর্শনে মেলাবেন কি ভাবে?

কিন্তু তাঁর মিলনসূত্রটি এখানেও ছিঁড়ে যায়নি। এই মিলনসূত্রটি মনুষ্যত্বের সাধনায় জয়ের সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া।

এই বিশ্বাসটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন ঘর ও বাহিরের পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসার জন্যে এদের উভয়ের কাছে কখনও একথা অত্যন্ত জোরালো তাগিদ রেখে, কখনো বা বিদ্রূপের সাহায্য নিয়ে প্রচ্ছন্ন তাগিদ বা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা।

শরৎচন্দ্রের লেখার তৃতীয় আরেকটি বৈপরীত্য হলো প্রবৃত্তি ও চেতনা, দেহ ও মন, বস্তুময় জগৎ ও ভাবময় ধ্যানের জগৎ এবং এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নরনারীর আচরণের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ।

এখানে প্রধানত প্রবৃত্তি ও চেতনার কথাটাকেই যদি তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যায়, তাহলে প্রাথমিকভাবে মনে হবে, শরৎচন্দ্র উপন্যাস ও ছোট গল্পের ভিতরে এই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ট্র্যাজেডি নাটকের বিষয়ের মতো নিরাকরণের আয়ত্তের বাইরে স্থাপন করেছেন। একারণেই কি তাঁর কোন কোন উপন্যাস জাত নাটকে রূপান্তরিত হয়ে যায় শুধু শব্দসজ্জার সামান্য হেরফের করে? অধিকাংশ লেখার প্রবৃত্তির কাছে যুক্তিকে হার মানিয়েছেন কি তিনি এই কারণেই? একাজটা তিনি করেছেন সম্পূর্ণ ফ্রয়েডীয় ভঙ্গিতে। চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়ে নরনারী ও সন্তান সৃষ্টি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলোর সঙ্গে মিল যদিও পাওয়া যায় বার্নার্ড শ-র ম্যান এণ্ড সুপারম্যান নাটকের কিছু বক্তব্যের,কিন্তু বার্নার্ড শ-র মতো প্রবৃত্তির বরাত দিয়ে শরৎচন্দ্র চেতনার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন কি?

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র প্রবৃত্তি ও চেতনাকে পাশাপাশি প্রায় সমান শক্তি জুগিয়ে তাদের আওতার মধ্যে মানবমানবীর জীবনতাড়নাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা নয়। এখানেও মনুষ্যত্বের সাধনার ঘটনাটাকে তিনি ঘটিয়েছেন। শেষ প্রশ্নে রাজেন চরিত্রটি যত নিরাসক্ত, তার প্রতি শরৎচন্দ্র তত নিরাসক্ত নন। এই রাজেন চরিত্রটি প্রবৃত্তি ও চেতনার সমান্তরাল ধারার একটি আকাঙ্ক্ষিত নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষের সম্ভাব্যতার তাগিদ। এখানেও শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাদ সক্রিয়। অবশ্য ভবিষ্যৎবাদী ইঙ্গিতটা এই উপন্যাসে বৈঠকী আলাপের কথার অপরিমিতিতে কিছুটা অবরুদ্ধ।

ভাব ও বস্তুর বৈপরীত্য বিষয়ে আরেকটি সমস্যারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হচ্ছে শরৎচন্দ্র যে বহু নারীকে তার উপন্যাসে গল্পে এনেছেন, তাদের

চরিত্রসম্পর্কীয়। যদিও একটা ধারণার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যে, শরৎচন্দ্র প্রধানত নারী চরিতকার এবং মধুর নারীচরিত্রের আলেখ্যকার, তবু প্রকৃত ঘটনা এই যে, মধুর ও বীভৎস দুই ধরনের নারী চরিত্রই তাঁর লেখার বৃত্তে জায়গা নিয়েছে।

ঘরের এবং ঘরের বাইরের এই দুই ধরনের নারী অথবা মাঝামাঝি নিয়ে তিন ধরনের নারী অথবা তিন ধরনের মিশ্রিত মানবীর কথাকে তিনি ললিতে কঠোরে উচ্চারিত করেছেন।

সুতরাং শরৎচন্দ্রের লেখায় যেমন নারীবন্দনা আছে, তেমনি নারী সম্বন্ধে খটকাও রয়েছে। যেখানে ভালমন্দ সৎ অসৎ সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, সেখানে শরৎচন্দ্রের লেখায় কার দিকে কতটা জোর পড়েছে তা ঠিক করা একটি সমস্যা। এটা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যেখানে একই চরিত্রে তিন বা ততোধিক ধরনের মানুষের উপাদান মিলেমিশে এক হয়ে রয়েছে, সেখানেই শরৎচন্দ্র কথাকৈবল্যে আটকে গিয়েছেন, এরকম একটা ধারণা টানা অস্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্রকে যে মাঝে মাঝে গোঁজামিল দিয়ে হিসাব মেলাতে হয়নি, সে কথা বলা যায় না। সমসাময়িক চোখে যা-ই ধরা পড়ে থাকুক না কেন, ভবিষ্যতের চোখে অনেক পারিপাট্যও গোঁজামিল বলে ঠেকেছে নিশ্চয়।

কিন্তু এই বৈপরীত্যকে সমগ্র জীবনের নিরন্তর তাগিদে কাটিয়ে সত্যের অভিমুখী করে নারীর যে মূল চরিত্রসত্তা একসঙ্গে লক্ষকোটি নতুন মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া তাকে সামনে আনার জন্যেও শরৎচন্দ্র শ্রমী ছিলেন। এখানেও সেই একই মনুষ্যত্বের সাধনার ভবিষ্যৎবাদ কাজ করেছে।

বাঙালী সমাজের কালের সীমানা তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের বৃত্তে আটকে রাখায় তিনি এমন অনেক কথা তখন নারীর মনুষ্যত্ব নিয়ে তাঁর 'নারীর মূল্য' নিবন্ধে বলেছিলেন, যার একটা বড় অংশ ইংরেজ বুর্জোয়া মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সারের নারীসাম্য ধারণার বুর্জোয়া ধারায় প্রভাবিত ছিল এবং এই কারণে পরবর্তীকালে নারীর সামগ্রিক সমস্যার কিনারা করার উপযুক্ততা হারিয়েছে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে সকল নারীর যে মানবিক পূর্ণ মর্যাদাময় মুক্তির ভবিষ্যৎবাণী আছে, তার কথা অথবা নারী সম্বন্ধে সাধারণভাবে মার্কসীয় ভাবধারা সে সময়ে বাঙালী সমাজে আলোচিত হয়নি। সুতরাং, নারীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সামগ্রিক বৈপ্লবিক চিন্তার কাছে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' নিবন্ধের বক্তব্য 'আপটুডেট' নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের একটা বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক সমস্যার সমাধানের পথ করেছেন, যদিও সাধারণভাবে ভাব তখন পর্যন্ত পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। 'পথের দাবী' উপন্যাসটিতে এবিষয়ে তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এমন কিছু কথাবার্তা রয়েছে যা বিস্ময়করভাবে মার্কসীয়।

৫

আমাদের চতুর্থ প্রতিপাদ্য, বাঙালী সমাজের এবং বাঙালীর দেশ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক গণযুগান্তরের প্রাথমিক পর্ব শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে ভাষা পেয়েছিল।

এখানে একটা বিশেষ বিষয় দ্বারা গণযুগান্তর বলতে সে সময়ে কি ঘটেছিল তা' পরিষ্কার করে নেয়া যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং বিশেষ করে রাশিয়াতে সোভিয়েট বিপ্লব সফল হবার পরে আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণমানুষের মুক্তি-সংগ্রামের প্রক্রিয়া প্রধান হয়ে উঠেছিল। যারা অবনত তারা নিতান্ত সাময়িকভাবে হলেও মুক্তির উদ্যোগটাকে এক ঝটকায় নিজেদের হাতে নিয়ে বসেছিল। একসঙ্গে সমস্ত চাপাপড়া স্তরগুলো বেরিয়ে এসেছিল সাময়িকভাবে হলেও মেহনতী মানুষের উপযোগী সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে।

এরই অংশ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্যবোধগুলি নিরীক্ষা করতে চেয়েছিল কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক শক্তির সঞ্চারকে যা সমস্ত নিপীড়িত ও নির্বাসিত মানুষকে শোষণের বিরুদ্ধে একত্র করতে সক্ষম। শরৎচন্দ্র পথের দাবী উপন্যাসে এই বিষয়টি উপস্থিত করেছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসে পথিকৃৎ।

শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'কে কিছুটা আল্‌গাভাবে স্থাপন করেছিলেন বর্মায়। বর্মার তখনকার সমসাময়িক স্বাধীনতাসংগ্রাম তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর বাইরে রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে গণযুগান্তর তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল তারই তাগিদে তিনি বর্মার কলকারখানার বাঙালী শ্রমিকদের তাঁর কাহিনীর বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। সব্যসাচী যখন অন্যতমা নায়িকা ভারতীকে জানালেন যে কলকারখানার মন্হরগতিতে নারকীয় অবস্থায় বসবাসকারী শ্রমিকরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে, তখন তাঁর বক্তব্যটা বিশেষভাবে বাস্তব হয়ে উঠলো একারণে যে, শরৎচন্দ্র সেই সময়ে শ্রমিকদের চরিতকথাটিকে তার নিচুস্তরের অবস্থানেই উদঘাটিত করে দেখালেন। দেখালেন শ্রমিকরা কেমন করে কথা বলছে। অজস্র স্থূল ও অশ্লীল কথার মধ্যে শাণিত ইস্পাত কথকের মতো বৈপ্লবিক কথাও বলেছে। কারও চাপিয়ে দেয়া বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি নয়। এই কারণেই তাদের নিয়ে সব্যসাচীর অজস্র কথা বাড়তি হয়নি। বরং তাদেরই কথার ব্যাখ্যা হয়েছে।

'পথের দাবী'তে ফয়ার মাঠে আসন্ন মিটিং বিষয়ে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ভারতীর আলাপে জানতে পারা গেল তখনকার প্রলেতারিয়েতের মুখের কথা। উপন্যাসে সম্ভবত গণযুগান্তরের তাগিদেই এই মুখের কথা পথের

দাবীতে জায়গা পেয়েছিল। এই জায়গা দেয়ার কাজটা শরৎচন্দ্র খুব দেখেশুনে করেননি। কারণ পথের দাবীতে যে সব্যসাচী ও তাঁর সাথীদের কথা লিখেছিলেন, কালানুক্রমিকভাবে তাঁদের কর্মসূচীতে বা তত্ত্বে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী থাকার কথা নয়। আসলে গণযুগান্তর ঘটাবার আগের বিপ্লবী প্রস্তুতি নিয়ে পথের দাবী নায়ক নায়িকার গল্প। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেহেতু 'পথের দাবী' লিখেছেন গণযুগান্তর ঘটার সময়, সেজন্য জাগ্রত প্রলেতারিয়েত ঢুকে পড়লো গল্পের মধ্যে, কথা বলতে চাইলো, কথা বললো।

শ্রীকান্তের যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান ঘটেছে, তার লেখার কালানুক্রমিকতা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, উপমহাদেশের এবং তারই আওতায় বাঙালী সমাজে যে গণযুগান্তরের উদ্ভবের উল্লেখ করা হয়েছে ওপরে, তার প্রতিফলন প্রসারিত হয়েছে পথের দাবীকে ছাপিয়ে।

বিশেষ করে তৃতীয় পর্বের শ্রীকান্তে দূর গ্রামাঞ্চলে রেললাইন পাতবার যে কর্মকাণ্ডটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে প্রলেতারিয়েত চিত্রটি শরৎচন্দ্রের একটা স্মরণীয় কাজ। এখানে বিষয়টির পরিবেশন ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ পথের দাবীর ধরনের নয়। এই প্রলেতারিয়তের সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে 'পণ্ডিত-মশাই' এর গ্রামীণ দরিদ্রদের। এখানে শ্রমজীবীরা কোন কথা বলছে না শুধু কলেরায় বেঘোরে মরছে। কিন্তু এদের চূড়ান্ত বিপন্ন অবস্থাকে শরৎচন্দ্র টেনে এনেছেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধকে বিপ্লবী তত্ত্বের মূল বক্তব্য করার জন্যে।

এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তির মাঝখানে রয়েছে শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিক কারিগরদের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। কী আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত, মর্যাদাময় ও অর্থপূর্ণ এই মজুর-কারিগরদের কথাগুলি।

যে গণযুগান্তর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতকে সাধারণভাবে শ্রমজীবীদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কথা বলিয়েছে অথবা বিপ্লবী অবস্থান দিয়েছে, তারই একটি প্রকাশ সাধারণভাবে নির্যাতিতা নারীর বক্তব্যের মধ্যে নতুন সুর। তবে এই নতুন সুরটা নিয়ে কাজ করেছেন শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরীরা। তাঁর সুরটিকে তুলে নিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে বলে কয়েই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সুরটা তুলে নিয়েছেন।

এখানে একথাটা বলতেই হবে, শরৎচন্দ্র গণযুগান্তরের কাছ থেকে পাওয়া নতুন সুরটিকে নিয়ে নিচতলার নারীদের কথা বলাবার জন্যে সাধারণভাবে উদ্যোগী হননি। শেষ প্রশ্নের কমলের কিংবা নীলিমার কথাগুলো নিচতলার মেয়েদের কথাবলার কাজটাকে কিছুটা সাহায্য করেছে হয়তো মাঝতলার

মেয়েদের মুখ খুলে দিয়ে। কিন্তু এটা গণযুগান্তরের প্রত্যক্ষ কাজ নয়। শেষের পরিচয় উপন্যাসের সারদার কথাবার্তার মধ্যে কিছু নতুন সুর আছে। তবে এটা তার প্রণয়ী রাখালরাজের, না নিজেরই সেটা বলা শক্ত।

৬

আমাদের পঞ্চম প্রতিপাদ্য, শরৎচন্দ্র একান্তভাবে বাঙালীর লেখক হলেও তিনি তাঁর দৃষ্টি ও হৃদয়কে বাঙালীর বাইরে প্রসারিত করেছেন।

অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে 'পথের দাবী' একটা খোলামেলা দৃষ্টান্ত। পথের দাবীতে উপমহাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের যে প্রয়াসের কথা আছে, তার পটভূমিটি বিশ্বব্যাপী। এতে রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রামের যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাটি বেরিয়ে এসেছে, তা পথের দাবী লেখার দশকের জন্যে সীমাবদ্ধ থাকার ঘটনা নয়।

জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের যে ধারণা পথের দাবীতে এত সোচ্চার, তা 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে খুব নিচু সুরে বাঁধা হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৈঠকী আলাপের নানা উল্টোপাল্টা বিষয়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করে রেখেছেন।

কমলের মা বাঙালী, বাবা ইংরেজ। বাবার কাছেই কমলের শিক্ষা। বাবা ইংরেজ ছিলেন চা বাগানের ম্যানেজার। চা বাগানের অত্যাচারী ম্যানেজারদের একজন নয়। কমল রাজেনের সঙ্গে শরিক হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা বরং এক্ষেত্রে কমলের মানসিকতা গড়ে তুলেছিল, প্রতিবন্ধকতা করেনি। কমল এদিক দিয়ে জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার বিপ্লবী সহযোগিতা গড়ে তোলার তাগিদের মুখপাত্রী।

জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার মধ্যে যে মন দেয়া-নেয়ার কাজটা শরৎচন্দ্রের যৌবনোত্তর বয়সে বাঙালীর জীবনে শুরু হয়েছিল, তাকে এত স্বাভাবিকভাবে সামনে আনতে পারাটা শরৎচন্দ্রের বিভিন্নমুখী বিষয় নিয়ে লেখার দক্ষতার দরুণই নিশ্চয় সম্ভব হয়েছিল।

কমল ইংরেজের কন্যা এবং অবৈধ কন্যা। এত বড় অগ্রহণযোগ্য ঘটনাকেও অতি অনায়াসে শরৎচন্দ্র যে ভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করিয়েছেন, তাতে তাঁর জাতীয়তাবোধ যে অসংকীর্ণ এবং আন্তর্জাতিকতার অভিমুখী, সে কথাটাও শেষ প্রশ্নের একটা মীমাংসার প্রক্রিয়াতে রয়েছে।

পথের দাবী এবং শেষ প্রশ্নের পাশে শরৎচন্দ্রের ছবি গল্পটি রাখলে তাঁর রূপদৃষ্টির বৃত্তটিকে আরও বাড়িয়ে দেখানো যায়।

ছবির গল্পটি একান্তভাবেই বর্মী। এতে বাথিন আর মাশোয়ের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বর্মী মেজাজটিকে নিয়ে কাজ করেছেন।

এই গল্পটি একটি ইশারা। একটি আক্ষেপ। ইশারা আন্তর্জাতিকতা, যার ভিত্তি ন্যায় এবং সমতা। আক্ষেপ, এরকম কাজ আর পাইনি তাঁর কাছ থেকে।

অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও সঙ্গীত এবং সাধারণভাবে সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে একটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হিসাবে না দেখে একেবারে পৃথক করে করে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে আমাদের যার যার পছন্দমত বেছে নেবার একটা ঝোঁক তাঁর কাজের সামগ্রিকতাকে আড়াল করে দেয় এবং উৎকর্ষকে খণ্ডিত করে। অযৌক্তিক হলেও দুঃখের বিষয়, এটাই ঘটেছে বিশেষ করে চল্লিশের দশকে। এই বিভাজন ও তার ঝোঁকের মূলে কি কি কারণ রয়েছে এবং এদের অতিক্রম করার জন্যই বা কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, আমরা এদের এখানে সংক্ষেপে খতিয়ে দেখছি এক এক করে। আমাদের মূল লক্ষ্য নজরুলের অব্যাহত ও অবিভাজ্য সত্তাটিকে প্রতিষ্ঠিত দেখা।

নজরুলের বিভাজনের জন্য হয়তো নজরুল নিজেও কিছুটা দায়ী। তিনি তাঁর দীর্ঘ 'ঝড়' কবিতাটি লিখে বিশের দশকে ঝড়ের বেগে আধুনিকতম ধারার কাব্য থেকে শুরু করে নাটক উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং গণসঙ্গীত ও প্রেম ও বিরহ মিলনের গান রচনার সামগ্রিকতা থেকে সরে এসে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র বিরহ মিলন এবং আধ্যাত্মিক গানের ভুবনটিতে আবদ্ধ করলেন। তিরিশের দশকের প্রায় পুরোটাই তিনি গীতিকাব্যে তন্ময় হয়ে রইলেন এবং বাংলা গানের জগতে নিয়ে এলেন অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। চল্লিশের দশকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাই তিনি নিজে আর সামগ্রিকতায় ফিরতে পারলেন না।

আমরা প্রগতিবাদীরা কিংবা তাঁর অন্যান্য অনুরাগীরাও তাঁর সমগ্র কাজকে সামনে রাখতে পারিনি। আমরা যারা নজরুলকে শুধুমাত্র প্রেম ও বিরহমিলন ও আধ্যাত্মসঙ্গীত ও সুরসৃষ্টির কবিরূপে বেছে নেয়ার বিরোধিতা করেছি, তারা আবার নজরুলকে কেবলমাত্র গণসঙ্গীতের পুরোধারূপে অথবা 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাঁশি' কিংবা 'সর্বহারা', 'ফনিমনসা' ও 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বহুবিশ্রুত কবিতাকে তাঁর কাব্যসত্তার পরিচয়রূপে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেছি এবং এইক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যিক গুণগত উৎকর্ষ ও প্রয়াসকে জনমানসে তুলে ধরিনি। মার্কসপন্থী পণ্ডিত ও বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত চল্লিশের দশকে তাঁর একটি নিবন্ধে বাংলা কাব্যে চণ্ডীদাসের পরে কয়েক শতাব্দী শেষে আবার সবার উপরে মানুষ সত্যকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করায় কবিরূপে

নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। আমরা ডঃ দত্তের এই বক্তব্যে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। স্বভাবতই নজরুলের উদাত্ত গণকণ্ঠকেই আমরা বড় করে দেখেছি। চণ্ডীদাসের মতোই নজরুলের কাব্যেও যে প্রেম ও বিরহমিলনের গানের দিকটাও বড়, সেটা আমরা একধরনের গীতি কবিতার সমঝদারদের এক্তিয়ারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই সমঝদাররাও আলাদা করে একটি নজরুল-গীতির ভুবন তৈরি করে নেন এবং আজও তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন যে তাতে নজরুল কাব্যের কাড়ানাকাড়া অচ্ছুত।

এইভাবে আমরা নজরুলের অনুরাগীরা কবিকে ভাগ করে নিয়েছিলাম।

নজরুলের প্রতিপক্ষীয়রা এই সুযোগ ছাড়েনি। তারা ফাঁক খুঁজে আসছিল।

জাতীয় স্বাধীনতা, শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সংহতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতা, সাম্য এবং সমাজতন্ত্র এবং ব্যক্তিক ও যৌথ মুক্ত ধর্ম ও কর্ম-জীবনের লক্ষ্যে নজরুল ছিলেন একরোখা ও আপসহীন সংগ্রামী। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকেরা যেমন তাঁর কাব্যকে পদে পদে খর্ব করার জন্য তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ করেছে, তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানাভাবে তাঁকে হেনস্তা করেছে। এতে অবশ্য নজরুলের বিপ্লবী কাব্যের গতি শ্লথ হয়নি। স্বাধীনতাসংগ্রামী স্বদেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সমাদর করেছেন এবং তিনিও চারণের বেশে জনগণের জীবনের গান গেয়েছেন। বিশের দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে গীতিকবিতা রচনা করার দিকে ঝুকলেও তিরিশের দশকেও তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টির জনপ্রিয়তা জারি ছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রতিপক্ষীয়রা তাঁর অসুস্থতার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে অনুপস্থিতির সুযোগে বিশেষ করে তাঁর কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ ও সামগ্রিকতার উপর আক্রমণ চালায়। এরা তাঁর কবিতার কাজকে হতমান করার জন্য একটা আওয়াজ তোলে যে, নজরুল কাব্যে কিছু কিছু কবিতা নন্দনতাত্ত্বিক মানদণ্ডে টিকলেও সাধারণভাবে তাঁর কাব্যে গুণগত উৎকর্ষের অভাব রয়েছে। এরপরেই ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়াতে বিপ্লবী ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা নজরুল সাময়িকভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। অতঃপর যে সব মহল তাঁকে একসময় কাফের আখ্যা দিয়েছিল তারাই তাঁকে শুধুমাত্র তাঁদের কবিরূপে বাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য তাঁর কোন কোন কবিতার শব্দ পর্যন্ত বদলে দেবার চেষ্টা করে।

চল্লিশের দশকের মহাসন্ধিক্ষণে আমরা প্রগতিবাদীরা ও অন্যান্য অনুরাগীরা আমাদের সাময়িক ঘাটতির দরুণ এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারিনি। তবে নজরুলের অথবা আমাদের জীবনে এটা একটা স্থায়ী বিপত্তি হয়ে দাড়াতে পারেনি।

পঞ্চাশের দশকেই শুরু হয়েছে নজরুলের কাব্যিক গুণগত উৎকর্ষ ও সামগ্রিকতা বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পালা। প্রথমেই উল্লেখ্য যে, যখন বিপত্তি চরমে পৌঁছেছিল, তখনই নজরুল কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ এবং তাঁর সমগ্রসৃষ্টির অবিরত প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহল থেকে খোঁজ খবর শুরু হয়ে যায়। এই অনুসন্ধান থেকে বোধহয় সর্বপ্রথম ডঃ সুশীল গুপ্ত নজরুল সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাপত্র বই-এর আকারে প্রকাশ করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই ধারা এরপর পঞ্চাশের দশক থেকে এ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, অধ্যাপক আতাউর রহমান, ডঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব আজহারউদ্দিন খান, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ নজরুল কাব্যের উপর নানাভাবে আলোকপাত করে তাঁর কাব্যিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অবিরত প্রাসঙ্গিকতাকে সামনে এনেছেন। এঁদের পাশাপাশি অথবা কিছুটা আগে থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' এবং 'কল্লোল যুগ' নামের দুটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে নজরুল কাব্যের অপরিহার্য এবং অবিভাজ্য রূপটিকে সংবেদনশীল মন নিয়ে প্রধানতঃ নান্দনিক দিক দিয়ে সামনে এনেছেন। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নিজস্ব ধারায় নজরুলের নান্দনিক নবমূল্যায়ন করেছেন। নজরুলের সৃষ্টির এই গুণবিচার আরও বহু সংকলন ও গ্রন্থের মাধ্যমে ঘটেছে। উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহকে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা হলো এখানে।

নজরুলের অব্যাহত, প্রতিনিয়ত, অবিভাজ্য ও অপরিহার্য কাব্যিক উপস্থিতি অবশ্য পুঁথিপত্র নিবন্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই নিবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশে গণ-অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে পঞ্চাশের দশকেই বাংলাভাষায় বৈপ্লবিক গণপ্রতিষ্ঠা নজরুলের সমগ্র সৃষ্টির পুনঃপ্রকাশের দুয়ার উন্মোচিত করে দেয়।

৫২'র পরে তিন দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে এই সূত্রেই একটা বড় ঘটনা, নজরুলের সমগ্র রচনাসম্ভার সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ এনামুল হকের পরিচালনায় ও কবি আব্দুল কাদিরের সম্পাদনায় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পরে বাংলা একাডেমী যথাক্রমে সমগ্র নজরুল রচনাসম্ভার এবং পাঁচ খণ্ডে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে। একটা চিরকুটও অবজ্ঞাত হয়নি। আজ আর নজরুলকে নিয়ে হাওয়ার উপর কথা হবার নয়।

এইভাবে কাব্যিক উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই হোক অথবা প্রামাণ্যতার দ্বারাই হোক, একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নজরুলকে হতমান কিংবা খণ্ডিত করে দেখানো আর আগেকার মত সহজ থাকছে না।

অবশ্য নজরুলের এই সামগ্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র পুঁথিপত্রের উপর নির্ভরশীল বিচার ও বিতর্কের ঘটনা নয়। উপরোক্ত দুটো প্রয়াস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ও উৎসাহিত হয়েছে নজরুলের উপস্থিতির প্রচ্ছন্ন হলেও অব্যাহত

বিশেষ ধারা থেকে। ৪৭'-এর পরে দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যখনি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তখনি যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো নজরুল নতুন করে জেগেছেন ও জাগিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমাদের উপমহাদেশ ও বিশ্বের উপর দিয়ে প্রবাহিত যে সব অভাবিত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে এসেছি, তাতে নজরুলের বিশেষ করে বিশের দশকের চাপা পড়া কালের অন্তঃস্রোত বেরিয়ে এলেও কিভাবে তা কার্যকর হতে পেরেছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ হতে পারে।

নজরুলের বহুধা বিকশিত কাজ যে ঝড়ের মত উঠেছিল এবং ঝড়ের মতো নেমে গিয়েছিল তার একটা বড় কারণ এটা যে, নজরুলের উদাত্ত ও কোমল সমস্ত ধরনের কাজ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটে আমাদের উপমহাদেশে অভূতপূর্ব সার্বিক ও সর্বস্তরের বৈপ্লবিক গণ অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা শৃঙ্খল ও শোষণমুক্তির সমস্ত রং-এর ও রূপের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান ধারণার ব্যঞ্জনা। এই গণঅভ্যুদয় স্থায়ী হয়নি, তাই নজরুলও ভাটার টানে সংক্রামিত হয়েছিলেন। কিন্তু যে বাস্তবতা ও যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান ধারণা নিয়ে বিশের দশকে গণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারা তিরিশের দশকের দিকে আরও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী নতুন অভ্যুদয় তরঙ্গে এরা আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও উত্থানের পর উত্থান দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতের ডাক পড়েছে নতুন করে বারংবার।

এইভাবে নজরুলের কাব্যের অন্তঃস্রোতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিশের দশকের কাজের অনন্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ী ভাবের অবদানগুলিকেও অবলম্বন করে। নব নব উত্থানে নজরুল উপস্থিত হয়েছেন তাঁর অনন্য ও সমবায়ী কাজের সমন্বিত ক্ষমতা নিয়ে। আরও সহজ করে কথাটাকে বললে বলা যেতে পারে, নজরুল উপস্থিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও কল্লোল যুগের কবিদের নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে আমরা নজরুলের অনন্য ও সমবায়ী দুটি দিক সম্বন্ধে দুয়েকটা দরকারী কথা বলে নিতে পারি।

বিশের দশকে নজরুলের অনন্যতা ছিল বিশেষ করে এই দিক দিয়ে যে, তিনি তার কাব্য ও সঙ্গীতের ও অন্যান্য সমস্ত রূপাধারের মাধ্যমে বিশের দশকের উপমহাদেশের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের তিনটি প্রধান ধারাকেই সমন্বিত-ভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন। এই তিনটি ধারা ছিল বাংলার অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়াস, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনেই মন্থিত হয়েছিল উপমহাদেশের সমস্ত

রকমের অবনতস্তরের মানুষ—মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, নারী সমাজ। এদের সকলের আশা আকাঙ্ক্ষাকে একসঙ্গে বিন্যস্ত করতে পারার বুকের পাটা তাঁর ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'বিদ্রোহী' কবিতা কিংবা 'সর্বহারা' কাব্যের লোকায়ত বহুত্বের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, তিনি তার সৃষ্টিকে কত ভাবে কত খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংঘবদ্ধ গণ অভ্যুত্থানের কবি হিসাবে কাজে নামেন বলেই নজরুল যুগের কাব্য ও সঙ্গীত তথা সাহিত্যকে একা একা রূপ দেবার কথা ভাবেননি। তিনি ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি'-র কাজী মোতাহার হোসেন. কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। নজরুল তাঁর সমকালীন কবি ও কথাশিল্পীদের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। নজরুল তাঁর উঠতির মুখেও রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কল্লোল যুগের গোকুল নাগ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে অকুণ্ঠভাবে নিয়েছিলেন। আবার তিনি সমসাময়িকদের উপর তাঁর নিজস্ব ধারার প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। এমনকি তিনি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেন। বিশের দশকের এই সমবায়ী ব্যাপারটাও সেই সময় সাহিত্য কৃতিত্বে বিশ্ব ও উপমহাদেশের ক্রান্তিকালের ব্যঞ্জনা জুগিয়েছিল। স্বভাবতই যেহেতু অনেক বেশি বড় পরিমাপের ও গভীরতর মুক্তিসংগ্রাম বিশের দশকের অভ্যুদয়েরই প্রসারিত রূপ, সে জন্য নজরুলের সমবায়ী সত্তাটির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে নতুনতর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

শুধু দল বেঁধে ফিরে আসা নয়, তিরিশ ও চল্লিশের দশক থেকে বাংলা কাব্যে, সঙ্গীতে তথা সমগ্র সাহিত্যে যে নতুন নতুন ছোট বড় কাজ হয়েছে গণ উত্থানের পর গণ উত্থানকে ভাষা দিয়ে, তাতেও নজরুল সহকারী রয়েছেন। তাঁর একটা বিশেষ কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নজরুল আধুনিকতম কবিতাকেও গণমুখী করে এর চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিলেন কল্লোল যুগের সাথীদের হাতে। এই গণমুখী রীতিতে যেমন 'অগ্নিবীণা'র উচ্চভাষিতা ছিল, তেমনি 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোমলতা ছিল। নজরুল শুধুমাত্র একজন সহজিয়া স্বভাব কবির প্রেরণাকেই সম্বল করেননি, তিনি অনেক মাজাঘষাও করেছেন গণমুখী আধুনিক কবিতা লিখতে বসে। বিশের দশকে তাঁর এই সামগ্রিক গণমুখী আধুনিকতা সংক্রামিত হয়েছিল সমসাময়িক কবিদের মধ্যে। উত্তরসূরী সুকান্তের হাতে এই ধারা পৌঁছেছিল তিরিশের দশকের অন্য আরও কয়েকজনের নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে। সুকান্ত এই গণমুখী আধুনিকতম পরিশীলিত ধারাকে একেবারে যেন জন্মেই অনায়াসে তুলে নিয়ে বিশের দশকের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন। এজন্য আরও বেশি দাপটের প্রয়োজন হয়েছে। সুকান্তও মাজাঘষা কম করেননি।

তবে উত্তরাধিকার এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এই উত্তরাধিকারে নজরুল সপ্তর্ষির একটি তারা।

হাল আমলের দুইবাংলার কবিরাই বলবেন এবং দেখবেন, নজরুলের গণমুখী আধুনিকতায় তাঁরা কতটা সংক্রামিত। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কাব্যের কর্মী ও জহুরীরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে বলবেন ও দেখবেন, কারণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্য তার গণমুখিতার জন্য চিহ্নিত হয়েছে।

মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ

১

দুটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করা দরকার সর্বপ্রথম।

প্রথমত, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ কি সত্যই ব্যক্তিজীবনে কোন অগ্রসর উদ্দেশ্য থাকার বিরোধী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি কি স্বদেশে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোনো মানবিক সামাজিক উত্তরণকে আমল দিতে চাননি?

মার্কসবাদের দৃষ্টিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখাকে ইতিবাচকরূপে গণ্য করতে হলে এই দুটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর কারণ এই যে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে একটা জোর প্রচার, তিনি জীবনের অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণকে অস্বীকার করেছেন, তিনি অবিপ্লবী। অথচ মার্কসবাদের দৃষ্টিতে ইতিবাচকতা দাবি করে জীবনের অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণের অনিবার্যতা। মার্কসবাদ হচ্ছে বিপ্লবী দর্শন। মার্কসবাদ একটি অগ্রসর উদ্দেশ্যভিত্তিক মানবীয় জীবনদর্শন। এই উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত মানবসমাজ। সুতরাং কোনভাবেই ব্যক্তিজীবনকে ভেসে চলতে বলতে পারেনা মার্কসবাদ। ইতিহাসে বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের অব্যাহত ধারায় আসে ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্যপ্রবণতা। বিশ্বজগতের একটা বিশেষ গতিধারা আছে। এই গতিধারা অবিশ্রান্ত বিকাশের দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি ধারা, পরিমাণগত থেকে গুণাত্মক পরিবর্তনে উত্তরণ। শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরে উত্তীর্ণ হওয়া। সমাজবিপ্লব এই অবিশ্রান্ত উত্তরণেরই অবিশ্রান্ত প্রকাশ। মানবমানবীর অগ্রসর উদ্দেশ্যের সম্মতি আসে এখান থেকেই। নবজাত নক্ষত্র আর নবজাত চরিত্রের মানবমানবীর সত্তার বিকাশের সাযুজ্য রয়েছে এখানে।

মার্কসীয় দর্শনের এই ধারা স্বভাবতই কোন কবিকে ইতিবাচক বলে নির্দিষ্ট করলে তাঁর কবিতার মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতা ও উত্তরণহীনতার প্রাধান্যের পরিবর্তে থাকা চাই অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণের প্রবণতা।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধেও এই বিচার প্রযোজ্য।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সংশয়ের ধোঁয়া সৃষ্টি করে রেখেছে মার্কসবাদের বিরোধীরা। এরাই প্রচার করে এসেছে, কবির কোন অগ্রসর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বিপ্লবের প্রয়োজনবোধের বিপরীত জগতে বাস করতেন।

এই ধোঁয়া থেকে জীবনানন্দ দাশকে বের করে আনতে হবে তাঁকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিবাচক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

২

এখানে প্রথমে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কবির লেখাতে অগ্রসর উদ্দেশ্যের প্রবণতা উদ্দেশ্যহীনতাকে কিভাবে পিছনে ফেলে এসেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক ;

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাব
আবার কি ফিরে আসবনা এই পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হীন কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।
(কমলালেবু—বনলতা সেন)

এখনে উল্লেখ করা দরকার, 'বনলতা সেন' কাব্যের সেই 'অন্ধকার' কবিতার পরেই এ কবিতাটি, যেখানে কবি বলেছেন, 'কোনোদিন জাগবনা আমি কোনোদিন আর'। কমলালেবু কবিতাটি 'অন্ধকার' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। নেতির বিরুদ্ধে ইতি। 'কমলালেবু' কবিতাটি যে ব্যতিক্রম নয় তার আরও প্রমাণ ঃ

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকাল বেলায়
কোনো এক কবি বসে আছে ;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে ;
তবুও সে প্রীত অবহিত হয়ে আছে
এই পৃথিবীর রোদে—এখানে রাত্রির গন্ধে নক্ষত্রের তরে।
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সমভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ।
মিশে গেলে ; জীবনকে সকলের তরে ভাল ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হতো।
(পৃথিবীতে—অন্যান্য কবিতা)

জীবনানন্দ দাশ নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানব বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এবং যে ধারণাকে

মার্কসবাদের বিরোধীরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে, উপরোক্ত উদ্ধৃতি তার প্রতিবাদ।

বিচ্ছিন্ন আত্মবোধ যে তাঁর কাছে বরং ধিক্কারই পেয়েছে তারও প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে এখানেই ঃ

প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব সাগরে।

(তোমাকে—বেলা অবেলা কালবেলা)

ব্যক্তির ক্ষয়বোধও মানবকে যে ক্ষয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে না সে সম্বন্ধে দিয়েছেন তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ঃ

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর ব্যঞ্জনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধ'রে চলে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে,
মানব ক্ষয়িত হয়না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।
ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে।

(যতদিন পৃথিবীতে—ঐ)

নৈরাশ্যবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ এ ধরনেরও একটা ধারণাকে মার্কসবাদ বিরোধীরা ছড়িয়ে এসেছে। অপরদিকে যেহেতু মার্কসবাদীরা পুরানো জীর্ণ পৃথিবীর খোলস সরিয়ে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করতে চায় ইতিহাসের গতিপরিণতির বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ থেকে উপকরণ নিয়ে এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশের মধ্যে থেকেও কবিতার মধ্যে তারা সংগ্রহ করে আশাবাদকে, সেই কারণে জীবনানন্দ দাশের কবিতার মধ্যেও তারা নৈরাশ্যের বদলে আশাবাদকে খুঁজবে এটাও স্বাভাবিক। জীবনানন্দ দাশ নিরাশ করেননি মার্কসবাদীদের।

'বনলতা সেন' কাব্যের 'অন্ধকার' কবিতা পড়ে মনটা মুষড়ে যায়, কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থের 'অন্ধকার থেকে' কবিতায় সমস্ত নৈরাশ্য কেটে যায়। 'অন্ধকার থেকে' কবিতা ব্যতিক্রম নয়। তার প্রমাণ ঃ

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে,
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ে ঝরা সোনার মতন

সূর্য তারা বীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন ; আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর কর—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আনো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে ;
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ ;
সকালের নীল কী পাখিজল সূর্যের মতন।
(একটি কবিতা—বেলা বেলা কালবেলা)

কিংবা,
নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার খোপে
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।
(উত্তর প্রবেশ—সাতটি তারার তিমির)

আরও আছে,
আমাদের হাড়ে এক নিধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময় স্রোতে চলিতেছি ভেসে,
তা নাহলে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
(কবিতা—সাতটি তারার তিমির)

আরও আছে,
বড় বড় সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্র ষার জল, সূর্য মানে
এখনো নারীর মানে তুমি কত রাধিকা ফুরালো।
(মিতভাষণ—সাতটি তারার তিমির)

আর,

দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙ্গে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে ;
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।
এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানিভুল চিন্তাসংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শাখে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

(পৃথিবীলোক—মহাপৃথিবী)

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিচারে নেমে উপরোক্ত আশাবাদকে আমরা অসংখ্য ঢেউয়ের মতো উদ্বেলিত দেখতে পাবো।

তবু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে জীবনানন্দ দাশের মধ্যে যে দ্বন্দ্বও রয়েছে সেটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে, কারণ জীবনানন্দ দাশও তো একটা ক্রান্তিকালের ইতিহাসের নানা ধারায় প্রসারিত বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ সৃষ্টি, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, যদিও আক্ষেপ নেই। সংশয় রয়েছে? আমরা বলবো যাচাই করে নেওয়ার কঠোরতা রয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কোন কোন কবিতায় বলেছেন, 'আমাকে জাগিওনা, আমাকে ঘুমোতে দাও।' কিন্তু জীবন কি কবিকে কোনদিন ঘুমোতে দিয়েছে? দেয়নি, দিতে পারে না, কবিও তা জেনেছিলেন এবং বারংবার বলেছিলেন সেকথা। কোন কোন সময়ে ক্লান্ত হয়ে জৈবিক প্রয়োজন থেকেই যেন ঘুমোতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘুমোতে পেরেছেন কি? ঘুম আসেনি। উদাহরণ ঃ

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে
ঘুমের সাধ ভালবেসে।

(অবসরের গান—ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আরও,

ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুলফোটে হেমন্তরাগে ;
সময়ের এই স্থির একদিক তবু স্থিরতর নয় ;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

(লোকেন বোসের জার্নাল)

স্তিমিত-স্তিমিত আরো করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

(রিস্টওয়াচ—সাতটি তারার তিমির)

আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি/কাঁচের গেলাসে উজ্জল শফরী ; সমুদ্রের দিবালোকে আরক্তিম হাঙ্গরের মতো তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে যা হচ্ছে হতেছে অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে। /সৃষ্টির নাড়ির পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়/অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ/তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

(আবহমান—মহাপৃথিবী)

আরও,

কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে।
উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে ?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নবসৃষ্টি মরালের মতো কল-
স্বরে কেন কথা বলি ; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশ হংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

(তবু)

এই কবিতাগুলিতে জীবনের উপকরণগুলি পরস্পর বিরোধী। কিন্তু এ যে উপলাহত নদী। উপল না থাকলে নদী শব্দিত হতো না। কিন্তু সময়ের দিকে এগিয়ে চলা তো স্তব্ধ হয়নি। অবশ্য কোন কোন কবিতায় মনে হয়, পরস্পর বিরোধিতা কি অচলতা এনেছিল ? যেমন,

এখন শীতের রাত্রে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
.... তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান-বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু করে
হেগেল ও মার্কস ; তার ডান আর বাম কান ধরে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো ; এমন সময়
দুপকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
ওদের চেয়েও ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম ;
.........কোথায় যে আঁচলের খুঁট ;
কেবল উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট—
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু ব্লক অথবা রায়ের বোঝা বয়ে,

ত্রিপাদ ভূমির পারে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তাহলে তা প্রেম নয়, ভেসে গেল ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে বলে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিল টান।
(অনুপম ত্রিবেদী)

কিন্তু এ কবিতার মূল সুরটি হচ্ছে যেন গভীর বেদনায় ভরা বিজ্ঞানীর কৌতুক। প্রেমের জন্যে আত্মহত্যাকে একটা স্খলন বলেই কবি সব সময় মনে করেছেন। জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক মহাস্রোত ধারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াকে বারংবার কবি যাচাই করে দেখেছেন। তাঁর 'লাশকাটা ঘরে' কবিতাটি একই সুরে লেখা। এই জন্যেই কি দ্বন্দ্বাত্মক গতিবাদের দর্শনকে নিয়ে তিনি কৌতুক করেছেন ?

প্রেম সম্বন্ধে এখানে তিনি সাবধানী অভিভাবকের ভূমিকায় নেমেছেন।

কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে এই সাবধানতাও কবির পক্ষে কয়েকটা বিশেষ মুহূর্তের ভাবনার ব্যাপার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের সুদীর্ঘ 'প্রেম' কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে, প্রেম পদস্খলনের ব্যাপার নয়। প্রেমই জীবনকে ব্যাপ্ত করে আছে। প্রেম একটি স্রোতস্বিনীর মতো বয়ে চলেছে কবির লেখায়—সে হচ্ছে যৌবনের স্রোতস্বিনী, নবজীবনের স্রোতস্বিনী।

ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
চলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের
ডানায় উড্ডীন কলরোল,
আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।
(সময়ের তীরে—বেলা অবেলা কালবেলা)

আরও আছে,

এইখানে স্মৃতি ;
এখানে বিস্মৃতি ; প্রেম
ক্রমাগত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।
(অনেক নদীর জল—বেলা অবেলা কালবেলা)

এখানে যে বৈপরীত্য—এটা জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক অগ্র-গতিধারারই প্রকাশ।

বস্তুতপক্ষে, অনুপম ত্রিবেদী কবিতার ডায়ালেকটিক বা বিপরীত পারস্পরিকতা যে সাময়িক বিমূঢ় অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা নিতান্তই সাময়িক।

জীবনানন্দ দাশের ডায়ালেকটিক বা বিপরীত পারস্পরিকতা একটা অগ্রসর গতিবাদেরই পরিপোষক।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের সময়ের কাছে কবিতাটি এই দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারারও প্রকাশ, যা লেনিনকে অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে সামনে আনতে দ্বিধা করেনি ঃ

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে,
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সুর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবেনা কি মানুষকে চিনে তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে--'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষন্ন হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

৪

জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের অসংখ্য কবিতাতে রাত্রি, তিমির, অন্ধকার যেন কাদার মতো থকথকে হয়ে আছে, যা পার হয়ে যেতে হয় 'পরস্পর' কবিতার রূপকথার রাজ্যে পেঁছিতে হলেও। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে রাত্রির প্রাচুর্য কি তাহলে সাদা রং দিয়ে ছবি আঁকার জন্য কালো পটভূমি ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ কবিকে জীবনের কোন রঙীন স্বপ্নেরই গীতিকার হয়ে থাকতে দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামানের ছায়ায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি পড়ে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, কত রূঢ় হতে পারতেন কবি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে সে কথা ভেবে। কবি সমস্ত সত্যের কবি হতে চেয়ে সমগ্র জৈবিক অনুভূতিতে এই পৃথিবীকে, দেশকে, নারীকে, বুঝতে

চেয়েছেন। সেজন্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' 'পিপাসার গান' অথবা 'বনলতা সেন'-এর 'ঘাস' কবিতার মতো কোন কোন কবিতায় মানবদেহের পার্থিবতার বা বস্তুসত্তার বা স্বভাবসত্তার প্রায় শেষ কথাই বলে ফেলেছেন গ্রীক অণু-দার্শনিকদের মতো ; অণু-দার্শনিকের ভাষায় নয়, কবিতার ভাষায়।

কিন্তু এই অন্ধকার অথবা জৈবিকতা অথবা স্বভাবত্ব অথবা অণুকাব্যিকতা কি প্রকৃতপক্ষে আলোর রং নিয়ে জীবনের ছবি আঁকবার জন্যে অন্ধকার পটভূমি নয় ?

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতাটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত এমন শক্তিময় কবিতা আমাদের বাংলা কাব্যে বিরল।

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল অসংখ্য নক্ষত্রের রাত।
যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

এই 'হাওয়ার রাত' কবিতার পাশে একই কাব্যগ্রন্থের 'বেড়াল' কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারকে নিয়ে যে খেলা করেছেন সেটিও এখানে উল্লেখযোগ্য ;

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারার অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো
থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

তর্ক হতে পারে, এ দুটি কবিতাই প্রকৃতি-নিবদ্ধ। তা' ঠিক। প্রকৃতি নিবদ্ধতা জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কাব্যের একটি বিশেষত্ব হতে পারে। পাখি—সে সিন্ধু সারসই হোক, শকুন হোক, পেঁচা হোক, ডাহুক হোক, শালিক হোক, হাঁস হোক-এরা হচ্ছে কবির কাছে জীবনের স্পন্দনের প্রতীক। তবু কোন কোন সময়ে এরা প্রকৃতির বিস্তারকে কবির মানসিক পরিমণ্ডলকে ছাড়িয়ে অসীমতায় স্থাপন করেছে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের উপরোক্ত দুটি কবিতাতে তারই আভাস।

কিন্তু যেমন 'বনলতা সেন' কাব্যে, তেমনি 'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই, 'রূপসী বাংলা'তে তো নিশ্চয়ই—মানবীয় পরিমণ্ডলকে প্রধান করে দেখতে চাইলেও আমরা হাতের কাছেই দেখতে পাবো। সে মানবীয় পরিমণ্ডল কোন আত্মনিবদ্ধ কবির ভাবপ্রক্ষেপণের ছায়া নয়, সে হলো ইতিহাসের বিকাশমান মানবসমাজ। আগেই দেখাতে চেষ্টা করেছি, জীবনানন্দ দাশ বিচ্ছিন্নতা ও অমানবিকতার প্রচারণাকে রূঢ় আঘাত করেছেন। এখানে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দাখিল করছি ঃ

> গম্ভীর, গম্ভীরতর রাত্রির বাতাসে
> লোকার্ণো হের্ব্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
> ইউ, এন, ও-য়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাস কূটবিষ
> আরো ঘুম রয়ে গেছে হৃদয়ের—জীবনের, নারী,
> শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য
> বেদনা বিমূঢ়তা লাঞ্ছনায় অবতার রয়ে গেছে ; রাত
> এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
> রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে মাঝে বদ্ধ সোক্রোতেস
> কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
> আলোকিত হতে চায় ; বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
> নিচে আরো নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;
> পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
> তবুও ফেনার ঝর্ণা,—রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয় মানুষের মন।
> সহসা আকাশ পথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
> কি রকম সাহসিক চেয়ে দেখে, সূর্যের কিরণে
> নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
> অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায়
> ইতিহাস পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু অগণন অর্ধসত্যের
> উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
> সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
> অগ্রসর হতে চায় অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

(পৃথিবী সূর্যকে ঘুরে—বেলা অবেলা কালবেলা)

এ কবিতাটিতে মহাবিপ্লবী লেনিনকে কবি কোন সাধকদের মধ্যে রেখেছেন সেটা বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয়। লেনিনকে এর আগের একটি কবিতার স্তবকেও আমরা একইভাবে পেয়েছিলাম।

লেনিনকে জীবনানন্দ দাশ মানব-জীবনের অন্যতম শিল্পী-শ্রেষ্ঠ হিসেবেই দেখেছিলেন।

আরেকভাবেও জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি নিবদ্ধতা বিকিরণের মানবিকতায় উৎসাহিত হয়েছে সেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি ;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিগলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা ;
আমার লক্ষ্য ছিলো মানষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী করে মানুষও মানুষীর মতো করে রাখে।

(সারাৎসার ঃ বেলা অবেলা কালবেলা)

আরেকভাবে ঃ

আশ্চর্য বনের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী,
ছড়ায়েছি খই ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেকদিন,-দেখিয়াছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে—এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচা পোকাটিপ তুমি কপালের পরে
পরিয়াছ....তারপর ঘুমায়েছ, কল্কাপাড় আঁচলটি ঝরে।
পানের বাটার পরে, নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি
নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ।

(রূপসী বাংলা)

এই রূপসী বাংলা শুধু বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণের বাংলা নয়। এ বাংলা ছোট ছোট ঘরের বাংলা, মানবমানবীর বাংলা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাংলা, যেখানে ঝড় আসে। কিশোরীদের নিয়ে রচিত গীতিকবিতার বাংলা। সেই নারীদের বাংলা, যাদের হাত চাল ধুতে ধুতে শিঠে শাদা হয়ে গেছে। এখানে স্বাধীনতারও ডানার ঝাপটা।

আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও,
আমি যে বনের হীরামন

(রূপসী বাংলা)

৫

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস পাই না, যদিও মানুষের সমগ্র ইতিহাসে তিনি যেন লিফটে ওঠা নামার মতো অতীতে বর্তমানে ইচ্ছামতো বিচরণ করেছেন। 'ইতিহাস যান' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তবে মানুষের ইতিহাসকে তিনি দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতিধারার ছাঁচে ঢেলেই প্রবাহিত করে দেখেছেন। এর পিছনে বিশ্বজগতের সেই গতিধারাকে ছন্দিত

দেখেছেন তিনি যাকে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির ডায়ালেকটিক্স বা দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক গতিধারা' গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করা যায়। মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর কবিতা তিনি লেখেননি। অথবা একজন বিঘোষিত বস্তুবাদী হিসেবে তিনি প্রকৃতি ডায়ালেকটিক্সকে সামনে আনেননি। সমাজবিপ্লবের চাবিকাঠি হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি বোঝেনওনি দেখতেও পাননি। কিন্তু মার্কসবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজবিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ। মার্কসবাদীরা যে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চাইছে তার অঙ্গীকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থিত। কাঁটার ঝোপে ফুলের মতো ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদী রীতির গণকথাশিল্পী ও কমিউনিস্ট রূপে চিহ্নিত, আদৃত ও বিতর্কিত।

অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের গণকথাশিল্পী হিসেবে ফরাসী উপন্যাসের কারিগর আঁরি বারবুসে ও লুই আরাগঁ যেমন করে কমিউনিস্ট হয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইভাবেই কমিউনিস্ট। অতি আধুনিক রীতির কবি পাবলো নেরুদা এবং বার্টোল্ড ব্রেখ্‌টের কমিউনিস্ট হবার ধরনটির সঙ্গেও তাঁর মিল রয়েছে।

এঁরা প্রত্যেকেই জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গিত করে প্রায় একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন অতি আধুনিক রীতিতে। সামান্য ও অসামান্য নির্বিশেষে এবং বিশেষ করে সামান্য ও সামান্যা মেহনতী মানব-মানবীদের নিমগ্ন মনের সম্ভাবনা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মাধুর্য এবং বৈপ্লবিক ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করাই এঁদের অতি আধুনিকতার রীতি। বিশ্ব জুড়ে এই ধারা গড়ে উঠেছে একই সঙ্গে চূড়ান্ত সংকট ও পরিবর্তনময় বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে ভাব-সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি ভাব-প্রগতিও সক্রিয়। পরিবর্তনবাদী বিদ্রোহী লেখক লেখিকারা মুক্তিসংগ্রামী জনগণের অগ্রপদক্ষেপে শরিক হয়ে আধুনিকতম রীতিকে গণবোধ্য ও গণ-গম্য করে স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে আলো ফেলে। ভাব সংকটের চক্রকে অতিক্রম করে ভাব-প্রগতিকে এরা এগিয়ে নিয়েছেন। বাংলার এই ধারার প্রবর্তক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এইবিপ্লবী বাস্তবতাবাদের অনন্য সাধক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে এ কারণে যে, তিনি বস্তুতপক্ষে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সেই একমাত্র লেখক যিনি বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী ও অন্যান্য সন্নিহিতদের জীবনে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার রদবদলের সমস্ত প্রকাশ্য ও অন্তঃশীল অভিঘাতকে চিত্রিত

ও ধ্বনিত করেছেন বিশের দশকের বাংলায় সদ্য প্রবর্তিত কাঁচা ও আকাড়া অতি আধুনিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পরিপূর্ণাঙ্গ করে তুলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দারিদ্রের জালে আবদ্ধ পদ্মা নদীর একান্তভাবে গায়ে-গতরে খেটে খাওয়া জেলেদের মনোবেদনার উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' কিংবা আলোকিত কলকাতা মহানগরীর ছায়াবৃত উপকণ্ঠের বাসিন্দা শ্রমজীবী ও মজুরদের কারখানা-জীবন ও ঘরভাঙ্গা ও ঘর বাঁধার একই সঙ্গে যাযাবরী ও সাংসারিকতার উনুন পাতার উপন্যাস 'শহরতলী', কিংবা চাষীর ঘরের কেশবতী নারীর জীবনে দুর্ভিক্ষের হানা এবং তার ন্যাড়া হবার কাহিনী নিয়ে লেখা ছোটগল্প 'নেড়ি'তে রয়েছে এই অতি আধুনিক রীতির রক্তক্ষরা স্বাক্ষর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচেছিলেন ৪৮ বছর। লেখা আরম্ভ করেছিলেন ২০ বছর বয়সে। এর পরে ২৮ বছর একটানা লিখেছিলেন। লেখাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন এবং নিজেকে 'কলমের মজুর' বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রায় ৪০টি উপন্যাস ও আড়াইশ ছোটগল্প, একটি কবিতার বই লিখেছিলেন ২৮ বছরের মধ্যে। শ্রমসাধ্য ও অবিশ্রান্ত ছিল তাঁর কাজ। নিজেকে আরাম দেয়া দূরে থাকুক দুঃখই দিয়েছেন তিনি বরং।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকজনকে পাওয়া যাবে বাংলায়, যাঁরা সাফল্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সময়টিতে বৈচিত্র্য যেমন যথেষ্ট, তেমনি উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখকলেখিকার সংখ্যাও হয়েছে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশের এবং তিরিশের দশক জুড়ে অবস্থান করেছিলেন এবং এমন কয়েকটি নামী উপন্যাস লিখেছিলেন এই সময়েই যেগুলি অতি আধুনিক রীতিকে এবং সামান্য ও সামান্যাদেরও নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছিল বলে এইসব লেখা সত্তরের দশকেও সজীব। তাছাড়া, অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছিল যে 'কল্লোল', তার লেখকেরা সত্তরের দশকেও সক্রিয় রয়েছেন। দৃষ্টান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু বিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত অতি আধুনিকের গণকথার ধারায় 'চিন্তামণি,' 'দর্পণ', 'স্বাধীনতার স্বাদ' এবং 'হলুদ নদী সবুজ বন' ও অন্যান্য উপন্যাস লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এতে একটা 'কট্টর' ভাব এসে পড়তে বাধ্য। উপন্যাস ও ছোট গল্পের মতো সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি নিয়ে লেখায় কট্টরতা বিপজ্জনক। সুতরাং, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটানা একই লক্ষ্য নিয়ে লেখাতে শিল্পরূপের উৎকর্ষের ক্ষতি হয়েছে কিংবা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উঠতে পারে অবশ্যই। ফলাফল বিচার্য নিশ্চয়। এই জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতর্কের উর্ধ্বে স্থাপন করবো না। কিন্তু তাঁর

লেখার বিচারে সার্থক বৈপ্লবিক ইতিবাচকতাই বিচার্য হতে বাধ্য। এই ইতিবাচকতা তাঁর অপরিমেয় অধিকাংশ লেখার অভিধা।

বস্তুতপক্ষে সমস্ত রকমের বিপর্যয় সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীতে নিপীড়িত মানষের অভ্যুত্থান ফলপ্রসূতার দিকে এগিয়েছে এবং এই অভ্যুত্থানের যারা লেখকলেখিকা হয়েছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে বিপর্যয়ের মধ্যেও মনুষ্যত্বের অগ্রগতি রেখা আঁকতে পেরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছেন অতি আধুনিক হিসেবে।

তাঁর অতি আধুনিকতা, সাম্যবাদ ও গণাত্মকতার বিকাশ এবং তাঁর লেখার সময়ের বিপ্লবী গতিধারা পরস্পরের পরিচায়ক।

২

সঙ্কটে বর্ধিত ও বিপ্লবে উত্তরিত বিশ শতকের বিশের ও তৎপরবর্তী তিন দশকের সমস্ত যন্ত্রণা ও সমৃদ্ধিরই যেহেতু রূপায়ন ঘটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প ও উপন্যাসে, সেজন্যে তাঁর রচনাবলী ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনা ও আকর্ষণবিকর্ষণ এবং আনন্দ-সমৃদ্ধ আশাবাদ ও দিকদর্শন। এই দুটো ব্যাপার পরস্পরকে নাকচ না করে বরং সমগ্রভাবে গতি সঞ্চারই করেছে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে একাগ্রতা ইতিবাচকতা এবং একাদিক্রমিকতা জুগিয়েছে।

১. এই কথাশিল্পী তাঁর লেখার চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন সংগ্রামী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীকে।

২. তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চেতন-অবচেতনের সূত্রগুলিকে শ্রমজীবী নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রকাশের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩. গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মজুর কিষাণদের পাশাপাশি তিনি প্রায় একই স্তরের শোষিত ও বঞ্চিত নিম্নমধ্যবিত্ত বিভিন্ন বৃত্তির এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নরনারীর চরিতকথা বলেছেন। তিনি লেখা শুরু করেছিলেন এঁদের নিয়েই। যত দিন গিয়েছে ততই তাঁর লেখায় গায়ে গতরে খেটে খাওয়ারা প্রাধান্য পেয়েছে, তবে নিম্নমধ্যবিত্তদের কথাও তিনি শেষ পর্যন্ত বলেছেন। এরা নিরালম্ব বলে এঁদের পরিত্যাগ না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদের শ্রমজীবীদের সাথী করে নিয়েছেন সাম্যবাদী বিপ্লবের আয়োজনে।

৪. অসামান্য বীরচরিত-ভিত্তিক মহাকাব্যিক আখ্যান না লিখলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সামান্য ও সামান্যা মানবমানবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন,

তাতে বহবীর-সমন্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস এবং এর ফলে এদের আখ্যান লিখতে গিয়ে এক নতুন ধরনের গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস গড়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

৫. যে কোনো স্তরের যে কোন বর্ণের নরনারী যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কিংবা ছোটগল্পের বিষয়ের আওতায় এসেছে, তখন তার মুক্ত সত্তাটিকে বঝাতে এবং বুঝাতে চেয়েছেন তিনি। সমস্যা হয়েছে, কাকে ফেলে কাকে রাখবেন। কিন্তু ফেলেননি কাউকে। এইজন্যেই বাইরের চেহারার পার্থক্য দ্বারা রূপ কুরূপ নির্ধারণকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

৬. মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি জীবনাদর্শ ও বিশ্বদর্শন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী মানবমুক্তি সংগ্রামের নেতা, সেজন্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি হয়েছে তাঁর রাজনীতি। পরাধীনতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যে একটা অন্তঃশীল যোগ তাঁর নিমগ্ন মনে বিরাজ করছিল কৈশোর থেকেই, তাকেও এই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিই প্রকাশ্যে টেনে আনে। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি শোষণমুক্ত সমাজের জন্য শ্রেণীসংগ্রামে একত্র করতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে।

৭. ঘটনাবর্তে বা খেয়ালের বশে তিনি কমিউনিস্ট হননি। বরং, জীবনের ধাপে ধাপে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে ও কমিউনিস্টদের যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিত হবার পরে তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বাহ্নে সাথীদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাউকে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট বৃত্তের বাইরে।

৮. চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় পীড়িত জীবনে উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখাকে জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় করা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু ও ভাবনা-চিন্তা নির্বাচনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতাচারিতা বিস্ময়জনক। সাময়িক পত্রের কিংবা প্রকাশকের তাগিদেই অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন তিনি, কিন্তু কি নিয়ে লিখবেন সে সম্বন্ধে কেউ কখনও ফরমায়েস দিতে পারেন নি। কিন্তু এই জাতবিদ্রোহী শিল্পী কোন অবস্থাতেই নিজেকে একাকী ও বিচ্ছিন্ন করে নেননি। বরং তিনি বয়সের দিক থেকে যত এগিয়েছেন ততই বেশি বেশি সংঘমনা হয়েছেন।

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্মীয় ভেদবিভেদ কখনও উত্যক্ত করতে পারে নি। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি ঠিক সেইভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন যেমনভাবে পাখি আকাশে ওড়ে, নৌকা জলে ভাসে।

১০. নব পর্যায়ের প্রয়োজনে ও তাগিদে উপন্যাস ও ছোটগল্প কিংবা কবিতাকে অতি আধুনিকতার নানারকম ছাঁচে ঢাললেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পরীতিকে সমস্ত পর্বেই জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন, ভাষাকে এবং বর্ণনা-শৈলীকে প্রধানত গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীর আকাড়া কথাবার্তা ও আচরণে সম্পৃক্ত রেখে।

৩

উপরোক্ত নির্দেশিকাগুলোকে এখানে খুব সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

প্রথমেই গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীদের কথা। এবিষয়ে এখানে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও অনুশীলনীয়।

প্রথমত, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের যে কথা আমাদের এই প্রিয় কথাশিল্পী বলেছেন, বিশের দশকে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল উপমহাদেশে পরাধীনতার অবসানের জন্য বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া নরনারীর নিচুতলার গহন কন্দর থেকে বেরিয়ে বিপ্লবের পতাকা নিজেদের হাতে নেয়ার ফলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই ঘটনা ছিল সারা বিশ্বব্যাপী ঘটনার অংশ। সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি এই সময়ে আমাদের উপমহাদেশের শ্রমজীবী জনগণের সাফল্য ছিল এই যে, এই উত্থান সাময়িক হলেও গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষ স্বাধীন ও সমাজ বিপ্লবের মূলশক্তি হিসেবে নিজেদের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাছাড়া জনগণের উত্থান একটা ঝড়ের মতো প্রশমিত হলেও বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবীরা যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটা মুছে যাবার ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমজীবীরা বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছিল। অতি আধুনিক বাস্তববাদীরা এই প্রতীকে সীমিত না থেকে শ্রমজীবীদের প্রধান চরিত্র করে লিখেছিলেন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে বিষয়টি সীমিত রাখলে দেখা যাবে, কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি ছোটগল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'আকস্মিক', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' শ্রমজীবী নরনারীর চরিত কথা এঁকেছিল।

এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্রথম গল্প লেখার সময় কল্লোলগোষ্ঠী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গী নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীদের নিয়ে

যেভাবে লিখিছলেন সেইভাবেই শুরু করেছিলেন। তিরিশের দশকেই কিন্তু দেখা গেল, শ্রমজীবী মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবাক করে দিয়েছিল অনেককে, যদিও একটা খটকাও ছিল। এই উপন্যাসের সমসাময়িক আরও চারটি উপন্যাস 'জননী' 'পুতুল নাচের ইতিকথা,' 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং 'জীবনের জটিলতা' নিম্ন মধ্যবিত্তদের পরিধির মধ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন-চেতনের ক্রিয়াকলাপগুলোকে বেশ ঘোরালোভাবে প্রয়োগ করায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'কেও মনে হয়েছিল শ্রমজীবী নরনারীর নিমগ্ন মনের কাজ দেখানোরই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু তিরিশ দশকের শেষের দিক এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে 'শহরতলী' উপন্যাসের দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গেল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন শ্রমজীবী মানুষদের এবং তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে।

চল্লিশের দশকে সরাসরি শ্রমজীবীদের নিয়ে লেখা ছাড়াও যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এলো, সেগুলোতে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন দর্শনকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লব করার দর্শনের অনুসারী করা হয়েছে। মজুর কিষাণের উত্থানেই সমস্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা। সমস্ত স্তরের শোষিত ও লাঞ্ছিত ও আশাহত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং সংকটগ্রস্ত নরনারীকে তিনি এই অদম্য বিপ্লবী অবিশ্রান্ত গণউত্থানের অভিমুখী করে দিয়েছেন।

'শহরবাসের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'সোনার চেয়ে দামী' কিংবা এমনকি 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবন-চিত্র বড় হলেও, জীবনের অর্থ পাবার সংকেত রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষদের ক্রিয়াকলাপেই।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামাজিক ভাঙচুরের উপাদান নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চিন্তামণি', ১৯৪৬ সালের নৌ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় গণঅভ্যুত্থানের উপকরণ নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চিহ্ন', ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের মালমসলা নিয়ে লেখা 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দিকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ রয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, 'চিন্তামণি' গ্রামীণ পরিবেশের কাহিনী হলেও চাষী কিভাবে শ্রমিক হতে চলেছে তার দিকে ইঙ্গিত করেই দুঃখ জয়ের হদিশ রয়েছে।

খেটে খাওয়া নরনারীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু স্তরের মানবমানবী-চরিত্রে বহুলভাবে আনার মধ্যেও যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তার একটা প্রমাণ নারী সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবোধ সৃষ্টি।

নরনারীকে বিপ্লবের পক্ষপাতী হিসেবে সমমর্যাদা দেবার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিচার্য করেছেন তিনি নারীর পরিশ্রমী সত্তাটিকে। ক্ষেতখামার কিংবা কারখানায় শ্রমিকদের অগ্রণীর ভূমিকায় তিনি রেখেছেন নারীকে। 'শহরতলী'তে যশোদা, 'দর্পণ' উপন্যাসে রম্ভা, 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে লক্ষ্মী, 'হারানের নাতজামাই' গল্পে হারানের নাতনী—এরা মেহনতী নারী হিসেবে মজুর কিষাণদের মতো সমানভাবে খাটিয়ে।

গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষদের বীর হিসেবে সামনে এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বহু-বীর নরনারী সমন্বিত গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস 'দর্পণ' লিখেছেন, তাতে নারীর উপরোক্ত শ্রমিক-সত্তার জয়গান গেয়েছেন তিনি। রূপবতী সে, যে সংগ্রামী মেহনতী। যেমন, রূপবান সে, যে রূপবান মেহনতী।

এখানেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার ঘটনাও বিশেষ ব্যাখ্যার দাবীদার নিশ্চয়। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে শ্রমজীবী জনগণের প্রাধান্য ঘটানোর প্রাথমিক কাজ তিনি না করলেও প্রথমত পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই প্রাধান্যের ধারা নিয়ে একাদিক্রমে কাজ করেছেন তিনিই এবং দ্বিতীয়ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন-চেতনের সূত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খেটে খাওয়া নরনারীর নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান একাদিক্রমে তিনিই করেছেন। সেই মানুষ সমৃদ্ধ, যার মধ্যে পৃথিবীকে বদলে দেবার মানসিক শক্তি অবচেতনের তলায়। সাধারণ শ্রমজীবীরা এই শক্তির অধিকারী। এটা তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁকে অতি বাস্তবতাবাদের নয়া প্রবর্তক বলাটা যথোচিত।

নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমে তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীকে উপন্যাস ও ছোটগল্পের বৃত্তে টেনেছিলেন। এর কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রথমে এদের সঙ্গেই ছিল। বাস্তবতাবাদীর উচিত প্রত্যক্ষকেই চিত্রিত করা, এই ঔচিত্যবোধও নিশ্চয় তাঁর মনে কাজ করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ যত বেশি শ্রমজীবীদের সঙ্গে বেড়েছে, ততই শ্রমজীবী নরনারীর নিমগ্ন মনকে চিত্রিত করার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দিকে তাঁর যে ঝোঁকের জন্য তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের মতো ভাবলৌকিক বাস্তবচিত্র এঁকেছেন, সেই ঝোঁককে অ-ভাব-লৌকিক 'চিন্তামণি' উপন্যাসে নিয়োজিত করেছেন।

এখানে তাহলে আমরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নে দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ১. আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খেটে খাওয়া নরনারী চরিত্রকে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী করেছেন। ২. খেটে খাওয়া নরনারীর বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামকে ক্রমাগত উজ্জীবিত

রেখেছেন বলে নিম্নবিত্তের মনের গহনে সন্ধান করতে গিয়েও 'পদ্মা নদীর মাঝির' লেখক অবচেতনায় আচ্ছন্ন হলেও চেতনায় উত্তরিত হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ী প্রয়োগের রেওয়াজকে কখনও কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেননি। নরনারীর যৌনজীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে অবচেতনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সত্যচিত্র দিতে চেয়েছেন তাঁর বহু উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকেও 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে দিবারাত্রির কাব্য-সংক্রান্ত যৌনমানসের ছবি এঁকেছেন। তবে সেখানেও অবক্ষয়ীরা যেভাবে যৌনতাকে সর্বময় করে সমগ্র জীবনসত্যকে খণ্ডিত করতে চেয়েছে সেরকম কিছু করেন নি তিনি। 'দিবারাত্রির কাব্য' কিংবা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য যৌনতা নয়। উদ্দেশ্য, পূর্ণাঙ্গ মানব-মানবী চরিত্র, বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্র-কথা। সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা ছাড়া অন্য কিছু যখন বলতে চান নি, তখন তাঁর কট্টর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটাও তিনি এনেছেন বিপ্লবের বিপুলতাকে দেখাবার জন্যে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের মধ্যে অবস্থান করে তাঁর নরনারীর চরিত্রগুলিকে লেখার পরিধিতে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেকের মুক্ত সত্তাটিকে বুঝতে গিয়ে অনুপম মাধুর্যের ছবি যেমন পেয়েছেন, তেমনি জৈবিক আকাঙ্ক্ষাও পেয়েছেন। এই মুক্ত সত্তাই বাস্তবজীবনে এবং বিপ্লবের সংগ্রামের উন্মোচনে জৈবিকতায় আবদ্ধ থাকাকে ইচ্ছা নাম দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি। বিপ্লবের কাছ থেকে সে পেয়েছে বিপুলতর ইচ্ছা। এই কারণেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পে যৌনতা বা জৈবিকতা ক্লেদসৃষ্টির ফুরসুত পায় নি।

৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট থেকেও অবক্ষয়ীদের ফাঁদে পা দেননি, তার মূলে ছিল তাঁর খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও সম্ভাবনাময় শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংযোগ। কিন্তু এখানে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের কথা লিখতে লিখতে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের ভাবের ঘোরের কারবারী একদিন কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। তাঁর এই কমিউনিস্ট হওয়াটা তাঁর জীবনতৃষ্ণা এবং শ্রমজীবী দর্শনের অবধারিত সিদ্ধান্ত। তিনি খেটে খাওয়া মানুষের লেখক এবং কমিউনিস্ট পার্টি খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির কথা সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলে, এই জন্যে তাঁর কমিউনিস্ট না হয়ে উপায় ছিল না।

কমিউনিস্ট হয়েছিলেন বলেই অবশ্য একদিকে যেমন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারে নি, তেমনি তিনি নিম্নবিত্তদের সহস্র জ্বালাযন্ত্রণা ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে নিরালম্বভাবে থাকতে না দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট হয়ে আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে থেকেছিলেন বলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবের অন্যতম অতি-আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন চূড়ান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস লিখবার সময় নির্মল বাতাসের মতো প্রাকৃতিকভাবে অপরিহার্য জীবনের উপকরণরূপে সামনে এনেছিলেন। 'ময়না দ্বীপে' হিন্দু-মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান খাড়া করবে না, এটা ছিল একটা বক্তব্য। এই প্রাকৃতিক সামাজিক ব্যাপারটাকে আমরা 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে পাই কমিউনিস্টের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তায় বিন্যস্ত।

দেশ ভাগ হবার পরে 'ছিন্নমূল' মানুষ নিয়ে তিনি যে 'সার্বজনীন' উপন্যাসটি লিখলেন কিংবা কৃষক অভ্যুত্থানের গল্প লিখলেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে একজন কমিউনিস্টের সংস্কারমুক্ত সূর্যোজ্জ্বল মন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানোর তাগিদ এই কমিউনিস্ট অতি-আধুনিক লেখকের মনে জাগ্রত ছিল '৪৭ সালের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে।

তাঁর আন্তর্জাতিকতা অবশ্যই আকাশচারী ছিল না কোন দিক দিয়েই। তিনি যেমন কমিউনিস্ট হয়েছিলেন খেটে খাওয়া মানুষের কথা লিখতে গিয়ে তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারায় যুক্ত থেকে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং লেখায় খোলাখুলি নিয়ে আসেন। এই স্বাধীনচেতা ও জাত-বিদ্রোহী মানুষটি প্রগতি লেখক সংঘের প্রবক্তা এবং বামপন্থী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ান। অবক্ষয়ীরা, প্রতিক্রিয়ার তল্পীবাহকেরা এবং কিছু কিছু সংগ্রাম-বিমুখ সাহিত্যানুরাগী এই ব্যাপারটাকে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারে কাজে লাগিয়েছে। তারা বলেছে, 'পদ্মা নদীর মাঝি,' 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' যিনি লিখেছেন তিনি যে এমন বই আর লিখলেন না, তার কারণ রাজনীতি। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট রাজনীতি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'পদ্মা নদীর মাঝি'র লেখক রাজনীতি-বর্জিত কোনদিনই ছিলেন না। প্রথমদিকে তাঁর মনে রাজনীতি ছিল অন্তঃশীল। যে শ্রমজীবী

নরনারীর মনোভূমিকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের উত্থান এবং দৃষ্টিগোচর হওয়াটা সম্ভব ছিল বিশের এবং তিরিশের দশকে রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানের জন্যেই। তিরিশের দশকের শেষের দিকে শহরতলীতে যে ধর্মঘটের তরঙ্গ উঠেছিল, তার মর্ম ছিল রাজনৈতিক। ১৯৪৩ সনে লেখা 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি পড়লে বুঝতে পারা যায়, রাজনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন। এর মধ্যে দুটি দিকই প্রবল। 'প্রতিবিম্ব' বইটির লেখক কমিউনিস্টদের কাছ থেকে চেয়েছেন বেশি স্বাদেশিকতা। এখানে একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল এটা পাচ্ছেন না বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট মহিলা-কর্মীর যে মর্যাদাপূর্ণ ছবি তিনি এতে এঁকেছেন, তা একজন গুণগ্রাহী ছাড়া অন্য কারও কাছে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এটা সত্য নয় যে, ১৯৪৪ সনে কমিউনিস্ট হবার আগে তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি রাজনীতির গভীর খোঁজই রাখতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পরে তাঁর লেখায় বস্তু-সত্য বাড়লো। 'দর্পণ' এর প্রমাণ। 'দর্পণ' উপন্যাসে তিনি দেখালেন, কমিউনিস্টরা স্বদেশের নিচুতলার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই লড়াই করে, কমিউনিস্টরা আকাশচারী নয়।

এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষ বাস্তব রাজনীতিতে তাঁর বেশি বেশি করে জড়িত হওয়ার দরুণ ক্রমাগত বেড়েছে বলেই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্প বেরিয়ে এসেছে ইস্তাহারকে নাটকীয়তা দিয়ে। লেখক ইস্তাহার নিয়ে গল্প লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করেননি।

৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যেমন লিখবার জন্য দেশ, বিশ্ব ও জনগণের কাছ থেকে উপকরণ নিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন তিনি কঠোর পরিশ্রম। নেবার দিক থেকে যেমন তিনি ছিলেন নম্র, দেবার ব্যাপারেও ছিলেন বিনত। যে লেখক আটাশ বছর খেটে খাওয়া নরনারীকে নিয়ে একটানা লিখে গেলেন দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা এবং অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে, তিনি নিশ্চয় খুবই একগুয়ে ছিলেন। কিন্তু নিজেকে কোনদিন তো একাকী কিংবা বিচ্ছিন্ন মনে করলেন না। এই চূড়ান্ত সংবেদনশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী লেখক লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বড় লেখক হবেন। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে মন না বসিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করলেন উপন্যাস ও ছোটগল্পে এবং কবিতায়। খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই 'প্রথম লেখাটি লিখে'। একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তিনি চড়া অতি আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও অতি-আধুনিকতার বিরোধীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত মহলের প্রিয়। তারাশঙ্কর তখন 'দুই পুরুষ', 'ধাত্রী দেবতা' ও 'গণদেবতা' লিখেছেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' লিখেছেন। বাংলা উপন্যাস নতুনভাবে জমজমাট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত আত্মসচেতন থেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পীকে দেখা গেল, লেখার স্বাতন্ত্র্যকে বেশি বেশি করে পরিস্ফুট করতে।

কিন্তু কোন পর্বেই বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হবার উপায় তাঁর ছিল না তাঁর লেখার কুশীলব নির্বাচনের দরুণ। বিপ্লবী জনগণের যেমন একক ও ছিঁড়ে-ফুড়ে একাকার হলে সর্বনাশ, বিপ্লবী লেখক লেখিকারও তেমনি বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হলে সর্বনাশ। আত্মন্তরিতা ছিল তাঁর কাছে অকল্পনীয়।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসকে যখন অতি আধুনিকতাবাদীরা তুলোধুনো করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ প্রশ্নকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লিখেছেন, এইজন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন তাঁর কবিতা না লিখলেও চলবে, কারণ যা চাই তা সুকান্ত দিয়েছেন।

৬

'পুতুলনাচের ইতিকথা,' 'দর্পণ,' ও 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের অতি আধুনিকতাবাদী লেখক যদি একটা নিজস্ব কথকী ধারা ঠিক করে নিতেন, তাহলে তা' অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতো না। কারণ, বাংলায় এবং অন্যত্র অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গণকথাশিল্পী হবার জন্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন এবং এই কারণেই শুধু সংলাপ নয় বর্ণনাও হয়েছে জনগণাত্মক।

অবশ্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক করার প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁদের যাঁরা বিশের দশকের শুরুতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন খেটে খাওয়া পরিবেশ ও মনের কথাকে বাস্তবানুগ, সত্যসন্ধ এবং সোচ্চার করে খুলে বলার জন্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রদূত। বীরভূম ও বর্ধমানের শ্রমজীবী মানুষকে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছিলেন। রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর এই ভাষা প্রয়োগ দ্বারা শ্রমজীবী-চিত্তকে প্রকাশ করার চেষ্টায়। কিন্তু বিশের দশকের গণউত্থান প্রশমিত হবার পরে একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে ভাটা পড়ে, তেমনি এক অঞ্চলের সুশিক্ষিত মানুষের চলতি ভাষা অতি আধুনিক রীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। তিরিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একটি ছোটগল্পে আনুপূর্বক পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহার করে একটা চমক

আনলেন। এরপর 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে সংলাপে এই ভাষার ব্যবহার দ্বারা পদ্মানদী ও তার দুপারের বাসিন্দাদের মুখরিত করে দিলেন।

বিশের দশকে যেটা পরীক্ষার স্তরে রয়ে গিয়েছিল, সেটাকে স্থায়ী করেছিলেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরের দশকে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে পত্র রচনায় চব্বিশ পরগণার গ্রামীণ ভাষা ব্যবহার করে ব্যাপারটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিলেন। 'চিন্তামণি'তে যেহেতু পত্রই হলো ঘটনাবলীর যোগসূত্র, সেজন্য সমস্ত বর্ণনাটাতেও একটা গ্রামীণতা এসে গেলো।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে উত্তরকালে ছোটগল্পগুলোতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনায় ও সংলাপে কলকাতা মহানগরীর শহরতলি ও চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার একটা আদল করালেন। এই ভাষাটা এমন যে, কথাগুলি শহরমুখী গ্রামীণ নরনারীর মনের অচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। 'ইতিকথার পরের কথা'ই হোক অথবা 'হারানের নাতজামাই' এর মতো ছোটগল্প হোক, এর বর্ণনাতেও ভাষা জনগণাত্মক।

একটা ব্যাপার ঘটাচ্ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত। উপন্যাস ও গল্পকে বর্ণনাতেও খেটে খাওয়া মানুষের নিকটস্থ করে তুলছিলেন। শব্দে শুধু নয়, পদ-ব্যবহারেরও চেষ্টা ছিল তাঁর বহুকালের লিখিত সাহিত্য ও জনগণের ব্যবধানকে পুরোপুরি ভেঙ্গে দেবার।

আঞ্চলিকতাকে ছাপিয়ে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে যাতে ভাবের আদান প্রদান হতে পারে এজন্য তিনি একটা অশিক্ষিত চলতি ভাষার প্রচলন করছিলেন। আরও একট ঘটনা এখানে লক্ষণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খেটে খাওয়া মানুষের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বও বড় ছিল বলেই তাদের আঞ্চলিক ভাষা বড় ছিল। যখন মনে হয়েছে, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার না করেও শ্রমজীবী মানুষকে, অথবা তার সঙ্গী নিম্নবিত্ত শোষিত বঞ্চিত সামান্য মানবমানবীকে বড় করে প্রকাশ করা যায়, তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেননি তিনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একই সময়ে পূর্ব বাংলা নিয়ে লেখা হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন নি।

কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পকে জনগণাত্মক করে তোলার জন্যে এর ভাষা ও শিল্পগত গঠনে একটা সহজ আদলের প্রবর্তন করার ব্যাপারে তিনি ক্রমাগত এগিয়ে আসছিলেন।

সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে এই যে সমস্যায় প্রবেশ, এই যে ইচ্ছাকৃত শিল্পরূপগত ধরনের অতি আধুনিকতার ভাংচুর, এর জন্যেও তাঁকে পরের দিকের লেখায় কঠোর বা 'কট্টর' হতে হয়েছে।

পরের দিকের উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রসাদগুণের ও স্বাচ্ছন্দ্যের আপেক্ষিক অভাবের মূলে রয়েছে এই জনগণাত্মক শৈলী তৈরির অসম্পূর্ণতা। মহিমাময় এই অসম্পূর্ণতা উত্তরসূরীদের জন্যে নতুনের ভিত্তি।

৭

আরও যা লিখতে চেয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তা লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু যা লিখে রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের বাংলার শিল্পরূপে প্রাধান্যের তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে পৌঁছবার সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী সমাবেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামনের সারিতে রয়েছেন তাঁর মৃত্যুভেদী লেখাগুলোকে নিয়ে। বাংলা এমন একজন লেখককে বিশ্বসমাবেশের সামনের সারিতে দিতে পেরেছে বলে নন্দিত।

বিশ্বের সকল ভাষার মানবমানবীরা সর্বাত্মক মুক্তির সাম্যবাদী সমাজের জন্যে প্রয়াসে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে বুঝবার প্রয়োজনে যে শিল্পরূপের বিবরণ চায়, তাতে বাংলার সুদৃঢ় যোগ রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রমাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আদরও তাই বাড়তেই থাকবে। যেভাবে গোর্কির আদর বাড়ছে কিংবা ব্রেখট, নেরুদা, বারবুসে কিংবা লুই আরাগঁ এবং এমন সব কমিউনিস্ট গণকথাশিল্পীরই আদর বাড়ছে সেইভাবেই।

শ্রমজীবী নরনারীর হাতে এগিয়ে চলার লাল পতাকা। দেশে দেশে নতুন নতুন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কাজ করছেন। কোন কাজ সম্পূর্ণ, কোন কাজ অসম্পূর্ণ। খেটে খাওয়া মানুষেরা সম্পূর্ণ করে নেবে। কারণ, শ্রমজীবী মানুষই সমস্ত শিল্পসুষমার সৃষ্টির মূলে। বহুকাল এ কাজ খেটে খাওয়া মানুষ করেছে সমাজের মধ্যে চাপা পড়ে অন্তঃশীল থেকে। আজ বোঝাপড়া করছে তারা প্রকাশ্যভাবে, কারণ বিশ্বের দখল নেয়া হলো বলে তারা ঘোষণা জারী করে দিয়েছে।

অন্তঃশীল ও প্রকাশ্যের বিস্ফোরিত সম্মেলনের অতি আধুনিক গণকথাশিল্পী কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর স্মারকসঙ্গী।

বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন

আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে জনগণের অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানে যাঁরা নিরন্তর বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটার পর একটা ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী ও উদ্যোগী থেকেছেন, সত্যেন সেন সেই কর্মীদেরই একজন। তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল পুর্ববাংলা তথা আজকের বাংলাদেশ। তাঁর বহুমুখী কাজের মধ্যে একটি, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঝড়ের বেগে বাংলা ভাষার নয়া ধ্রুপদী ধারার উপন্যাস ও গণচরিত্রের আলেখ্যমালার সৃষ্টি।

পদ্মা আর ধলেশ্বরীর বিপুল জলধারায় আলিঙ্গিত ঐতিহাসিক বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পরিবারে জন্ম। কৈশোর থেকেই আরদ্ধ বিপ্লবী জীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায় কখনও খরবেগে এবং কখনও বা শান্ত পদক্ষেপে পেরিয়ে পশ্চিম বাংলার শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীতে ৮১ সালে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যু। ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্রামের জন্য পৌঁছেছিলেন দৃষ্টিহীন ও অসুস্থ অবস্থায় বড়বোনের হেফাজতে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর প্রিয় কোপাই নদীটিও শীর্ণা, জলহীনা।

আমরা বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সত্যেন সেনের বিশেষ করে লেখক রূপের একটা আন্দাজ করে সামনে রাখতে চাই। তবে আমরা মনে করি, এই দিকটিকে বুঝবার জন্যও তাঁর বিপ্লবী জীবনের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার একটা ছক প্রথমেই থাকা দরকার। এর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ধ্রুপদী ধারার সমৃদ্ধির একটা ছবি পেতে পারি। সুতরাং এই ছকটি দিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষাটি উপস্থিত করছি। প্রসঙ্গক্রমে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়, "বিজ্ঞান ও উপন্যাসের জন্য চাই অভিজ্ঞতা।" শেখ সাদী তো কবিতা লিখবার জন্যও দুটো জীবনকাল চেয়েছিলেন। একটা অভিজ্ঞতা জমা করার জন্য ; অপরটা, তাকে কাব্যে রূপ দেবার জন্য। সত্যেন সেনের সমস্যা ছিল, 'এত অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপের ছাঁচে রাখতে সময় পাবো তো?'

বাংলার অগ্নিযুগের একটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন ছেলেবেলাতেই। তিরিশের দশকের শুরুতে পলাতক জীবন। তারপর ধরা পরে সাত বছর জেল ও অন্তরীণে কাটিয়েছিলেন। আটত্রিশ সালে কারামুক্তির পরে ঢাকা

জেলা কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে কৃষক সমিতির কাজে গোটা চল্লিশের দশকটাই ব্যয় করেন। ইতিপূর্বে জেলখানা থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। কিন্তু সমিতির কাজ সারাক্ষণের হওয়ায় কোন শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেননি। পারিবারিক সূত্রে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত তার মজ্জার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রচর্চা ছিল ফল্গধারা, কৃষক আন্দোলনের কাজে লাগতে পারে ভেবেই তিনি গণসঙ্গীত লেখা শুরু করেন। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর লেখা গান ঢাকা জেলার কৃষকদের ঘরে ঘরে পেঁৗছে গিয়েছিল। তাঁর দুয়েকটি গান এই সময় কলকাতাতেও গাওয়া হয়েছে।

'৪৭ সালে বাংলা ভাগ হলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে পূর্ব বাংলায় তথা বাংলাদেশে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থচক্রের আগ্রাসী শাসন ও শোষণ কায়েমের ডামাডোলের মধ্যে গণসংগঠনগুলিকে বাঁচাবার জন্য ঢাকা শহরে জেলা পার্টির তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তখন পার্টির অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন অথবা আত্মগোপন করেছেন। বছরখানেক পর নিজেও আত্মগোপন থাকা অবস্থায় '৪৯ সালের শুরুতে গ্রেপ্তার হয়ে যান। '৫৩ সালের শুরুতে মুক্তি পেয়ে ঢাকা শহরেই থাকেন। এই সময় ৫৩-৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ী হবার মুখে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য টীম অফিস খুলে কাজ শুরু করে। '৫৪-তেই পাকিস্তানের শাসকচক্র আধা সামরিক শাসন জারী করে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভাকে অপসারিত করে ব্যাপক হামলা শুরু করলে যাঁরা সারা পূর্ববাংলায় গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে সত্যেন সেনও ছিলেন অন্যতম। '৫৫-তে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সত্যেন সেন তিনবছর 'সংবাদ' কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এই সময় তিনি তেভাগা ও হাজং আন্দোলনের উৎস সন্ধানে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েকটি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং বীর সংগ্রামী কৃষক নারী-পুরুষদের আলেখ্য রচনা করে সংবাদ কাগজে প্রকাশ করেন। এই লেখাই বই আকারে 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' নামে আত্মপ্রকাশ করে। তখন সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী চলছিল। সত্যেন সেন লেখেন 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। '৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতায় এলে যাঁদের সর্বপ্রথম সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়, সত্যেন সেন তাঁদের একজন। '৬৩-তে বেরিয়ে আবার '৬৫-তে কারারুদ্ধ হয়ে '৬৮ পর্যন্ত জেলখানায়। এই সময় জেলের ভিতর ও বাইরে তাঁর বড় কাজ ছিল একটির পর একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস অথবা

আলেখ্যমালা রচনা। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের ভাষায় "জেলখানা ছিল তাঁর বই লেখার কারখানা।" '৬৮ সালে জেলখানা থেকে বেরিয়ে সত্যেন সেন ঢাকা শহরের কয়েকটি তরুণ তরুণীদের নিয়ে স্থাপন করেন গণনাট্য ও গণসঙ্গীতের সাহায্যে বাংলাদেশের গণঅভ্যুদয়কে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।

ইতিমধ্যে তিনি দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছেন। এই অবস্থাতেই একটার পর একটা বই লিখছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদীচীর তরুণ-কর্মীরা তাঁকে ঢাকা শহর থেকে বার করে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে সমস্ত রকমের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কলকাতা পৌঁছে দেন। কলকাতা থেকে তাঁকে চোখের চিকিৎসার জন্য মস্কো পাঠানো হয়। মস্কোতে হাসপাতালে আফগানিস্তানের বিপ্লবী নেত্রী আনাহিতা, ভারতের হাজেরা বেগম এবং আরও অন্যান্যের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট নেতা মোজেস বোটেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই হাসপাতালে তিনি পেয়ে যান মেক্সিকোর এক বিপ্লবী দম্পতিকে, লাওসের এক মুক্তিযোদ্ধাকে। সত্যেন সেনের কথার বিষয়বস্তুর জগতে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সংহতির একটা জানালা খুলে যায়। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে এসে উদীচী ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থাতেও মস্কোর সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের আলেখ্য লিখতে শুরু করেন সংবাদ পত্রিকাতে। মস্কোতে চোখের ব্যাপারে কোন কিনারা হয়নি। কারণ তার চোখের অবস্থা কয়েক বছর আগেই চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। ফিরেছিলেন অবশ্য শারীরিক দিক থেকে অনেক শক্তি নিয়ে, তাছাড়া একদিকে আন্তর্জাতিক সঙ্গীদের কথা, অন্যদিকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কথা লেখার জল্পনা কল্পনা তাকে চাঙ্গা করে দিয়েছিল। কিন্তু '৭২-এর শেষের দিকেই এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, তাঁকে বিশ্রাম নেবার জন্য শান্তিনিকেতনে যাত্রা করতে হয়। এখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যায় না। বাংলাদেশে ফিরতে না পারার এই কয়েকটা বছরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি কয়েকখানা বই নিজে অথবা স্বেচ্ছাসেবিকাদের সাহায্যে লিখেছেন। মন ভরেনি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তিনি বন্ধুদের কাঁধে হাত রেখে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি সাঁওতাল পল্লীতে নতুন লেখার উপাদান খুঁজেছেন। জোগাড়ও করেছেন নিশ্চয়ই তাঁর চিরাচরিত রীতিতে ভ্রাম্যমানের ঝুলিতে। সম্ভাবনা ছিল, এই দিকটা সত্যেন সেনের গণসাহিত্য সৃষ্টির নয়া ধ্রুপদী ধারায় বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই নূতনভাবে উদ্ভাসিত হতো। কিন্তু মৃত্যু সে সুযোগ তাঁকে দেয়নি। তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাকে প্রচুরই বলা যায়। আমরা এখন সরাসরি সে কথাতেই যাব।

২

আমরা সত্যেন সেনের তিরিশটিরও বেশি বই এর মধ্য থেকে কুড়িটি বই নিচ্ছি তাঁর বহুমুখি গণকথার মূল কাজ হিসেবে। বইগুলির নাম, ১. কুমারজীব, ২. পুরুষমেধ, ৩. অভিশপ্ত নগরী, ৪. পাপের সন্তান, ৫. আলবেরুনী, ৬. মসলার যুদ্ধ, ৭. মহাবিদ্রোহের কাহিনী, ৮. অপরাজেয়, ৯. অভিযাত্রী, ১০. মেহনতি মানুষ, ১১. বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম, ১২. গ্রাম বাংলার পথে পথে, ১৩. রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, ১৪. মনোরমা মাসীমা, ১৫. সীমান্ত সূর্য গফ্ফার খান, ১৬. ভোরের বিহঙ্গী, ১৭. মা, ১৮. সেয়ানা, ১৯. পদচিহ্ন, ২০. উত্তরণ।

এই কুড়িটি বই-এর মধ্যে দুটি—'অভিশপ্ত নগরী, ও 'পাপের সন্তান'-এ বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনীমালা' থেকে আবেগপ্রাণ পুরুষ ও নারী চরিত্র নিয়ে আসা হয়েছে প্রাচীন যুগের বিশ্বাস ও হতাশ্বাসের ছন্দাত্মক ভাব সংঘাতের চিত্রে। বাদবাকী ১৮টি বইয়ে আমাদের উপমহাদেশের আদি কিংবা মধ্যযুগের জনজীবন ও দর্শনচিন্তার প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বাস ও যুক্তির ব্যাপ্তি ও ঘাত সংঘাতের পর আধুনিক কালের পূর্বাহ্নে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে পরিণত হবার ন্যাক্কারজনক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে স্থানীয় অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত উদ্বোধন এবং আরও পরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পরশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য অগ্নিযুগ থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক মজুর, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যায়ের পর পর্যায়ে অভ্যুদয়ের পর অভ্যুদয়ের আলেখ্যমালা আঁকা হয়েছে। 'কুমারজীব' 'পুরুষমেধ', 'অভিশপ্ত নগরী', 'পাপের সন্তান,' ও 'আলবেরুনী' আমাদের তালিকার এই প্রথম পাঁচটি বই ঐতিহাসিক উপন্যাস, পরবর্তী তিনটি বই 'মসলার যুদ্ধ, 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' ও 'অপরাজেয়' ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের আলেখ্যমালা। এরপরের পাঁচটি 'অভিযাত্রী', 'মেহনতি মানুষ', 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম,' 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' ও 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' সমসাময়িক চরিত্র ও সংগ্রামের অসংখ্য আলেখ্য গাঁথা কাহিনীর অগ্নিমালা। এর পরের দুটি বই 'মনোরমা মাসীমা' ও 'সীমান্ত সূর্য গফ্ফার খান।' এরা একেকটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনী, সর্বশেষ পাঁচটি, অর্থাৎ 'ভোরের বিহঙ্গী', 'মা', 'সেয়ানা', 'পদচিহ্ন', ও 'উত্তরণ' সাম্প্রতিক বা অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক রদবদলের মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বলয়ের ভিতরের ও বাইরের বহু জটখোলার প্রয়াসে ও চিন্তাভাবনায়

নিয়োজিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ ঘরের নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অথবা পারিবারিক অথবা বৃহত্তর সমাজ ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙ্গাগড়া নিয়ে লেখা বহুচরিত্রভিত্তিক সমসাময়িক উপন্যাস। চরিত্রচিত্রের বলয়ের মধ্যে জাহাজের সারেং খালাসীও স্থান করে নিয়েছে।

আমাদের এই পর্যালোচনাটিকে উপক্রমণিকারূপে উপস্থিত করছি বলে আমরা উপরোক্ত কুড়িটি বই-এর ঢালাও পরিচিতিতেই সীমিত থাকছি। তাঁর যেসব বই আমাদের উপস্থাপিত কুড়িটির বাইরে রয়েছে, গণসাহিত্যের এক্তিয়ারে তারা আসে না বলেই তাদের টানিনি। অবশ্য দুষ্প্রাপ্য দুয়েকটি বই অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন দুয়েকটি গণকথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনে যাতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এদের আপাততঃ আলোচনার বাইরে রেখেছি। শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করা যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলে রাখা যেতে পারে। গোকুল নাগের 'পথিক' উপন্যাসটিকে সত্যেন সেন ও তাঁর সমসাময়িক জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়েছে এই নিবন্ধ লিখতে বসে। কিন্তু গোকুল নাগ ও তাঁর 'পথিক'কে আপাততঃ স্থগিত রেখে দিয়েছি। কারণটা খুব পরিষ্কার। পথিক উপন্যাসটিকে খুঁজে বার করে মিলিয়ে দেখা প্রায় অসম্ভব। পাঠক পাঠিকারা খুঁজে দেখে মেলাবার চেষ্টা করতে পারেন।

৩

এবার আমরা পরবর্তী জরুরী বিষয়ে আসি। আমরা তাঁর কুড়িটি বই-এর যে মর্ম উপস্থিত করেছি, তাতে গণসাহিত্যের মূল নায়ক জনগণের কথাটাই কয়েক কথায় বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁকে যে নয়া ধ্রুপদীধারার গণকথা শিল্পীরূপে প্রথমেই চিহ্নিত করে নিয়েছি তাঁর কোন ব্যাখ্যা দেইনি। এই নয়া ধ্রুপদীশৈলীর ব্যাপারটা নিম্নরূপ।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও তাঁরই ধারায় বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রাম তথা গণ অভ্যুদয় বাংলার লেখক-লেখিকাদের কাছে এমন ধরনের লেখার তাগিদ ও প্রত্যাশা উপস্থাপিত করেছে, যা শুধু নতুন ও নতুনতর সমসাময়িক বিষয়বস্তুতে নয়, রচনাশৈলীতেও একটা হেরফের নিয়ে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের লেখক-লেখিকারা এই উভয়বিধ দাবী পূরণ করেছেন। এই সত্যেই দেখা গিয়েছে সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যিক অথবা সমকালীন বিভিন্ন শৈলীর যে ধারাকে ভাষা আন্দোলনের পরে

আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, তার পাশাপাশি একশ' বছর আগেকার ধ্রুপদী ধারা নূতনভাবে পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বহজনের অধিগম্য বস্তুনিষ্ঠ বুনিয়াদী ধারার প্রবর্তন ঘটেছিল, যার ধারা বিশ শতকের বিশের দশকের আধুনিকতাপন্থীদের কলম থেকেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে বহজনীনতার তাগিদে। মাঝখানে এবং বিশেষ করে চল্লিশের দশকে ও তার পরবর্তীকালে সাধারণভাবে বাংলাসাহিত্যে উনিশ শতকীয় ধ্রুপদী ধারা গৌণ বলে গণ্য, তবে বাংলাদেশে কোটি কোটি শ্রমজীবী তথা কৃষিজীবীদের নব বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক জাতীয় অভ্যুদয় এবং তার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের প্রগাঢ় একাত্মতার যে প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ধারায় ঘটেছে তাতে প্রাথমিক অগ্রাধিকার পেয়েছে ধ্রুপদী রীতি। অবশ্য ধ্রুপদী রীতির এই পুনঃপ্রসার আধুনিকতার অভিনবত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বরং সহযোগী রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কারণ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অভ্যুদয় সাহিত্যে বহজনীন রীতিকে প্রবল করেছে, তার তরফ থেকে গুণগত উত্তরণ ও অভিনবত্বের তাগিদ রয়েছে ভাষা ও সাহিত্যে, বিপুল সংখ্যক পাঠক পাঠিকার কাছে একেবারে দূরতম গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছবার জন্যই ধ্রুপদী রীতিকে বেশ কিছুটা পিছোতে হয়েছে। সাধুভাষার ধরনের বদলে চলতিভাষার ধরন নিলেও তার বাকবিন্যাস উনিশ শতকীয়। সত্যেন সেন বিশিষ্ট ধ্রুপদী গদ্য রীতিতেই তাঁর সাম্প্রতিকতম বইগুলি লিখেছেন। কিছুটা সেকেলে রসে পরিগণিত হয়ে পড়ার ঝুঁকিও তিনি নিয়েছেন। অবশ্য সাহিত্য যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে ও প্রচলিতের ভাঙ্গাগড়ার অগ্রগতিধারাকে শুধুমাত্র প্রতিফলিত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে যে যুক্তি ও আবেগকে সমন্বিত করে মূল্যবোধকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ এবং দুরূহ বৈপ্লবিক গতিধারাতেও শরিক করে তোলার কাজটুকু করতে হয়, একথা মার্কসবাদী সত্যেন সেনের ভাল করেই জানা ছিল। বস্তুতপক্ষে বহজনের অধিগম্য রীতি তাঁর কাছে বিপুল ও ব্যাপক গণমানসকে ধর্ম নিরপেক্ষ যুক্তিসিদ্ধ বৈপ্লবিক মূল্যবোধ দিয়ে সমৃদ্ধ করার উপায় স্বরূপ ছিল। 'আলবেরুনী' উপন্যাসটি এর দৃষ্টান্ত। আমরা সত্যেন সেনের যে কুড়িটি বই-এর সারসূত্র উপস্থিত করেছি, তাদের অধিকাংশেই আদি থেকে একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের উপমহাদেশীয় অঞ্চলের মেহনতি জনগণ ও মুক্তিসংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন প্রশ্নে মতামত ব্যক্ত করার সংলাপ পুনর্জাগরিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্নে তর্ক-বিতর্কের বিষয়গুলি জীবনের জটিল সমস্যাগুলির কথা সামনে রেখেছে। বিপুল সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাকে আধুনিকতম প্রশ্ন সম্বন্ধে সজাগ করার প্রয়াসে যথাসাধ্য

শরিক হবার জন্য সত্যেন সেন শৈলীর দিক থেকে আধুনিকতা থেকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছেন।

গণসঙ্গীত লেখা ছেড়ে দিলেও সত্যেন সেন যে চল্লিশের দশকের প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকে পঠিত টুকরো টাকরা 'মেয়েটি গান করে' ধরনের গল্প না লিখে বড় বড় পরিকল্পনা তৈরি করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ও কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলেন, তার একটা দিক তাঁর নয়া ধ্রুপদী শৈলী নিয়ে কাজ করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সেটা হচ্ছে, উপন্যাস ও কাহিনী রচনা শুরু করেন তিনি একজন 'অপ্রত্যাশিত' কথাসাহিত্যিক হিসেবে, শৈলীগত দিক দিয়ে নিজের তৈরি কোন রীতিতে আবদ্ধ না হয়ে।

বাংলাদেশের আরেকজন নয়া ধ্রুপদী কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাস লেখার জীবন শুরু করেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তিনি হলেন 'সংশপ্তক' উপন্যাসের রচয়িতা শহীদুল্লা কায়সার। তিনি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাস লিখতে শুরু করেন চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে জেলখানায় বসে ১৯৫৯-৬০ সালে। শহীদুল্লা ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এত গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে, তার লেখার হাতটা 'সংবাদ' কাগজের রাজনৈতিক ভাষ্যের বাইরে আসার সুযোগ পায়নি। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। আত্মগোপন করে থেকে ৫২'র অভ্যুত্থানের সময় এর অন্যতম পরিচালকের কাজ করেন। অভ্যুত্থানের পর গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁকে হুলিয়া এড়িয়ে চলতে সাহায্য করার অভিযোগে সেই সময়ে তাঁর ছোটভাই জহীর রায়হানও গ্রেপ্তার হন। জহীর রায়হান কয়েক বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাকা লেখক হিসেবে নাম করে ফেলেন। শহীদুল্লা কায়সার এতে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। তার কথাবার্তা এই সময় এই ছিল যে, ভাই লিখছে, সেই লিখুক। সত্যেন সেনের মতোই বৃহৎ পরিমাপের লেখক রূপটি অন্তরঙ্গ মহলেও প্রকাশ পায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার স্থির করলেন যে তাঁরা উপন্যাস লিখবেন বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রেখে। তখন তাঁরা ঝড় বইয়ে দিলেন। রীতি একই। নয়া ধ্রুপদী শৈলীতে গণবিপ্লবী আলেখ্য রচনা।

১৯৫৮ থেকে ৬৩'র কারাবাসের সময় দু'জনের দেখা হয়েছে, মত বিনিময় হয়েছে। পরস্পরকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা। জেলখানায় ডজন খানেক এক্সারসাইজবুক ভরে ফেলেছেন অসংখ্য নারী পুরুষ চরিত্রের সংলাপ আর টানা বর্ণনা দিয়ে। ষাটের দশকে সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার বাংলাভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির বলিষ্ঠ ও

ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যেই যেদিকটাতে শওকত ওসমানের কাজ সত্ত্বেও ঘাটতি হচ্ছিল সেটা পূরণ করে দিলেন। দেখা গেল ব্যাপক সংখ্যক পাঠক পাঠিকা তাদের বইগুলিকে সাগ্রহে নিচ্ছেন। নবীন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতা ও ভাষ্যকার শহীদুল্লা কায়সার যে পরিকল্পনাগুলি করেছিলেন সেগুলিকেও কাজের চাপে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। তবে সত্যেন সেন দৃষ্টিশক্তি হারাতে চলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়ায় লেখার কাজই বসে বসে করেছেন। দু'জনেই শৈলীর পরিবর্তন করেননি।

আমরা অবশ্য আগেও উল্লেখ করেছি। এবং আবারও বলছি যে, নয়া ধ্রুপদী ধারার এই কাজ কোন রকম গোঁড়ামির ব্যাপার নয়। অন্যান্য শৈলীর সহযোগী হিসেবেই এই কাজ। অন্যান্য শৈলীতেও গণকথা সাহিত্যে সার্থক কাজ হয়েছে। বিশেষ করে যে অবচেতন মনের ব্যাপার নিয়ে সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার তেমন কিছু করেননি, তাতে বেশ কিছু সার্থক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশিষ্ট কথাশিল্পীরা ষাটের দশকেই শুরু করেন। ধ্রুপদী শৈলীতেও বড় কাজ আরও হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এইসব কাজের কথা বর্তমান নিরীক্ষায় আনা সম্ভব নয়।

সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি

বাংলা ছোটগল্পের জগতে চল্লিশের দশকে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন এক তরুণ লেখক—ঢাকার ছেলে সোমেন চন্দ। অবশ্য সময় পাননি তিনি তাঁর প্রতিভার পুরো পরিচয় দিতে। ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়—৮ই মার্চ ১৯৪২ সালে। জন্ম হয়েছিল দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে, ১৯২০ সালে। ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে আর ঢাকা শহরে তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছিল। গ্রামীণ ও নাগরিক দরিদ্র নিম্নবিত্ত মেহনতী মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখনই। মেট্রিক পাশ করে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ সোমেন চন্দের কর্মীজীবন শুরু হয়েছিল কিন্তু এই সময়েই। তখন উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে নতুন গণ অভ্যুদয়ের আয়োজন চলছে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গোপনভাবে কাজ করছে। সোমেন এই পার্টির সংস্পর্শে এলেন এবং শুরু হলো তাঁর বিপ্লবী কর্মীজীবন। শুরু হলো দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সংগঠকরূপে কাজ। কলেজে পড়া হলো না, চাকরী করা হলো না। কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, বিশ্রাম তিনি করলেন না। একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজ, সঙ্গে সঙ্গে গণমুখী ছোট গল্প লেখার কাজ করে গেলেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সালের শুরু পর্যন্ত—এই তিন বছরে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন, যেগুলি ‘সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ’ নামে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি ছোটগল্প অবশ্য পাওয়া যায় নি। এছাড়া তিনি একটি উপন্যাস এবং কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছিলেন। শিল্পী হিসেবে তিনি নিখাদ নিষ্ঠাবান মেহনতী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। লিখবার সময় অল্পই পেতেন। ১৯৪০-৪১ সালে ঢাকায় রেল শ্রমিকদের ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইউনিয়নের সমস্ত দায়িত্ব পড়েছিল এই তরুণেরই কাঁধে। কারণ, এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করায় কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন। ইউনিয়নের কাজে শ্রমিকদের সঙ্গে লাইনে অফিসে বস্তিতে সংযোগ রাখবার ভার পড়েছিল সোমেন চন্দের উপর। এই কাজের মধ্যদিয়ে কারখানার মেহনতী মানুষের—সংগ্রামী

মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলেই অবশ্য তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মেহনতী মানুষের ছবি জেগেছিল সহজে। বস্তুতপক্ষে এখানেই ঘটেছিল লেখক হিসেবেও তাঁর শিক্ষানবীশীর উত্তরণ—রূপদক্ষতায়।

রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের মধ্যেই সোমেন চন্দ শুধু যে তাঁর লেখার বাস্তব জীবনের উপাদান পেয়েছিলেন তা নয়, ঢাকায় একটি সাহিত্য সংস্থার সংগঠক হিসেবে লেখার লক্ষ্যমাত্রাটিকে নির্ধারিত করতে পেরেছিলেন। এই সংস্থার নাম ছিল প্রগতি লেখক সংঘ। ঢাকায় এই সংঘ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে, সমগ্র উপমহাদেশের প্রগতি লেখক সংঘের শাখা নামে ঢাকার কয়েকজন তরুণ লেখককে নিয়ে।

সমগ্র উপমহাদেশের প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাজ্জাদ জহীর। বাংলা সাহিত্যের প্রগতি আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল লেখক লেখিকাই এই সংঘের লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চূড়ান্ত রূপ ফ্যাসিবাদের শোষণ থেকে মুক্তি ছিল লক্ষ্য—স্বাধীনতা ও জনগণের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। প্রগতি লেখক সংঘের কর্মসূচী ও সংগ্রামের একটি উৎস ফরাসী লেখক রেঁামা রোলাঁ এবং অাঁরি বারবুসের নেতৃত্বে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে গঠিত সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ—লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়েলিজম এণ্ড ওয়ার। এই সময়েই আমাদের উপমহাদেশে এবং বিশেষ করে তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম—অসহযোগ ও খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র বিপ্লব-প্রয়াস ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের স্তর থেকে গণ-বিপ্লবের স্তরে উঠে আসছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল জনগণের ব্যাপক শ্রেণী সংগঠনগুলির ঐক্যের এবং সুসংগঠিত জনচেতনার। এই দ্বিতীয় প্রয়োজনে সহায়তা করার দায়িত্ব বর্তেছিল প্রগতিমনা লেখক লেখিকাদের উপর। সুতরাং তিরিশের দশকে লেখক লেখিকারা যে প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ নির্দিষ্ট করেন, তাতে এসেছিল স্বদেশ ও নিজ অঞ্চলের জনগণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গভীর সংযোগ স্থাপনের তাগিদ।

প্রগতি লেখক সংঘের লেখক লেখিকারা এই ভাবে বাংলা গণমুখী সাহিত্যের ধারা পত্তন করেন। কর্মী এবং লেখক লেখিকাদের মধ্যে যে ব্যবধানের রেখা ছিল ইতিপূর্বে, সেটাকে দূর করার চেষ্টাও শুরু হয়। এই সময়ে স্পেনে সমাজতন্ত্রমুখী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উৎখাত করার জন্য বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী স্পেনের সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে নিয়োজিত করে। অন্যদিকে বিশ্বের

প্রগতিবাদী লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে রক্ষা করার জন্য 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' গঠন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই রণ-ক্ষেত্রেই রালফ ফকস্ ও ক্রিস্টফার কডওয়েলের মতো আরও অনেক লেখক-শিল্পী প্রাণোৎসর্গ করেন। প্রগতিমনা লেখক লেখিকাদের যে মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে, এসত্য তিরিশের দশকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যের শিল্পীদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সোমেন চন্দ এই চেতনায় লালিত হন। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন চন্দ প্রগতি লেখক সংঘের উপরোক্ত সমস্ত অভিজ্ঞতায় নিজেকে সজ্জিত করেন।

ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটা সন্ধিক্ষণে। শাখা স্থাপনের প্রস্তুতির মূলে ছিলেন কয়েকজন তরুণ লেখক যাঁরা ভাবছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণমুখী ঘোষণাপত্র অনুযায়ী অবিলম্বে কিছু করা দরকার। যাঁরা এই প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন সোমেন চন্দ, যাঁর বয়স তখন আঠারো আর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সতীশ পাকড়াশী (অগ্নিদিনের বর্মার লেখক), বাংলার অগ্নিযুগের পথিকৃৎদের একজন, যাঁর বয়স সে সময়ে পয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। সোমেনের দুই সমবয়সী বন্ধু একেবারে গোড়ার দিকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। একজন কিরণশংকর সেনগুপ্ত—সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অতি আধুনিক কবিতা লিখে নাম করেছিলেন, তাঁর কবিতার বই 'স্বপ্ন কামনা' তখন প্রকাশনার পথে—ভূমিকা লিখে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। অপরজন অমৃতকুমার দত্ত। তাঁর বাবা ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের স্বনামধন্য বাংলার শিক্ষক সুকুমার দত্ত। অমৃতকুমার দত্ত অবশ্য সেই বয়সেই একটা ব্যাংকের চাকরীতে ঢুকেছিলেন। তাঁর ঝোঁক ছিল গণকবিতা লেখার দিকে। তিনি সে সময়ের প্রখ্যাত ইটালিয়ান উপন্যাস 'ফন্টামারা'র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এদের সঙ্গে একত্র হয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, যাঁর বয়স তখন ২৭। পুরানো ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশণ্ডী মহল্লায় প্রগতি পাঠাগার ছিল সংঘের প্রথম কেন্দ্র। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সম্মেলন নাম দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘের উদ্বোধন হয়। গ্যাণ্ডারিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই এবং এর অব্যবহিত পরেই যাঁরা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগীদের মধ্যে আসেন তাঁদের মধ্যে একজন ফরিদপুরের অচ্যুত গোস্বামী, যিনি তখন ঢাকা নিবাসী ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই 'বাংলা

উপন্যাসের ধারা' লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর বয়স ছিল তখন ২২/২৩। অচ্যুত গোস্বামীর বড় ভাই দর্শনশাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক নৃপেন গোস্বামী প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নিবন্ধকার হিসেবে। ১৯৪০ সালে সংঘের প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন সরলানন্দ সেন, যিনি এক সময়ে সন্ন্যাসী ছিলেন। নাম ছিল সরলানন্দ স্বামী। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহী হন। সরলানন্দ সেন সেই সময়ে চীনের গণবিপ্লবের আখ্যান লিখতে শুরু করেন এবং প্রথম মাও সে তুং, চ্যু তে, পেং তে হুয়েই' এর জীবনীকার হিসেবে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকেই খ্যাতি লাভ করেন। আরেকজন ছিলেন জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, যাঁর বয়স ছিল তখন ২৬/২৭। তিনি তরুণ বয়সে বিপ্লবীদলে ঢোকেন। ১৯৩২ সালে ঢাকায় ট্রেন ডাকাতি রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে ৬ বছর সাজাখাটার পরে ১৯৩৮ সালে যক্ষারোগ নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। জেলখানায় তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তিনি বিজয় সেনগুপ্ত নামে বিভিন্ন প্রগতিশীল কাগজে লিখতে শুরু করেন। তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা সাহিত্যে জার্মান বিপ্লবী কবি ও নাট্যকার বার্টোল্ড ব্রেখটের উপর কয়েকটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ছিলেন ঢাকার রেলশ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রস্তুতিপর্বে সোমেন চন্দ যেমন প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠলো, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলির সবচেয়ে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত সদস্য। আগামী বৈঠকে কারা লেখা পড়বে—এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে নির্ধারিত বৈঠকে দেখা যেতো, সোমেনের উপর লেখার ভার থাকলে তিনি ঠিক লেখা নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্বটি নিখুঁত ভাবে পালন করতেন বলে প্রায় বৈঠকেই তাঁর উপর ভরসা করা হতো এবং তাঁকে লেখা আনতে বলা হত। এই তাগিদ একদিক দিয়ে তাঁর দিক থেকেও খুব কাজের হয়েছিল। দুবছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লিখেছিলেন, যেগুলি অধিকাংশই বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছের' অধিকাংশ লেখাই প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকে পড়া।

সংঘের বৈঠকে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া লেখা নিয়ে ১৯৪০ সালে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা

অতিক্রমণের অর্থে নামকরণ হয় 'ক্রান্তি'। যথাসময়ে ক্রান্তি (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ঢাকার একটি ছাপাখানা থেকে। ছাপাখানা থেকে বই বার করে আনার ব্যাপারে সোমেন চন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলে। সোমেনের 'বনস্পতি' গল্পটি এই ক্রান্তিতেই প্রকাশিত হয়। সোমেন প্রায় শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যান এবং সেখানকার প্রগতি লেখক লেখিকাদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রচারের বন্দোবস্ত করেন। এই সময়েই তিনি পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি দিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে সোমেনের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই এই গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হলে সাহিত্য রসিক মহলে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা নতুন বিন্যাসের তাগিদ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি এবং আরেকদিকে জার্মানী, ইটালি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মধ্যে যুদ্ধ বাধলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ভাগবাটোয়ারার যুদ্ধ। এজন্য এই যুদ্ধকে আমাদের উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। হিটলারের নাৎসী বা ফ্যাসিবাদী জার্মানী এবং চেম্বারলেন চার্চিলের বনেদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন এতে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের অন্তর্বিরোধ মেটাতে না পেরে, যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য তিরিশের দশকে বিশ্ববাসীর কাছে গোপন ছিল না। হিটলার সমেত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা পাল্লা দিয়ে সজ্জিত হচ্ছিল এবং একে অপরকে সাহায্যও করছিল মার্কিন ডলারের নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যস্থতায় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—সেটা ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং ইউরোপের যে কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভ্যুদয়কে ঠেকানো এবং এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিনষ্ট করে দেয়া। ১৯৩৮-৩৯ সালে স্পেনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে এরা এদের ক্রীড়নক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মারফৎ উৎখাত করেছিল। এরাই চীনে চিয়াংকাইশেকের দোসর হয়ে কমিউনিস্ট উচ্ছেদের অভিযান চালায়। এদের প্রধান রাগ কেন্দ্রীভূত ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো ভেঙ্গে প্রথম বেরিয়ে আসা স্বাধীনতা ও সাম্যের পতাকাবাহী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রভুত্ব ভাগাভাগিতে বনাতে না পেরে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে। এর পরে হিটলারের জার্মানীর ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনী প্রায় সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ দখল করার পরে মনে করে

এদের যথেষ্ট শক্তি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার বাহিনী অতর্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বিশ্বযুদ্ধের বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। আমাদের উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে স্বভাবতই একটা চিন্তা আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়াবার। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি গভীরভাবে উৎকন্ঠিত বোধ করছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে। প্রগতিবাদীদের অধিকাংশই ঠিক করেন যে, এই যুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা নেয়া যেতে পারে না। এখন আর এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং হিটলারের কর্তৃত্বাধীন জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্যই হিটলারের বাহিনীকে পরাজিত করা দরকার। প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের। ১৯৪১ সাল শেষ হবার আগেই চীনের একটা বিরাট অংশ দখলকারী জাপান হিটলার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইন্দোচীন ও বার্মাকে দখল করে সমগ্র এশিয়াকে কব্জা করতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী হিটলারের জার্মানী, ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির ইটালি এবং ফ্যাসিবাদী জাপানের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধতা করাটা প্রগতিবাদীদের কাছে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে সামনে আসে।

এই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের প্রগতি লেখক লেখিকারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে গণমত ও গণআন্দোলন গঠনে অবতীর্ণ হন।

এই সূত্রেই ঢাকায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে স্থাপিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ঢাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং এর নাম দেন 'সোভিয়েত মেলা'। সোমেন ছিলেন এই আয়োজনের সবচেয়ে খাটিয়ে কর্মী। সোমেন ছিলেন জনগণের কাছে 'চিত্র পরিচায়কদের' একজন। এই তরুণ পরিচায়ক যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে লেনিনের দেশের কথা বলতেন, তাঁর চারদিকেই বেশি ভিড় হত।

এর পরই ঢাকায় আটই মার্চ একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন ডাকা হয় সূতাকল শ্রমিকদের সহায়তায়। এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই

সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্ত কর্মী ও শিল্পী জীবনের।

কিন্তু মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই সোমেন আরও উজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠেন তাঁর বৈপ্লবিক সাধনার জন্যে, তাঁর বৈপ্লবিক লেখার জন্যে।

এদিক দিয়ে সোমেন চন্দ সেই মর্যাদাই পেয়েছিলেন, যা কয়েক বছর পরে অভিষিক্ত করেছিল সুকান্তকে। সোমেন চন্দ ও সুকান্ত এই কারণে যমজের মতো তুলনীয়। সুকান্তের কবিতার কাজ আর সোমেন চন্দের ছোটগল্পের কাজের মিলটা এই যে, দুজনেই তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতার গণবৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা সুস্পষ্ট রূপদাতা। প্রবীণ প্রবীণারা যেখানে এসে অনেকে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সাময়িকভাবে, সেখানে এই দুই বয়োঃকনিষ্ঠ শিল্পীর পদক্ষেপ অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও ছিল অসংশয়। নিষ্ঠা ও কুশলতা এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীও নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল দু'জনেরই এই বয়সে।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথম বই 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৯৪৩ সালে। এর প্রকাশক ছিল ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ—অর্থাৎ তাঁর সাথী লেখকেরা। দ্বিতীয় বই 'বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে এক বছর পরে। এর ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার।

এই সময়েই শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের স্ত্রী শ্রীমতি লীলা রায় সোমেনের 'সংকেত' গল্পের এবং অশোক মিত্র সোমেনের 'ইঁদুর' গল্পের যে ইংরেজী অনুবাদ করেন, তা ছাপা হলে বাংলার বাইরে সোমেন সম্বন্ধে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

সোমেন চন্দের স্মরণে কলকাতা থেকে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ 'প্রাচীর' নাম দিয়ে যে সংকলনিকা প্রকাশ করেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ ও নবীন প্রগতিবাদী লেখক লেখিকাদের অনেকেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। গণবৈপ্লবিক ধারায় শিল্পসম্মত গল্প লেখার অন্যতম প্রবর্তক রূপে চল্লিশের দশকে সোমেনের নাম দেশে এবং দেশের বাইরে চিহ্নিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে মাত্র চার বছরের সাধনার ফসলরূপে সোমেন যে কয়েকটি গল্প লিখে

রেখে যেতে পেরেছিলেন তাতেই তিনি মৃত্যুর পরে ঢাকা এবং কলকাতার প্রগতি লেখক লেখিকাদের সমচিন্তার সেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। '৪৭ সাল পর্যন্ত প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ (প্রগতি লেখক সংঘের এই নাম হয়েছিল ১৯৪৪ সালে) যে কয়েকটি 'ক্রান্তি' সংকলন বার করে এবং মাসিক প্রতিরোধ নামে যে পত্রিকা বার করে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই বাংলা সাহিত্যের তখনকার এবং এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকই লেখা দিয়েছিলেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা ক্রান্তিতে এবং একটি কবিতা প্রতিরোধে প্রকাশিত হয়।

চল্লিশের দশকে ঢাকায় প্রগতি সাহিত্যের প্রসার ও সাধনায় যে নবতরঙ্গ আসে, তাতে সোমেন-স্মৃতি ছিল মর্মকেন্দ্র। স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের আদর্শের পতাকাবাহী সোমেন যে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং সোমেনের লেখার শিল্পরূপের ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলার উদ্দেশ্যে ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ যে কর্মসূচী নেয়, তা বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে প্রগতিশীল লেখার দিকে টেনে নিয়ে আসে। অন্যান্য আরও কয়েকজনের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নূরুদ্দিন, সানাউল হক এবং শিক্ষাবিদ নাট্যকার কবীর চৌধুরীর লেখার সূচনা বলতে গেলে এই স্মরণ উৎসেই যুক্ত হয়েছিল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ ও এই স্মরণ উৎসে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের ৮ই মার্চ সোমেন চন্দের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত গুহ। তিনি বাংলাদেশের প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ সোমেনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই প্রতিরোধ নাম দিয়ে যে মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি বার করেছিল তাতেই প্রথম সোমেনের 'দাঙ্গা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই প্রতিরোধ প্রকাশিত হতো জি ঘোষের গলির মুখে একটি দালানের তেতালায় অবস্থিত প্রগতি লেখক সংঘের দফতর থেকে। এই সময়ে সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অজিত কুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখকে নিয়ে এই 'প্রতিরোধ'-কে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়ে ওঠে প্রগতি লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী। এদের একজন ছিলেন সে সময়ে ঢাকার গণসঙ্গীতের প্রবর্তক সাধন দাশগুপ্ত। সাধন দাশগুপ্ত নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। তিনি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সুরে সোমেন চন্দের উপর একটি গান লিখেছিলেন। এই গানটি তখনকার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং শ্রমিক কৃষক সমাবেশে গাওয়া হতো। সত্যেন সেন এই সময়েই তাঁর প্রখ্যাত গণসঙ্গীতগুলি লেখা শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে বাংলাদেশে যে ঔপনিবেশিক সামরিক স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ জারী হয় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ভাষা সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল সাহিত্যকে ধ্বংস করার জন্য যে নির্যাতন চলে, তার কোপে পড়ে প্রগতি লেখক সংঘ তার সংগঠনকে ধরে রাখতে পারেনি। এই অবস্থায় সোমেন চন্দের স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে আড়ালে চলে যায়। তবে ১৯৬৭-৬৮-৬৯ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের যে সূচনা হয়, তার মধ্য দিয়ে সোমেন চন্দের স্মৃতি আবার বিশেষ করে তরুণ সংগ্রামী লেখক লেখিকাদের সামনে আসে। শুরু হয় নতুন করে হারিয়ে যাওয়া সোমেন চন্দের ছোটগল্প সংগ্রহ। সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পের নাট্যরূপ দেন মোজাম্মেল হোসেন মন্টু এবং বাংলা একাডেমীতে ও পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে বাংলাদেশের নামকরা চলচ্চিত্র ও নাট্যকুশলীরা এই নাটক উপস্থিত করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে স্বভাবতই বাংলাদেশের সাহিত্যের নব প্রগতিক মূল্যায়নের তাগিদে সোমেন চন্দের ছোটগল্প সম্বন্ধে নতুন করে কৌতূহল জেগেছে।

বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটা নব সন্ধিক্ষণ এসেছে। বাংলা ছোটগল্পে একটা বৈপ্লবিক উত্তরণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যা সত্তরের দশকের জীবন সত্যকে গণমুখী শিল্পরূপে প্রকাশ করবে। সোমেন চন্দের লেখা এদিক দিয়ে গণমুখী গল্প লেখার শিল্প শৈলীর দৃষ্টান্তরূপে কাজ করবে।

বিশেষ করে মেহনতী মানুষকে পুরোভাগে রেখে জীবনের বৈপ্লবিক উন্মোচনের জন্য সাম্য ও স্বাধীনতার যে তাগিদ দেখা দিয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পরূপেও মর্মকেন্দ্র করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেই পটভূমিতে সোমেন চন্দকে নিয়ে আবার একটা আলোড়ন আসা স্বাভাবিক।

বাংলা সাহিত্যের যে পরিমণ্ডলটি ছিল সে সময়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকের শেষের দিকে, তাতে একটা নতুন গণধারা এনেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নতুন আয়োজন। বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি ও পূর্ণ অধিকারের দাবী যেমন দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ আদায় করছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ে, তেমনি শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে একটা সংগঠনেরও তাগিদ এসেছিল শ্রমিক কৃষকদের নিজেদের তাগিদে। এর বাস্তব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর সম্ভাবনার আধো-আলো আধো-ছায়াও বাংলা সাহিত্যে পেয়েছিল অভিব্যক্তি।

বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের গণমানবিক অভিব্যক্তির কথা আমরা জানি। কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা এসময়ের তারাশঙ্করের লেখা এখানে ছোটগল্পরূপে আদর্শ। এর তুলনায় তিরিশের দশকের বাংলা

সাহিত্যের গণমানবিকতা হয়েছিল ভিন্নতর। বিশের দশকে যা অভিহিত হয়েছিল আধুনিক বলে, তিরিশের দশকে তার উত্তরণ হয়েছিল প্রগতিতে। এই উত্তরণের প্রধান পার্থক্য-রেখাটি ছিল এই যে, 'আধুনিকতার' উদ্ভবের মূলে রাজনৈতিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান থাকলেও তা সমস্ত আধুনিকতায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি, নরনারীর বিদ্রোহ স্থান পেয়েছিল প্রধানত দেহাত্মিকভাবে। প্রগতির উদ্ভবের মূলে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের আয়োজনটি ছিল তা' প্রগতির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, নরনারীর বিদ্রোহ ছিল দেহাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রাষ্ট্রীক।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, আধুনিকই প্রগতিতে উত্তরিত হয়েছিল এবং আধুনিকের বেশ কিছু উপকরণ প্রগতিতে জায়গা করে নিয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, প্রগতির মধ্যে ছিল আধুনিকের দ্বন্দ্ব-ঐকাত্মিক বিন্যাস। বাংলা সাহিত্যের বিশ ও তিরিশের দশকের গণমানবমানবী নিয়ে লেখার শিল্পশৈলী অথবা বিষয়বস্তুতে এজন্য পাওয়া যেতে পারে উপকরণের মিশ্রণ।

এই মিশ্রণ থেকে প্রগতির একটা পরিষ্কার গুণগত পার্থক্য নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রগতির সচেতন কারিগররা চেষ্টা করেন—রাজনৈতিক ও শিল্পশৈলীগত উপকরণ ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই।

সোমেন চন্দের স্থান এই সচেতন পার্থক্য নির্দেশক কারিগরদের মধ্যে গণনীয়।

সোমেন চন্দকে এ ধরনের লেখার ব্যাপারে পথিকৃৎ বলে যদি চিহ্নিত করতে চাই, তাহলে দেখবো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে প্রগতির ধারাকে যে গুণগত পার্থক্যে উন্নীত করেছেন, তার সূচনা হয়েছিল সোমেন চন্দের লেখায়।

ব্যাপক গণজীবনের গতিধারা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মানবমানবীর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বিদ্যুতাণুযন্ত্রের মতো ধরতে পারার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সোমেন চন্দ, কারণ তাঁর পা ছিল মাটিতে। গ্রাম বাংলার মানুষকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ঢাকা শহরে পড়াশোনা করলেও ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন গ্রামে। সেখানে দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি তাঁর 'স্বপ্ন' এবং 'গান' নামের দুটি গল্পে যেসব গ্রামীণ চরিত্র-ছবি দিয়েছেন, তাতে এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। ১৯৪০ সালে ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নেমে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন কলকারখানার শ্রমিকদের অন্তর্জীবনকে। শ্রমিকদের মধ্যে তিনি সম্ভবত তাঁর চেনা গ্রামীণ মানুষের দেখাও পেয়েছিলেন যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু হয়েছে প্রধানত সংগঠনের ছাঁচে। 'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়।

সে সময়ে অবশ্য সবচেয়ে বড় এবং সর্বাত্মক যে ঘটনাটা ঘটছিল সেটা বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সংগ্রাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক যুবতীদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী দেখেছিলেন তিনি অন্তরঙ্গভাবেই। তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে নিম্নবিত্ত কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে গণবিপ্লবের আয়োজনের তাগিদে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে নতুন পথে চলতে থাকেন। সোমেনও তাই করেন। এই নতুন চিন্তার সেদিনকার আধো আলোয় আলোকিত পথে যারা চলতে শুরু করেছিলেন, তাদের অন্তর্জগতের বিন্যাসটিকেও সোমেন গভীর সহানুভূতি নিয়ে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে প্রেমকে তিনি প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেন নি। এর প্রমাণ 'একটি রাত' গল্পটি। মহাকাব্যিক ধরনের গল্প 'বনস্পতির' মূল ছাঁচটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দীর পর্বগুলিতে তিনি প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুত প্রেম সোমেন চন্দের ছোটগল্পের একটি মূল উপাদান। অতি সাধারণ ও কিছু অসাধারণ, চাপা এবং খোলা, অন্তর্মুখী এই প্রেমের চরিত্র। কিন্তু এ প্রেম হচ্ছে প্রধানত তাদের, যাদের মুখ সামগ্রিক জীবনের দিকে। এদের সবাই যে জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নয়। তবুও প্রেম এদের কাউকে বিবরগামী বা গামিনী করে নি।

সোমেন চন্দ তার কাহিনী এবং চরিত্র নিয়েছিলেন জীবন থেকে। সুতরাং সে সময়ে তার চারপাশে ঘটনামূলক ছোট বড় সবকিছুর জন্যেই তাঁর চোখ খোলা থাকতো। সে সময়ে ঢাকায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এ নিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। 'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর এই গল্পের বাইরে রাখেননি। তিনি যে সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্যদিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটাকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।

খোলাখুলি রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক গল্পের পাশাপাশি সোমেন যে কয়েকটি তথাকথিত অরাজনৈতিক গল্প লিখেছিলেন, সেগুলিও তাঁর সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে থেকে লেখা ছিল না। নিপীড়িত ও ব্যথিত মানুষের জন্যে যে বোধ তাঁকে কমিউনিস্ট করেছিল, সেই সব বোধ তাঁকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাদামাটা গল্প লিখতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'সত্যবতীর বিদায়' গল্পটিকে এই ধারায় ফেলা যেতে পারে।

সাধারণ ও সাদামাটা মানুষের অন্তরাত্মার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি মানুষের আত্মজৈবিক অথবা জৈব আত্মিক যে উপাদানগুলির খোঁজ পেয়েছিলেন,

সেগুলিই সংগ্রামী চরিত্রে নতুন ভাবে দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় বিন্যস্ত এবং এইভাবে নবগুণে উত্তরিত হয়, এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে গল্প লিখেছেন, তাতে বিপ্লবী চরিত্রগুলি রক্ত মাংসে তৈরি গোটা গোটা মানুষ। সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখতেন সোমেন ঠিকই কিন্তু সাম্যবাদ যারা আনছে তাদের উপর তিনি তাঁর স্বপ্নকে আরোপ করেন নি, তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বপ্নকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। এদিকে দিয়ে সোমেন চন্দকে বাংলা ছোটগল্পের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের একজন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা

সাহিত্য আর প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ যে পরস্পরের পরম মিত্র হতে পারে সে কথা মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনগুলিতে একটা প্রমাণ নিয়ে সামনে এসেছিল। ১৯৪২ সালে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দেয়ার পথে তরুণ গল্প লেখক সোমেন চন্দ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হয়, তখন সেই রক্তাক্ত মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাংলা সাহিত্য আর রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। পরের বছর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত সোমেন স্মৃতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, উদীয়মান গল্প লেখক। তখনও তিনি ছাত্র। তবে আসল যোগটা ঘটলো প্রগতিশীল সাহিত্য আর মার্কসীয় রাজনীতির মধ্যে।

মুনীর চৌধুরী গুছিয়ে বক্তব্য বলতে অল্প বয়সেই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তিবাদী হিসেবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকেই আঘাত করতেন প্রধানত। কবিতা তিনি কদাচিৎ লিখতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গদ্যে। ভলটেয়ারের ধাঁচ ছিল তার মধ্যে।

আমাদের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পর্কের সূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর এই ধর্মীয় গোঁড়ামী-বিরোধী মুখরতার দরুণ।

তখন সেই যুগ চলছে যার কবি সুকান্ত। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করার নিশানা লাল নিশান। তবে ঢাকায় আমরা যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুতরাং আমাদের লাল নিশানের রাজনীতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনীতি। আর মুনীর চৌধুরী এই সংগ্রামের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শরীক হয়েছিলেন তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক অসাম্প্রদায়িকতার প্রবণতা নিয়ে। মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' নাটকের নায়ক তিনি নিজেই। এই নাটকের জন্ম হয়েছিল আমাদের সাধারণ রাজনৈতিক সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা থেকে। মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়িকে বুঝতে হলে এই 'মানুষ' নাটকটি পড়তে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছিলেন মুনীর চৌধুরী ইংরেজী সাহিত্যের একজন সেরা ছাত্র হিসেবে। অধ্যাপনা তাঁর জন্যে ছিল নির্দিষ্ট হয়ে। কিন্তু প্রগতিশীল সক্রিয় রাজনীতি তাঁকে টানছিল। সারা সময়ের কমিউনিস্ট কর্মী হবার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। বস্তুতঃপক্ষে আমরা যদি চাপ

দিতাম তাহলে সরদার ফজলুল করিমের মতো মুনীর চৌধুরীও অধ্যাপনা ছেড়ে দিতেন। আমরাই হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তিনি যদি অধ্যাপনা করেন এবং কমিউনিস্ট হিসেবে কাজ করেন তাহলে লাল নিশানের রাজনীতির পক্ষে তা সহায়ক হবে এরকম একটা কথা ছিল আমাদের মনে। আমরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন রাজনীতিবর্জিতভাবে শিক্ষক জীবনকে চূড়ান্ত গুরুত্ব এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য দিয়ে, তার জন্যে আংশিকভাবে দায়ী আমরা ও তাঁর সাথীরা যারা প্রধানত প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেছি। এ ব্যাপারটা ঘটবার আগে সমস্ত মিলিয়ে মুনীর চৌধুরী সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে যে সম্মেলন সাধন করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল অনির্দেশ্যতা। তিনি নিজেও একটা পরিষ্কার ফয়সালা করে নেননি। আমরাও বিশেষ করে যারা তাঁর সাহিত্যিক সতীর্থ ছিলাম তারাও ফয়সালা করে দেইনি। এই অবস্থাতেই মুনীর চৌধুরী ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার এই সময়েই শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির অগ্নিপরীক্ষা। মুসলিম লীগ শাসনের সমস্ত রোষ পড়েছিল কমিউনিস্টদের উপর। দু'টি ঘটনার কথা মনে আছে। মুনীর চৌধুরী সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দুরূহ দায়িত্বে শরীক হয়েছিলেন।

সেটা বোধহয় ১৯৪৮ সালের মে মাস। আমাদের কয়েকজন কমরেড তখন আত্মগোপন করেছেন। আমরা কয়েকজন বাইরে খোলাখুলি পার্টি অফিস চালাচ্ছি। ঠিক হলো আমরা এক সঙ্গে বসবো। নারায়ণগঞ্জ থেকে অদূরে লক্ষ্যা নদীর অপর পাড়ে একটি গ্রামে আমরা দু'দিন আলোচনায় বসেছিলাম। সেখানে মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন উচ্ছল প্রাণবন্ত সঙ্গী হিসেবে। মুনীর চৌধুরীর একটা গুণ ছিল এটাই। অত্যন্ত সঙ্গীণ মুহূর্তে এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে তিনি সহজ হতে পারতেন। গ্রামে থাকার সেই দু'টি দিনের কথা কোনদিন ভুলব না। মনে পড়ে সকাল বেলায় যখন নৌকোয় লক্ষ্যা পেরিয়ে আসি, তখন নদীতে খুব ঢেউ ছিল। আমরা একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কিভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবো সে সম্বন্ধে একটা সাহসী পরিকল্পনা নিয়েই ফিরেছিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল '৪৮ সনেরই ৩০শে জুন। এর দিন সাতেক আগে আমরা ঠিক করেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য রাখবো জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি। ৩০শে জুন দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সদর ঘাট পার্কে জনসভার জন্য। সাতদিন ধরেই আমরা বিকেলে লালঝাণ্ডা

নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মোড়ের সভা মারফত ৩০শে জুনের সভার বিষয়টিকে সবাইকে জানাচ্ছিলাম। কিছুটা গেরিলা পদ্ধতিতে আমাদের যাতায়াত করতে হতো লাল নিশান নিয়ে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের উপর হামলা হতে পারতো। এই রকম বিকেলে আমরা তিন চার জন একটা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ঢাকার একটি জনাকীর্ণ মহল্লার দিকে যাত্রা করলাম। মুনীরও আমাদের মধ্যে ছিলেন। লাল ঝাণ্ডাটা মাঝে মাঝে হাত বদল হচ্ছিল। মুনীর চৌধুরীকে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দেখতে বেশ ভাল লাগতো। ওর জামাকাপড় ছিল খুব সাধারণ। মুখচ্ছবিতে ছিল প্রতিভার বিস্ফুরণ। মাঝখানে একসময় হঠাৎ সে আমার হাতে নিশানটা তুলে দিয়ে একটা রিক্সায় চেপে বসে বল্‌লো 'একেবারে মনে ছিল না, রেডিওতে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে।'

তিরস্কারের দৃষ্টি পড়েছিল তার মুখের উপর। তবে যেতে দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই দিন কয়েক দেখা না হবার ফলে উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম জনসভার দিন কাকে পাবো, কাকে পাবো না ভেবে। মুনীর চৌধুরী কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তটিতে। বিরাট হামলার ঝুঁকি নিয়ে আমরা সদরঘাট পার্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মুনীর চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছিলাম। সভার শেষের দিকে মুসলিম লীগের লোকেরা আমাদের সভা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমরা পার্টি অফিসে চলে আসার পর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচণ্ড হামলার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার মধ্যে মুনীর চৌধুরীও একজন ছিলেন।

এর পরে '৪৯ সালে দেখা হলো কারাগারে, এই সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের সর্বশেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং এই কারণেই সমস্ত সাথীর কাছ থেকে ষোল আনা সংগ্রাম আদায় ছিল আমাদের চাহিদা। সুতরাং মুনীর চৌধুরীর কাছ থেকেও চেয়েছিলাম অন্য কিছু নয়, সাহিত্য নয়, অধ্যাপনা নয়, শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এখানেই আমাদের ভুল হয়েছিল, তাঁরও ভুল হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী তখন কিছুটা অধ্যাপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর কাছে সাহিত্য বোধহয় বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে একচুল আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। এক চুল পার্থক্যই সে সময়ে পারস্পরিক চিন্তার ব্যবধানের বিস্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমরা সেই মুহূর্তে মনে করেছিলাম, তাহলে তাঁকে আর রাখা অনাবশ্যক, তিনিও মনে করেছিলেন তাহলে থাকা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি আর জেলখানায় পড়ে থাকার মধ্যে কিছু দেখলেন না। কর্তৃপক্ষ একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা মুনীর চৌধুরীকে ছেড়ে দিল এই মনে করে তিনি আর

রাজনীতি করবেন না। কিন্তু আমাদের, মুনীর চৌধুরীর নিজের এবং কর্তৃপক্ষের হিসেবে গোড়াতেই ভুল হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরে মুনীর চৌধুরী গ্রেফতার হলেন। কারাগারে আটক থাকলেন, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত। এই জেলে থাকার সময়েই মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকটি লেখেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে একটি নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা জেলে দু'নম্বর খাঁচায় আটক কমিউনিস্ট বন্দীরা। তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখে দিতে। যেহেতু আমার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বরাবরই, সেজন্য সকলের হয়ে আমি পুরানা হাজত হতে গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীকে নাটক লিখে দেবার জন্যে। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা জেলের দেওয়ানী নামক ছোট ঘরটিতে আটক থাকতেন।

এই 'কবর' নাটকটি আবার প্রমাণ করে সাহিত্য আর বৈপ্লবিক রাজনীতিকে একত্র করার জন্যে যে চেষ্টা একজন বিপ্লবী লেখককে করতে হয়, এতে মুনীর চৌধুরী কত সাবলীল ছিলেন। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে তিনি অনায়াসে সাঁতরাতে পারতেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি এরপর মাত্র দু'মাস বাইরে ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে নাকচ করে সামরিক গভর্ণরের শাসন জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এই সময়ে প্রায় পাঁচ মাস আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তিনি জেল থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ঘরে গিয়ে বসতেন। ইংরেজীর ছাত্র অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলা ভাষা আন্দোলনে জেল খাটার সময় প্রগতিশীল রাজনীতি, মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য বাংলাকেই অনেক ভেবে চিন্তে নির্বাচন করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে ঢুকলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর পরে আমরা সবাই, তিনি নিজে এবং কর্তৃপক্ষীয়েরাও ধরে নিয়েছিল মুনীর চৌধুরী প্রগতিশীল রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। মুনীর চৌধুরী ভাষাবিদ, মুনীর চৌধুরী শিক্ষাবিদ, মুনীর চৌধুরী বাগ্মী, এই হয়েছিল তাঁর পরিচয়। কিন্তু কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী যে মরে যায়নি এর প্রমাণ তাঁর নানা কাজের মধ্যে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসতো। কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার জন্যে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারেনি বলে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শুধু বাগ্মী মুনীর চৌধুরী রূপেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। আর কিছু নয়। কিন্তু আমরাও অবিচার

করেছিলাম শুধু বাইরেরটা দেখে। মনে পড়ে ১৯৬৫ সালে একবার চলচ্চিত্র উৎসবের একটি আলোচনা সভায় মুনীর চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। আমাকে মূল বক্তব্য উপস্থিত করতে বলা হয়েছিল। এখানে শিল্পকলা আর বৈপ্লবিক রাজনীতির গভীর সম্পর্কের প্রয়োজনটিকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। বিপ্লবী মানবতা কথাটা নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমার চেয়ে অনেক ভাল করে যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তাঁর সভাপতির ভাষণে। এই ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ঘষা লাগালেই আগুন জ্বলে উঠত। একটা জায়গা ছিল মুনীর চৌধুরীর সত্তার, যেখানে কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট হিসেবে বারবার মাথা তুলেছেন বিদ্রোহের লাল নিশান হাতে। এইখানেই ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী মুনীর চৌধুরীর দুনিবার ভবিষ্যৎ। এই কারণে পরের দিকে তাঁর কথা উঠলে অনেক সময় মনে হয়েছে, তাঁকে আবার সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতির ক্ষেত্রে যৌবনের মতো ফিরে পাবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারার শত্রুরা তাঁর এই ভবিষ্যৎকে তাদের হায়নার চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিল বলেই কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রগতিবাদী লেখক মুনীর চৌধুরীকে তারা হত্যা করেছে।

এখন রক্তের সাগর থেকে কমরেড মুনীর চৌধুরীকে তুলে আনতে গিয়ে আমরা যারা সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতিকে নবগুণাত্মকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, তাদের বিপ্লবী অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিপ্লবীদের পরস্পরের হাতে হাত রেখে দুর্গম পথে অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে শিখতে হবে। মনে মন রেখে চলতে শিখতে হবে। অতর্কিতে হাত ছুটে গেলেও আবার হাতে হাত রাখতে পারা যাবে সানন্দে। তা না হলে মুনীর চৌধুরীকে ফিরে পেয়ে কি শিখলাম?

শহীদুল্লা কায়সার—কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে স্বাধীনতার দাবীতে গণবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই অভ্যুদয়কে সামনে রেখে সুকান্ত লিখেছিলেন, 'এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ, দিকে দিকে উঠে অবাধ্যতারই ঢেউ।' বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধেও অবাক পৃথিবীকে আবারও অবাক করে 'এত বিদ্রোহ' অগ্নিশিখার ঘটনা ঘটেছে নূতন রূপে। এই বিদ্রোহের আলেখ্য রচয়িতা লেখক, লেখিকা, কবি, শিল্পী যাঁরা, তাঁদের একজন শহীদুল্লা কায়সার। ৪৭-এ সুকান্তের সমবয়সী। ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলেন। রেখে গেলেন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লববাদী জীবনের রক্তাক্ত স্বাক্ষর। দাখিল করে গেলেন বহু বহুবর্ণিল নারী ও পুরুষের ব্যক্তিচরিত্রের একক, দ্বৈত ও সমবেত বিদ্রোহাগ্নির অমর আলেখ্য লিপিকা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাহিনী রচয়িতা রচয়িত্রী নক্ষত্রপুঞ্জের একটি আগ্নেয় তারা তিনি। আমরা এখানে তাঁর বৈশিষ্ট্যটিকে খানিকটা খুঁটিয়ে দেখছি।

১

শহীদুল্লা কায়সার '৪৮ থেকে '৭১ সালের মধ্যে ৮ বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং বাদবাকী সময়েও সদাসক্রিয় কমিউনিস্ট রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর ৪৫ বছরের জীবনে কৈশোরেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রগতিবাদী চিন্তা ও কাজের অনুসারী হয়েছেন। কলেজ জীবন কলকাতায়, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ঢাকায়। নাগরিক আদব কায়দা তিনি রপ্ত করেছিলেন। অন্যদিকে নোয়াখালি তথা পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের আকাড়া পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন। নাড়ির যোগ ছিল তাঁর গ্রাম্য নারী পুরুষের সঙ্গে লোকভাষায় ও আচার ব্যবহারে। সুতরাং সব মিলিয়ে ধ্রুপদী, আধুনিক ও লোকায়ত, এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিহার।

বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আলেম ও মাদ্রাসা আলিয়ার অধ্যাপক। জননী ছিলেন সুযোগ্যা ধর্মানুরাগিণী। পবিত্র কোরান শহীদুল্লা কায়সারের কৈশোরেই আয়ত্তে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মা যেমন আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুযোগ ছেলের সামনে স্থাপন করেছিলেন, তেমনি শহীদুল্লা নিজেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত সমস্ত ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত স্বাধীনতার আধুনিকতম লক্ষ্য ও কার্যক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ

গণতান্ত্রিক মৈত্রীর অপরিহার্যতাকে শৈশব কৈশোরেই নির্দেশিত করে নিয়েছিলেন। যৌবনে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বিশ্বশ্রমজীবী আন্তর্জাতিকতার চেতনার সহায় ও সঙ্গী হলো কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

উপরোক্ত আত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি এবং তার বিস্তারণের তাগিদ ও প্রবণতা নিয়ে শহীদুল্লা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং জনগণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ব্যাপক ও গভীরভাবে। এই পর্যায়েই তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং চরিত্রালেখ্য ও রেখাচিত্র-কবিতা লেখার ব্যাপারটা ঘটেছিল। তিনি ছিলেন বিশেষ করে অর্থনীতির ছাত্র এবং নিবন্ধ রচনা ও উপস্থিত বক্তৃতাই ছিল তাঁর বক্তব্য দাখিলের মাধ্যম। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে অনুজ জহির রায়হানের গল্প ও উপন্যাস লেখায় উৎসাহ দিতেন এই আশায় যে জহির সাহিত্যের দিকে কাজ করবেন। জহির বড় ভাই-এর এই প্রত্যাশা পূরণও করেছেন। কিন্তু শহীদুল্লা নিজেও লিখতে শুরু করেন। '৪৮ সালে জেলে ঢুকে নতুন অভিজ্ঞতার অভিনবত্বের আলোয় ডায়েরীতে বিভিন্ন মন্তব্য এবং দুয়েকটি কথাচিত্র ও এমনকি কবিতার পংক্তি রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির মালমসলা নিয়ে কাজ করতে করতে অজান্তেই এগিয়ে এলেন পুরোদমে উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখার দিকে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলের বাইরে 'প্রবাহ' নামের একটি সাহিত্য পত্রিকার সাথে নিজেকে জড়ালেন। যদিও সম্পাদকীয় বক্তব্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখলেন। '৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হবার পরে যখন অন্যান্য সাথীরা জেলখানায় নারকেল খেজুর গাছের চারার খেদমতে দীর্ঘ কারাবাসের মেয়াদ কাটাবার পরিকল্পনা করছেন, কিছুটা কৌতুক করেই তখন শহীদুল্লা ঠিক করলেন গল্প উপন্যাস লিখবেন। এবং লিখলেন। এই সময়েই যখন তাঁর ইতিপূর্বেকার একটা মামলার সাজা শেষ হয়ে গেলো এবং জাঙ্গিয়া কোর্তা পরিয়ে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে রাখা হলো তখন তিনি দুর্দমনীয়ই হয়ে উঠলেন। এই মেয়াদ পার হবার পরেও তিনটি বই-এর খসড়া রচনা শেষ করে রাখলেন। এরা হলো 'রাজবন্দীর রোজনামচা', 'সংশপ্তক' ও 'সারেং-বৌ'। '৬২-তে বাইরে এসে প্রধানতঃ এই তিনটি বই ছাপাখানার জন্য মেজেঘষে তৈরি করলেন। একটার পর একটা বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শহীদুল্লা কায়সার চিহ্নিত হলেন বাংলাদেশের একজন সেরা ঔপন্যাসিক হিসেবে। '৭১ সালের মধ্যে তিনি লিখলেন উপন্যাস 'চন্দ্রভানের কন্যা' এবং রেখে গেলেন অসমাপ্ত উপন্যাস 'কবে পোহাবে বিভাবরী'।

আমরা যে ঝড়ের মতো বিবরণীটি পেশ করলাম, উপরোক্ত বই তিনটি তেমনি ঝড়ের বেগে লিখেছিলেন শহীদুল্লা। তবে এরই মধ্যে 'সংশপ্তক'

উপন্যাসের মতো ধ্রুপদী কাঠামোর বনস্পতিকে আশ্রয় করে অপরাজিতা লতার ফুল ফোটানোর মতো বেশ কয়েকটা গীতি কবিতা লিখেছিলেন শহীদুল্লা। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি বড় বইগুলির ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা গুল্মের ঝোপ আর ফুলের ঝাড়ের মতো থোকা থোকা করে মৃত্তিকাশ্রয়ী ছোট গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ সপ্তকের একটি কবিতার ভাষায় বলা যেতে পারে, কবিতাগুলি আকাশে উঠে গিয়েছে তাদের ভাবলৌকিকতা নিয়ে এবং ছোটগল্পগুলি মাটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের বাস্তবতাবাদ নিয়ে। এছাড়া ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী হিসেবে 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দে' সেই সময়ে পাকিস্তানের চৌহদ্দির বাইরে যাবার একটিমাত্র সুযোগকে সংবাদসাহিত্যে শ্রমজীবী জনগণ ও স্বাধীনতার আন্তর্জাতিকতার মাত্রা রচনার কাজে লাগিয়েছেন। লিখেছেন 'রিপোর্তাজ' বা সাহিত্যের ধারার ঘটনার বিবরণ।

২

উপরোক্ত পরিক্রমাকে সামনে রেখে এবার আমরা শহীদুল্লার উপন্যাস ও ছোটগল্পের এবং আখ্যানের নায়ক নায়িকাদের কথায় যেতে পারি। কারণ শহীদুল্লার মতোই তাঁর নায়ক নায়িকারাও বিখ্যাত হয়েছে। তারা বরং বেশি বিখ্যাত। আমরা এখানে দেখবো, শহীদুল্লা নিজেকেই শুধু বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় একটি আগ্নেয় তারা হিসেবে একজন দিশারীরূপে দাখিল করেছেন তা নয়, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের কিরণময়ী, শৈবালিনী কিংবা দামিনীর মতো চিরঞ্জীব নায়িকাদের পাশে, অথবা পরবর্তীকালের দুর্গা অথবা রত্তার পাশে স্থাপন করলেন 'সারেং বৌ'-এর নবিতুন, 'সংশপ্তকের' হুরমতি ও রাবু, 'চন্দ্রভানের কন্যা' সকিনা, ছোটগল্প 'অনমিতা' ও 'অনিরুদ্ধার' নূরজাহান ও খালেদাকে। বাংলা কথাসাহিত্যের নামী নামী নায়কদের পাশে তিনি রাখলেন 'সংশপ্তক' উপন্যাসের জাহেদ, 'সারেং বৌ'-এর কদম আলি, এবং 'রাজবন্দীর রোজনামচার' ২৫ চরিত্রকে। এরা শহীদুল্লা কায়সারের জীবনবৃত্তের মধ্যে আসা নারী পুরুষদের মাত্র কয়েকজন। এরা অমর জনগণের কয়েকজন প্রতিনিধি। এরা সাহিত্যের ধারায় চলেছেন চলমান জনগণের সঙ্গে। থাকছে, থাকবে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে সাধারণভাবে সকল ভাষার সকল দেশের সকল জনগণের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য একটা সংজ্ঞার উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সহিত' থেকে, অর্থাৎ সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এখানে সাহিত্যকে আমরা দেখব অগণিত চরিত্রের মধ্য থেকে অবয়ব তৈরি করে নিয়ে চলার সাথী হিসেবে। লেখক লেখিকাদের বাঁচার ব্যাপারে এটা একটা উপাদান। নবিতুন বেঁচে থেকে শহীদুল্লাকে বাঁচাবে। যেমন চিন্তামণি বেঁচে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রকৃতপক্ষে মাত্র বারো তেরো বছরের মধ্যে লেখা 'সংশপ্তক' থেকে 'সারেং বৌ' ও 'রাজবন্দীর রোজনামচা' হয়ে 'চন্দ্রভানের কন্যা'র পরে অসমাপ্ত 'কবে পোহাবে বিভাবরী'র নায়ক নায়িকারা সেই বিদ্রোহী অবাধ্য অগ্নিশিখাদের কয়েকটি, যারা সমবেত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পৌঁছে দিল ৭১-এর বিজয়ে। এটাও অমরতার দাবীদার উপাদান। শহীদুল্লার সমস্ত বিদ্রোহী নারী পুরুষ চরিত্রই বেরিয়ে এসেছে বাস্তবতার মধ্যেকার অনিবার্য সম্ভাব্যতা থেকে। শহীদুল্লার ইচ্ছাচারিতা থেকে এদের উদ্ভব হয়নি। শহীদুল্লার কৃতিত্ব হচ্ছে এদের উদ্ভবকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে চিহ্নিত করতে পারা। আমরা শুরুতেই শহীদুল্লার যে প্রস্তুতির উল্লেখ করেছি, তা এই চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটাকে সাহায্য করেছে। এই সঙ্গে খুঁটিনাটি আরও কিছু প্রস্তুতির কথা বলার দরকার হতে পারে। আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা এবং বাংলা একাডেমী ও বেগম পান্না কায়সারের সহযোগিতায় এবং অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েনের সম্পাদনায় প্রকাশিত শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীতে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প এবং দিনলিপি থেকে শহীদুল্লার প্রস্তুতির উপরোক্ত খুটিনাটি বেরিয়ে এসেছে। জানতে পারা গিয়েছে 'সারেং বৌ' রচয়িতার বাস্তববাদিতার ব্যাপ্তিকে আরও ভালভাবে। জানতে পারা গিয়েছে, অর্থনীতির সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করেই তিনি সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ অস্থিমজ্জা রক্তমাংসে স্নায়ুশিরায় তৈরি মানুষকে গভীরভাবে জেনেছিলেন সাহিত্যের জগতে ডুব দিয়ে।

৩

শহীদুল্লার উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য আলেখ্যের নায়ক-নায়িকাদের প্রাণবন্ত উদ্ভবের দিকটাকে আমরা এবার আরেকভাবে দেখবো, লেখককে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের কথাই প্রথমে ধরা যাক, তাদের সঙ্গী হয়েছে কারাগার, তাদের যাঁচাই হয়েছে পাষাণপুরীতে। একজন মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে শহীদুল্লাকেও কারাগারে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। এই জেলজীবনে তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টির অভিনব প্রয়াসে ব্রতী হবার মতো মনের জোর খাটাতে শিখেছেন তা নয়, এখানে যাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের এত গভীরভাবে দেখতে পেয়েছেন যেটা বাইরে মেলামেশার মধ্যে পাননি। রাজনৈতিক বন্দী-সাথীদের তো কথাই নেই, যে সাধারণ মানুষদের তিনি বাইরে দেখবার এবং বঝবার চেষ্টা করেছিলেন, তারা এখানে নিকটতম সান্নিধ্যে আসার দরুণ একেকটা নবাবিষ্কৃত জগতের মতো মনে হয়েছে তাঁর কাছে। মানবচরিত্রের সঙ্গে এই পরিচয় তাঁকে

জেলখানায় বিভিন্ন জনকে নিয়ে এমন লেখায় উৎসাহিত করেছে, যা শতাব্দী কালের সমস্তদিক দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলা কারা-সাহিত্যেও নূতন ধরনের সংযোজন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী' এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতিয়া চৌধুরীর 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা', সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' ও আব্দুস শহীদের জেলজীবনের কথার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের কারাগারের গল্পগুলি এবং 'রাজবন্দীর রোজনামচা' একটা অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। একজন ধ্রুপদী কথাশিল্পীর প্রবণতা নিয়ে শহীদুল্লা জেলখানায় কাছে থেকে দেখা নারী পুরুষের বিশিষ্ট চরিত-কায়াকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর এই পদ্ধতি হচ্ছে মানব মানবীর চরিত্রের আবেগঘন ঝড় ঝঞ্ঝার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা। বিশেষ করে বিদ্রোহী ও বিদ্রোহিনী চরিত্র তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি তাঁদের আলেখ্যই বিশেষ করে আঁকতে চেয়েছেন। তাদের জবানবন্দী শুনেছেন এবং সেখান থেকে বিদ্রোহের সূত্র ধরে তাদের শিকড়ের অথবা উৎসের সন্ধানে চলে গিয়েছেন বাইরের জগতে, বাইরের জগতের নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জেলখানার অভিজ্ঞতাকে মিলিয়েছেন। নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন তিনি এই পদ্ধতিতে তাঁর পরিচিত বাইরের জগৎটাকে। জেলখানায় পাওয়া সূত্র নিয়ে এবং সারেং অধ্যুষিত নোয়াখালি চট্টগ্রামের ছেলে হিসেবে সাগর এবং ডাঙ্গার খোঁজখবর যা রাখতেন তার ভিত্তিতে জেলে বসে 'সারেং বৌ' লিখে ফেলেন। এখানে শুধু উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে 'সারেং বৌ'-এর নায়ক কদম আলি বিনাদোষে তিনবছর জেল খেটেছে বর্ণিত কাহিনীর বলয়ের মধ্যেই। হয়তো এমনই কোন কারাগারের সাথীর কাছে পেয়েছেন নবিতুনের কাহিনীর সূত্র।

অবশ্য বাইরের জগৎ সম্বন্ধে শহীদুল্লার নিজ অভিজ্ঞতা অজান্তেও তাঁর আধুনিক বৈদগ্ধের মধ্যেও জমেছিল। জেলখানা তাঁর চোখ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিল, হৃদয়কে পুরোপুরি উন্মোচিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর একটা জনমুখিতা ও বিদ্রোহ প্রবণতা বাইরেই গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গেই 'সংশপ্তক' উপন্যাসের পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনী ও কুশীলব জেলখানার বাইরের। এর শেষ পরিচ্ছেদে জেলখানার অবতারণা থাকলেও উপন্যাসের অভিজ্ঞতার বাইরে সে তখনও। এই পরিচ্ছেদে দেখা গেল, মুক্তিসংগ্রামী জাহেদ ধরা পড়েছে, সে জেলে চলেছে। তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে পঞ্চাশের দশকের শুরু পর্যন্ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগ ও তার পরের কিছু সময়ের বিভিন্ন নারী ও পুরুষের জীবন কথায় জেলখানার ব্যাপারটা আসেনি। তবে

জেলে বসে শহীদুল্লা স্মৃতিমন্থন করে যা লিখলেন, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বাইরেও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নরনারী চরিত্রকে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহী ও বিদ্রোহিনীদের লক্ষ্য করেছিলেন এবং কথাবার্তা শুনেছিলেন বলেই ষাটের দশকের শুরুতে সময় পেয়ে পরিচিত সংগ্রামী চরিত্রদের উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারলেন। বাইরে বেরিয়ে মাজাঘষা করে প্রকাশ করলেও খসড়াটা সত্যকে পুরোপুরি আধারিত করেছিল।

তবে এখানেও একটা কথা বলা যেতে পারে। জেলখানা শহীদুল্লা কায়সারের লেখার ভিতরের ও বাইরের সংযোজকের কাজ করেছে। 'রাজবন্দীর রোজনামচা'তে জেলখানার এই সংযোজক ভূমিকাকে অতীশ কিংবা কালামের জীবনবৃত্তের আখ্যান বর্ণনায় যেন সহযোগী সঙ্গীতের মতো পাওয়া যায়। এখানে জেলখানা যেন কষ্টিপাথরের কাজ করেছে রাজবন্দীদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যাটিকেও বুঝে নেবার ব্যাপারে। শহীদুল্লার বিদ্রোহীরা অবাধ্য অগ্নিশিখা হলেও স্নায়ুমজ্জাসমন্বিত মানুষ।

৪

এবার সমন্বিত শিল্পরূপ সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা।

শহীদুল্লা কায়সার তাঁর সমস্ত লেখাতেই এমনকি আকাড়া পুরুষ ও নারীদের অত্যন্ত রূঢ় ও অপভাষী কাহিনীর পরিবেশনেও একটা সুস্থ শালীনতায় সুস্থিত হতে চেয়েছেন। অপরাধজগতেও তিনি চৈতন্য ও সুষমার সন্ধানী। এর মূলে রয়েছে সম্ভবতঃ শহীদুল্লার মার্কসীয় বৈদগ্ধের বিশেষ ধারা। তিনি কোথাও হাল ছেড়ে দেননি অপরাধীদের ক্লিন্ন পরিবেশেও। এই প্রসঙ্গেই চোখের সামনে শহীদুল্লার মার্জিত ও প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বটিকে স্থাপন করলে আমরা দেখতে পাবো, তিনি ছিলেন দুর্দান্ত আশাবাদী এবং এই আশাবাদের উৎস ছিল মুক্তিসংগ্রামের ক্রমাগত বিস্তৃত ও গভীরতর হবার ইতিহাসসম্মত প্রক্রিয়া। তিনি যেমন কাড়া ও আকাড়া নারী ও পুরুষ চরিত্রসমূহকে তাদের সমস্ত রকমের স্বতঃস্ফূর্ততা সমেত তাঁর লেখায় আধারিত করেছেন, তেমনি তাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যনির্ণয়ের তর্ক বিতর্কের এবং বিচার বিবেচনার সহস্রধার ভাবনাচিন্তার আবহের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ করেছেন। ব্যাপারটা যেন একটা সংগ্রামী চেতনার চুম্বকক্ষেত্র রচনার মতো। এতে জোরাজুরি নেই, সম্ভাব্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ আছে। 'পল্টু' গল্পে যেখানে যে লোকটি বরাবর চুরি করে জেলে আসতো, সে শেষবার জেলে এলো খুলনা ডকইয়ার্ডের শ্রমিকদের ধর্মঘটে উস্কানি প্রদানের অভিযোগে। এই ব্যাপারটাকে লেখক প্রথমদিকে কোন রকমের আভাসেও সামনে আনেননি। শহীদুল্লার বৈদগ্ধের বিশেষ দিকটি আরও একভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'সংশপ্তক' উপন্যাসের নামটির কথা এই প্রসঙ্গে পাড়া যেতে পারে, এখানেও উল্লেখ্য সংগ্রামী চেতনার বিশিষ্ট উপস্থাপন। একটি ধ্রুপদী গণঅভ্যুদয়মূলক উপন্যাসকে একটি প্রতীকে চিহ্নিত করেছেন, যার মূলমর্ম মরণপণ মুক্তি-সংগ্রাম। প্রয়াত প্রখ্যাত প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ কাজী আব্দুল ওদুদ সম্পাদিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' এ দেখা যায় 'সংশপ্তক' মহাভারতে বর্ণিত অমিতবিক্রম সেনাদল বিশেষ ঃ আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ইহাই ছিল ইহাদের প্রতিজ্ঞা।

যেসব নারী ও পুরুষের চরিত্রকে শহীদুল্লা তাঁর বিভিন্ন ধরনের আলেখ্যের মাধ্যমে ব্যাপক পাঠক-পাঠিকা সমাজের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন, তাদের উপর নিজের চিন্তাধারাকে চাপিয়ে দেবার জন্য কোন জোরাজুরি তিনি যে করেননি তার প্রমাণ 'অনমিতা' গল্পের নূরজাহান চরিত্র। সে তো রাজবন্দীদের বলয়ে এসেছিল, কিন্তু সে তার বিদ্রোহের ধারায় কোন রাজনৈতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগ করেনি। চন্দ্রভানের কন্যা সকিনা সামন্ততান্ত্রিক বর্বরতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের পতাকা সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরলেও আশেপাশে সে সময়ে মুক্তি সংগ্রামী গণঅভ্যুদয় ঘটেছে, তাতে শরিক হয়নি। সে যতটা বিদ্রোহ করেছে, শহীদুল্লা তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন, যদিও শুধুমাত্র এই বিদ্রোহ যে বুর্জোয়াদের অন্ধগলিতে অবরুদ্ধ হবে তার আভাস দিয়ে নিয়েছেন।

আবার 'অনিরুদ্ধা' গল্পে খালেদা যে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামী দয়িতের পক্ষ নিতে গিয়ে অরাজনৈতিকতার অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করলো, উড়িয়ে দিলো আকাশছোঁয়া বিদ্রোহের পতাকা, সেই আখ্যানকে একটি বাস্তব সম্মত প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত করে শহীদুল্লাহ তাঁর বিপ্লবী বৈদগ্ধ্যের মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দাখিল করেছেন।

তাঁর তর্কবিতর্কের তথ্যতত্ত্বসমন্বিত উপন্যাস 'সংশপ্তক', অথবা, আবেগের ঝড়ের দোলায় দোলানো 'সারেং বৌ' ও 'রাজবন্দীর রোজনামচা' এবং প্রায় এমিল জোলার বাস্তবতাবাদী পদ্ধতিতে রচিত 'চন্দ্রভানের কন্যা'তে শহীদুল্লা এই মাত্রাজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, পেয়েছেন।

ব্যাপারটা ভদ্রতা নয়, বিপ্লবী নির্দিষ্টতার ধারারক্ষা।

অগণিত বিদ্রোহের অব্যাহত অগ্নিশিখারা যেমন বাস্তব, তেমনি সম্মিলিত ভাবে নির্দিষ্ট বিশ্ব শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের এগিয়ে চলার ইতিহাস সম্মত প্রক্রিয়াও বাস্তব। শহীদুল্লা এই প্রেক্ষিতকে একটি কবিতায় অপূর্ব সংযত ব্যঞ্জনা দিয়ে সামনে রেখেছেন মুক্তিসংগ্রামের শহীদদের সম্মুখে স্থাপন করে।

কবিতাটির নাম চারিদিকে ফুলের মেলা ঃ

চারিদিকে ফুলের মেলা
কত কত ফুল
সবচেয়ে বড় ফুল আমার মায়ের মুখ।
কত কত স্বপ্ন
কবির স্বপ্ন, কবিতার স্বপ্ন
সবচেয়ে বড় স্বপ্ন শহীদের চোখ।
টেলিপ্রিন্টার খবরের কাগজ
জননেতা পণ্ডিত পুঁথির
কত কত কথা
সবচেয়ে বড় কথা আমাদের শহীদের শপথ।
ভালবাসা
প্রেয়সীর আলিঙ্গন
কত গান কত প্রেম
সবচেয়ে বড় প্রেম শহীদের খুন।
শত শত হাতে মশাল জ্বলে
শত শত হাত দাঁড় টানে
শত শত হাতে কাস্তে শাবল চলে
সবচেয়ে দুর্বার টান শহীদের হাত।